



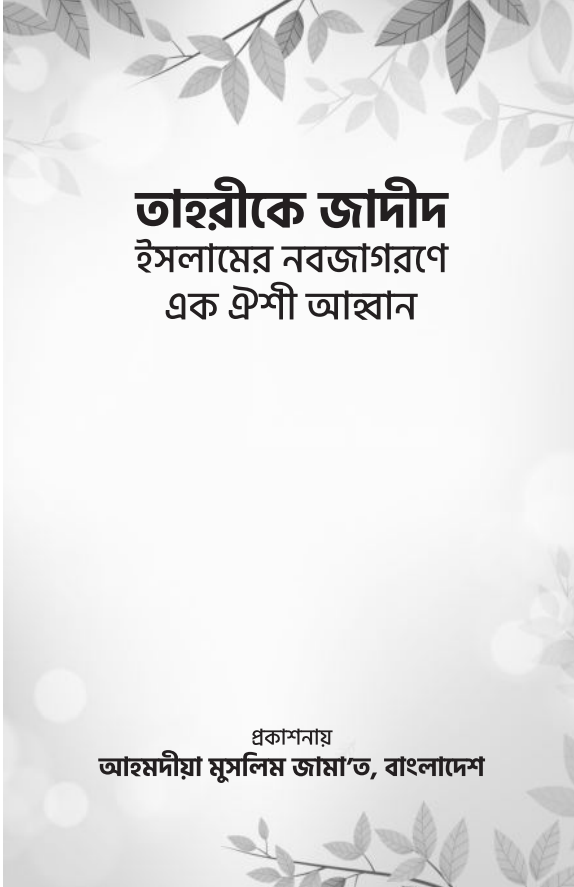
তাহরীকে জাদীদ

ইসলামের নবজাগরণে
এক ঐশী আহ্বান

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ



তাহরীকে জাদীদ ইসলামের নবজাগরণে এক ঐশী আত্মান



প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

তাহরীকে জাদীদ

ইসলামের নবজাগরণে

এক ঐশী আহ্বান

গ্রন্থসত্ত্ব

ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সংখ্যা

২০০০ কপি

মুদ্রণে

বাড-উ-লিভস্

বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Tahrik-E-Jadid

তাহরীকে জাদীদ
ইসলামের নবজাগরণে
এক ঐশী আহ্বান

Published by

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

1st Published in Bangladesh in February 2025

© Islam International Publications Ltd., UK

ISBN 978-984-991-220-0

ভূমিকা

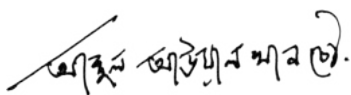
১৯৩৪ সাল। মুসলমানদের সকল ফিক্কা যারা ইতঃপূর্বে জামা'তের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায়ে রাখতো, তারাও জামা'তের ক্রমবর্ধমান সাফল্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এবং জামা'তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় নামে। তারা সবাই মজলিসে আহরারে ইসলাম নামে একটি জোট গঠন করে। এই আহরারীরা যারা একটা সময় পর্যন্ত কেবল জামা'তের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করতো, এক পর্যায়ে তারা কাদিয়ানের পথে পথে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া তারা একটি বৃহৎ পরিসরে সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাদিয়ানের অদূরে তারা এক বৃহৎ সম্মেলন করে। উক্ত সম্মেলনে তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, শীঘ্রই তারা কাদিয়ানকে ধ্বংসসূত্রে পরিণত করে ছাড়বে এবং জগতে আহমদীয়াত বলে কোন নাম-চিহ্ন রাখবে না। তাদের এমন ঘোষণার ফলে মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মাঝে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয় আর অপর দিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাঝে একপ্রকার শঙ্কা ও ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করে। আহরারীদের দ্বারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কেন্দ্র কাদিয়ান হুমকির মুখে পড়ে এবং আক্রমণের ঝুঁকিতে পরিণত হয়। ইতঃপূর্বে যারা কাদিয়ানের অলিগলিতে প্রবেশ করেছিল, তখন তারা-ই আহমদী সদস্যদের বাড়িঘরে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ববাসী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিল। সকলে ভেবেছিল, তিনি প্রতিরক্ষামূলক বাহ্যিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি এমন এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা দেখে সকল মুসলিম সম্প্রদায় হতবাক হয়ে যায়। তিনি (রা.) ঐশী অভিপ্রায়ে অনুপ্রাণিত হয়ে এক মহান তাহরীক করেন অর্থাৎ 'তাহরীকে জাদীদ'। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন: “আমি দেখতে পাচ্ছি, আহরারীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তারা বলে, তারা নাকি এই জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে, কিন্তু আল্লাহ তা'লা আমাকে এমন এক পরিকল্পনার কথা বলেছেন যার মাধ্যমে এ জামা'ত বিশ্বের সকল দেশে ছড়িয়ে পড়বে আর জগতের কেউ এ জামা'ত ধ্বংস করতে পারবে না”। তিনি (রা.) আরও বলেন, “তাহরীকে জাদীদ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল, এমন একটি তহবিল গঠন করা যার সাহায্যে আল্লাহর বাণী পৃথিবীর কোনে কোনে সহজে এবং সুবিধাজনক উপায়ে পৌঁছে দেওয়া।”

তাহরীকে জাদীদ প্রথমে তিন বছরের জন্য অস্থায়ী পরিকল্পনা হিসেবে গুরু হয়েছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বছরের পর বছর এটি দুর্দান্ত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে ফলে তিনি (রা.) এটিকে আরও সম্প্রসারিত করেন এবং এর উনিশতম বার্ষিকীতে অর্থাৎ ২৭ নভেম্বর ১৯৫৩ সালের জুমুআর খুতবায় বলেন: “এখন যেহেতু উনিশ বছর শেষ হতে চলেছে, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাহরীকে জাদীদ জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।”

তাহরীকে জাদীদ আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এটি একটি শক্ত সুদৃঢ় বৃক্ষে পরিণত হয়েছে যার শাখাপ্রশাখা অনেক দ্রুততার সাথে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সবশেষ তথ্যমতে বিশ্বের ২২০টি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেবল আফ্রিকাতেই ৫৩টির অধিক দেশে আহমদীয়াতের ভিত্তি রচিত হয়েছে। ফলে যেক্ষেত্রে পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলা হতো- তাদের সূর্য কখনও অস্ত যায় না। আল্লাহ্র কৃপায় এখন একথা নির্দিধায় বলা যায়- আহমদীয়া জামা'তের সূর্য কখনও অস্ত যায় না, আলহামদুলিল্লাহ।

পরিশেষে বলতে চাই, আহমদীয়াতের সাহিত্যে তাহরীকে জাদীদ পুস্তকটি এক অমূল্য সম্পদ। আমার বিশ্বাস, এ পুস্তকটি পাঠ করে আমরা নিজেদের অবস্থান উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। এই পুস্তকের কাজে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন যথাক্রমে: মাওলানা গোলাম রসুল, মাওলানা নাভিদ আহমদ লিমন, মাওলানা সজিব আহমদ, মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, জনাব তারেক আহমদ সবুজ এবং জনাব নুরুদ্দিন আহমদ। তারা ছাড়াও যারা এ কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাহরীকে জাদীদ পুস্তকটি পাঠের সুফল যেন আমাদের সমাজ-জীবনে দৃশ্যমান হয়, আল্লাহ্র সমীপে কায়মনোবাক্যে এ দোয়াই থাকবে।

খাকসার



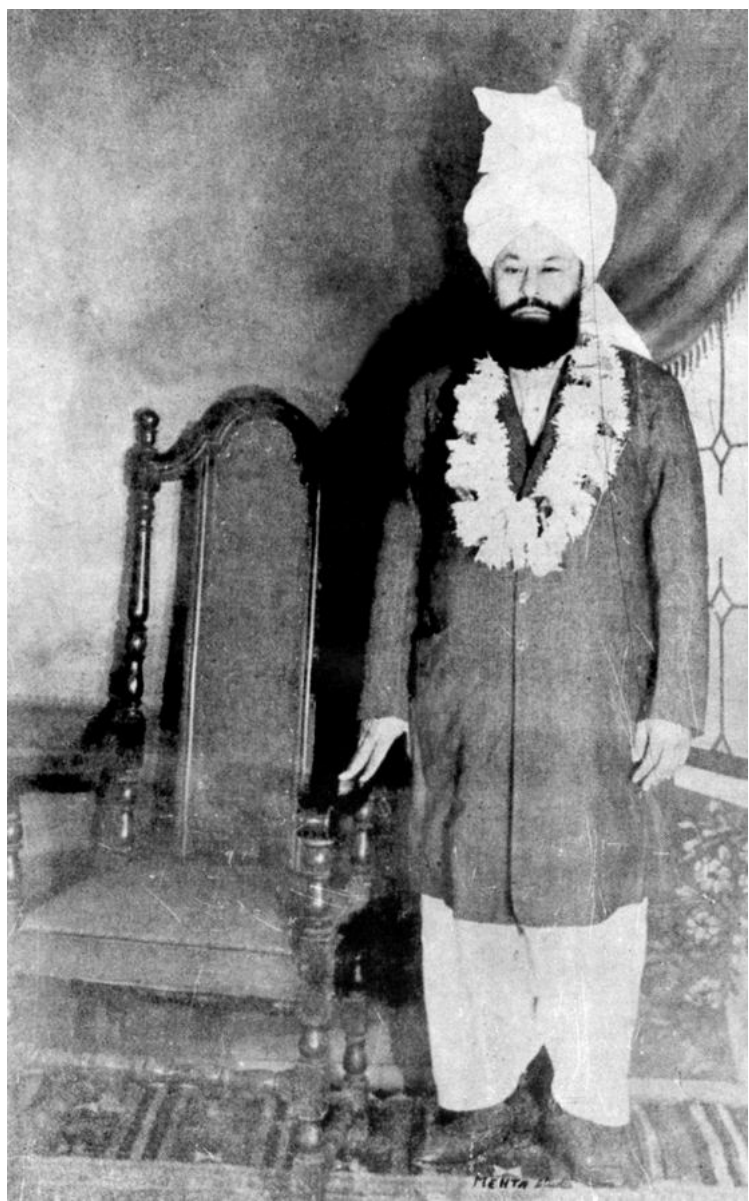
আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫



হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
০১) তাহরীকে জাদীদ এক ঐশী ব্যবস্থাপনা	০১
০২) কেমন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তাহরীকে জাদীদের ভিত্তি রাখা হয়	০১
০৩) আহরারীদের এ-সব গোলমাল কেবল একটি উপলক্ষ্য ছিল	০২
০৪) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাশফে তাহরীকে জাদীদের বর্ণনা	০২
০৫) দ্বিতীয় শুভসংবাদ	০৩
০৬) ঐশী তাহরীক	০৪
০৭) তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কিত প্রথম ঘোষণা	০৮
০৮) তাৎক্ষণিক তিনটি আদেশ	০৯
০৯) কুরবানীর পরিবেশ সৃষ্টি করার নির্দেশনা	১০
১০) তাহরীকে জাদীদের সাতাশটি মোতালবাত (দাবিসমূহ)	১৩
১১) তাহরীকে জাদীদের মোতালবাত (তথা দাবিসমূহ)-এর প্রেক্ষাপট	৩২
১২) তাহরীকে জাদীদ বাধ্যতামূলক নয় বরং ঐচ্ছিক এক ক্রিম	৪২
১৩) সাড়ে তেরশ বছর পূর্বের তাহরীক	৪৫
১৪) তাহরীকে জাদীদ সফল হওয়া সম্পর্কে সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী	৪৬
১৫) দুর্বল প্রকৃতির আহমদীদের অস্থিরতা এবং হযরত আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর ঈমান উদ্দীপক জবাব	৪৭
১৬) অ-আহমদীদের ওপর তাহরীকে জাদীদের প্রভাব	৪৮
১৭) দেশীয় পত্র-পত্রিকায় তাহরীকে জাদীদের উল্লেখ	৪৮
১৮) আহমদী খলীফার অনুসরণীয় নির্দেশ	৪৯
১৯) তাহরীকে জাদীদের আহ্বানে আহদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা ও কুরবানীর অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ এবং অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে প্রশংসা	৫০
২০) চাঁদার তাহরীক আহ্বান এবং আহমদীয়া জামা'ত	৫০
২১) আমানত ফাভ	৫১
২২) হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর দোয়ার বরকত	৫২
২৩) মজলিসে আহরারীর সভাপতির স্বীকারোক্তি	৫২
২৪) ঐশী সাহায্য ও সমর্থন	৫৩
২৫) সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার চাঁদার ওপর তাহরীকে জাদীদের সুপ্রভাব	৫৪
২৬) মালী কুরবানীর আহ্বানে সর্বপ্রথম অংশগ্রহণকারী জামা'তসমূহ	৫৫
২৭) বহির্বিশ্বে তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণ	৫৭
২৮) হিন্দুস্থানের বাইরে আরও কিছু নিষ্ঠাবান জামা'ত	৫৮
২৯) দ্বিতীয় দাবি এবং আহমদীয়া জামা'ত	৫৮
৩০) সহজসরল জীবনযাপন	৫৮
৩১) এক মাস তবলীগের জন্য ওয়াকফ	৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩২) তিন বছরের জন্য ওয়াকফ	৬০
৩৩) অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের বাকী জীবন উৎসর্গীকরণ	৬১
৩৪) বেকার যুবকদের প্রতি আহ্বান	৬১
৩৫) নিজ হাতে কাজ করার আহ্বান	৬২
৩৬) কাদিয়ানে গৃহ নির্মাণের আহ্বান	৬৩
৩৭) দোয়ার আহ্বান	৬৩
৩৮) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিবারের সদস্যদের কুরবানী	৬৩
৩৯) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সত্তা মূর্তিমান তাহরীকে জাদীদ হয়ে গিয়েছিল	৬৪
৪০) হযর (রা.)-এর কর্মব্যস্ততা	৬৪
৪১) হযরত আমীরুল মু'মিনীন (রা.) এবং হযরতের আহলে বায়ত-এর অতুলনীয় মালী জেহাদ	৬৬
৪২) অন্যান্য দাবির ক্ষেত্রে দীপ্ত আলোকবর্তিকা	৬৭
৪৩) কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং উপটোকনের বিষয়ে দিকনির্দেশনা	৬৮
৪৪) প্রথম ওয়াকফে জিন্দেগী কর্মকর্তা	৬৯
৪৫) ফাইন্যান্স সেক্রেটারি নিয়োগ	৭০
৪৬) ফাইন্যান্স অফিসের প্রাথমিক বিভিন্ন তথ্য	৭১
৪৭) আমানতে জায়েদাদ বিভাগ	৭৫
৪৮) তাহরীকে জাদীদের প্রথম (ব্যয়ের) বাজেট	৭৫
৪৯) স্থায়ীভাবে অফিস প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রথম ইনচার্জ	৭৬
৫০) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর স্বর্ণালী দিকনির্দেশনা	৭৭
৫১) ব্যয়ের মূলনীতি	৭৮
৫২) ওয়াকফীনে তাহরীকে জাদীদের তিনটি ধরন	৭৮
৫৩) সেক্রেটারি ফরেন মিশনারীজ	৭৯
৫৪) সেক্রেটারি সানা'ত ও তেজারাত	৭৯
৫৫) গুরুত্বপূর্ণ লিফলেট ও ইশতেহার প্রকাশ	৭৯
৫৬) বই-পুস্তক ছাপানো	৮২
৫৭) সংবাদপত্রের মাধ্যমে আহমদীয়াতের প্রচার	৮২
৫৮) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৮২
৫৯) দেশে তবলীগী Survey (তথ্য জরিপ)	৮৩
৬০) মুকেরিয়ান (হুশিয়ারপুর জেলার) মিশন	৮৪
৬১) বেরওয়াল মিশন	৮৭
৬২) দারুস-সানা'আত	৯১
৬৩) তাহরীকে জাদীদের বোর্ডিং	৯১
৬৪) বোর্ডিং প্রতিষ্ঠার পর হযর (রা.)-এর কিছু দিকনির্দেশনা	৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৫) বৈদিক ইউনানি ঔষধালয় দিল্লী	৯৬
৬৬) ইংরেজি ভাষায় কুরআন অনুবাদ	৯৯
৬৭) পঁচিশ লক্ষ রূপির রিজার্ভ ফান্ড	৯৯
৬৮) তাহরীকে জাদীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য	৯৯
৬৯) তাহরীকে জাদীদের দুই মুজাহিদের ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত	১০৩
৭০) তাহরীকে জাদীদের প্রথম তিন বছরের বর্ণাঢ্য সাফল্যের এক ঝলক	১০৭
৭১) প্রারম্ভিক কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা	১০৯
৭২) তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় সাত বছর	১১১
৭৩) দিব্যদর্শনের মাধ্যমে ১০ বছরের জন্য ওয়াকফে জাদীদের সময়কাল বৃদ্ধি	১১১
৭৪) তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ঘাটতি	১১২
৭৫) সহজসরল জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম	১১২
৭৬) স্থায়ী ওয়াকফের তাহরীক	১১৩
৭৭) স্থায়ী ওয়াকফেদারদের প্রশিক্ষণ	১১৪
৭৮) মনোনীত ওয়াকফেদারদের জন্য দিকনির্দেশনা	১১৬
৭৯) হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সন্তুষ্টি প্রকাশ	১১৮
৮০) সিলেবাস প্রণয়ন	১১৯
৮১) জীবন উৎসর্গকারীদের জন্য নিয়োজিত শিক্ষকগণ	১২০
৮২) দারুল মুজাহিদিন	১২২
৮৩) জীবন উৎসর্গকারীদের মাঝে নিরলস চেষ্টা-সাধনার প্রেরণা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ	১২২
৮৪) স্থায়ীভাবে সিনেমা দেখায় নিষেধাজ্ঞা	১২৭
৮৫) দেহাতী (তথা গ্রাম্য) ওয়াকফে জিন্দেগী মোবাল্লেগ ফ্রিম	১২৮
৮৬) সহায়সম্পদ উৎসর্গীকরণ এবং উৎসর্গীকৃত সম্পদ থেকে প্রাপ্ত উপার্জন থেকে অর্থ প্রদান করার বিশেষ তাহরীক	১৩১
৮৭) ব্যাপক পরিসরে ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক	১৩২
৮৮) আহমদী যুবকদের উল্লেখযোগ্য নিষ্ঠা	১৩৩
৮৯) গায়ের আহমদী যুবকদের ওপর ওয়াকফের ঘোষণার প্রভাব	১৩৪
৯০) তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদিনদের জন্য সনদ	১৩৫
৯১) বই-পুস্তক প্রকাশ	১৩৫
৯২) তাহরীকে জাদীদের ১০ বছরের এক ঝলক	১৩৫
৯৩) দ্বিতীয় স্তরের সূচনা	১৩৬
৯৪) ফযলে উমর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা	১৩৬
৯৫) হিলফুল ফুযূল সংঘ পুনরুজ্জীবিতকরণ	১৩৭
৯৬) তাহরীকে জাদীদের ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব	১৩৭
৯৭) প্রসিদ্ধ ভাষায় প্রবন্ধ	১৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
৯৮) বহির্বিশ্বে তবলীগ এবং বিশেষ শিক্ষার জন্য ওয়াকফীনদের গুরুত্বপূর্ণ বাছাইকরণ	১৩৯
৯৯) এছাড়া বিশেষ শিক্ষা অর্জনের জন্য নিম্নে বর্ণিত ওয়াকফীনদের নির্বাচন করা হয়	১৪০
১০০) পারিবারিক ওয়াকফের তাহরীক	১৪২
১০১) তাহরীকে ‘ওয়াকফে তেজারাত’	১৪২
১০২) যুদ্ধের সমাপ্তি এবং তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদদের যাত্রা	১৪৩
১০৩) ‘মজলিসে তাহরীকে জাদীদ’ প্রতিষ্ঠা	১৪৫
১০৪) বিশেষ ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ	১৪৫
১০৫) ভারত বিভক্ত হওয়া এবং তাহরীকে জাদীদ	১৪৫
১০৬) পাকিস্তানে তাহরীকে জাদীদের রেজিস্ট্রেশন	১৪৬
১০৭) জামেয়াতুল মোবাম্বেরীন প্রতিষ্ঠা	১৪৬
১০৮) তাহরীকে জাদীদের স্থায়ী বিভাগসমূহের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর কর্মপন্থা	১৪৬
১০৯) মজলিসে মুশাওয়ারাতে তাহরীকে জাদীদের বাজেট	১৫০
১১০) ওয়াকফে জিন্দেগী সম্পর্কিত নতুন নিয়মকানুন	১৫১
১১১) রাবওয়াতে তাহরীকে জাদীদ দপ্তরের বিল্ডিং নির্মাণ	১৫২
১১২) পুস্তক ‘পাঁচ হাজার মুজাহিদীন’-এর প্রকাশ	১৫২
১১৩) তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন চাঁদার হার	১৫৩
১১৪) ইংরেজি ভাষায় তফসীরে কুরআন-এর সমাপ্তি	১৫৩
১১৫) মাসিক তাহরীকে জাদীদ	১৫৪
১১৬) তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় স্তরের প্রকাশনা	১৫৪
১১৭) তাহরীকে জাদীদের একবালক	১৫৪
১১৮) তৃতীয় বিভাগ বা পর্যায়ের সূচনা	১৫৫
১১৯) তৃতীয় পর্যায়ের মুজাহিদদের জন্য উপদেশবাণী	১৫৬
১২০) তাহরীকে জাদীদের বর্তমান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা	১৫৬
১২১) বহির্বিশ্বে তাহরীকে জাদীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৬০
১২২) বহির্বিশ্বে মসজিদসমূহ	১৬০
১২৩) তাহরীকে জাদীদের তবলীগী চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে অন্যান্যদের মতামত	১৬৯
১২৪) এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা	১৬৯
১২৫) জামা’তকে সতর্কীকরণ	১৭৭
১২৬) ভবিষ্যৎ খলীফাদের উদ্দেশ্যে ওসিয়্যত	১৭৯
১২৭) তাহরীকে জাদীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ	১৭৯
১২৮) আজ পৃথিবীর ২২০টি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত প্রতিষ্ঠিত	১৮১

তাহরীকে জাদীদ এক ঐশী ব্যবস্থাপনা

১৯৩৪ সালের সমাপ্তি হয় এমন এক সুমহান ঘটনার মাধ্যমে যার ফলে আহমদীয়া জামা'তের ধর্মীয় প্রচার ও প্রসার যা ইতঃপূর্বে কেবল গুটিকয়েক দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল তা আন্তর্জাতিক বলয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলাম প্রচারের এক সুসংহত ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হয় আর তা হল, 'তাহরীকে জাদীদ'। খোদা তা'লার বিশেষ অভিপ্রায়ে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ঠিক সে-সময় নিজ হাতে এর গোড়াপত্তন করেন যখন আহরারীদের আন্দোলন তুঙ্গে ছিল এবং তারা কাদিয়ান এবং আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে কাদিয়ানের অনতিদূরে এক মহাসমাবেশ করতে মনস্থ করে।

কেমন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তাহরীকে জাদীদের ভিত্তি রাখা হয়

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) নিজেই বর্ণনা করেন, “এই তাহরীক এমন দুঃসময়ে শুরু করা হয়েছিল যখন মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর সমস্ত শক্তি আহমদীয়া জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। একদিকে আহরারীরা ঘোষণা দেয় যে, তারা আহমদীয়া জামা'তকে ধ্বংস করে দিবে এবং এ জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার আগ পর্যন্ত তারা শান্তির নিশ্বাস নিবে না। অপরদিকে যারা আমাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতো এবং বাহ্যত আমাদের সাথে সম্প্রীতি দেখাতো, তারাও অন্তরের বিদ্বেষের কারণে এ সুযোগকে কাজে লাগায় এবং শতসহস্র রূপি দিয়ে আহরারীদের সাহায্য করা শুরু করে। তৃতীয়ত সমস্ত ভারতবর্ষ আহরারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এমনকি আমাদের এক প্রতিনিধিদল পাঞ্জাব সরকারের সাথে দেখা করতে যায়। তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আহরারীদের এই আন্দোলনের বিষয়ে কিছুই জানো না। আমরা ডাক বিভাগ থেকে জানতে পেরেছি, তাদের আয় দৈনিক ১৫০০ রূপি। তখন ইংরেজ সরকারও আহরারীদের এই নৈরাজ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে আর এখানে বেশ কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রেরণ করে এবং আহমদীদের চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়ে আহরারীদের মহাসমাবেশ সফল করতে সহায়তা করে। ঠিক তখনই তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা প্রদান করা হয়।”

(বক্তৃতা, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৪, অপ্রকাশিত)

আহরারীদের এ-সব গোলমাল কেবল একটি উপলক্ষ্য ছিল

আহরারীদের এ-সব গোলমাল কেবল একটি উপলক্ষ্য ছিল। আগে থেকেই খোদা তা’লা তাহরীকে জাদীদ স্কিম জারি করার অভিপ্রায় নিয়ে রেখেছিলেন। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) স্বয়ং বলেন:

“প্রকৃত বিষয় হল, আহরারীদের আন্দোলন তো ছিল খোদা তা’লার পক্ষ থেকে এক বাহানামাত্র, কেননা প্রত্যেক স্কিম জারি করার জন্য একটি সঠিক সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করতে হয় আর যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সুবর্ণ সুযোগ না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত জারিকৃত স্কিম ফলপ্রসূ হয় না।”

তিনি (রা.) আরও বলেন:

“তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা এমন এক সুবর্ণ সুযোগে প্রদান করা হয়েছে যার চেয়ে উত্তম কোন সুবর্ণ সুযোগ আগমনের অবকাশ ছিল না। খোদা তা’লা নিজ অনুগ্রহে আমাকে আমার জীবদ্দশায় যে-সব বিশেষ সফলতা দান করেছেন সেগুলোর মাঝে একটি হল, যথাসময়ে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা প্রদান করা। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, যে মুহূর্তে আমি তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দিয়েছি অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদের ভিত্তি রেখেছি, সে মুহূর্তটি ছিল আমার জীবনের উত্তম মাহেন্দ্রক্ষণগুলোর মাঝে এক বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণ। দুরন্ত ঘোড়াকে হঠাৎ থামিয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, জামা’তের প্রাণভোমরার অবস্থা সে-সময় ঠিক তদ্রূপ ছিল।”

(আল-ফযল, ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪, পৃ. ১০)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাশফে তাহরীকে জাদীদের বর্ণনা

তাহরীকে জাদীদের একটি বিশেষত্ব হল, এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই কাশফ পূর্ণতা লাভ করেছে যাতে তাঁকে ইসলামের বিজয়ের জন্য পাঁচ হাজার সৈন্য দ্বারা গঠিত এক আধ্যাত্মিক সৈন্যবাহিনী দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লেখেন:

“কাশফী অবস্থায় এই অধম দেখে, মানবরূপে দুই ব্যক্তি একটি জায়গায় বসে আছেন, একজন মাটিতে এবং অন্যজন ছাদসম উচ্চতায়। তখন আমি মাটিতে বসে থাকা সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলি, আমার এক লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন। তখন আমি অপর ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিলাম যিনি ছাদসম উচ্চতায় অর্থাৎ আকাশের দিকে ছিলেন আর আমি তাকে সম্বোধন করে বলি, আমার এক লক্ষ সৈন্য প্রয়োজন। তিনি আমার এ কথা শুনে বলেন, এক লক্ষ দেওয়া যাবে না, তবে পাঁচ হাজার সৈন্য দেওয়া যাবে। আমি তখন নিজ মনে বলি, পাঁচ হাজার লোক যদিও অনেক কম, তবে খোদা তা’লা চাইলে স্বল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যকের ওপর জয়লাভ করতে পারে। সে-সময় আমি এই আয়াত পাঠ করি,

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

(সূরা আল-বাকার: ২৫০)

অতঃপর আমাকে কাশফের অবস্থায় সেই সাহায্যকারীকে দেখানো হয় আর বলা হয় সুস্বাগতম, সুস্বাগতম। কিন্তু খোদা তা’লার কোন সুপ্ত অভিপ্রায়ের কারণে আমি তাকে চিনতে পারি নি। তবে আমি আশা রাখি, অন্য কোন সময় তাকে পুনরায় দেখানো হবে।”

(ইয়ালয়ে আওহাম, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৯৭-৯৯ টীকা দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় শুভসংবাদ

উক্ত কাশফ ছাড়াও হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এবং জামা’তের অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ এই বরকতময় তাহরীক সম্পর্কে শুভসংবাদ লাভ করেন। এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯৩৪ সালের ০৯ নভেম্বর বলেন—

“আমি আল্লাহ তা’লার সমীপে ধারাবাহিকভাবে দোয়া করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শুভসংবাদ লাভ করে একটি স্কিম তৈরি করেছি যে-বিষয়ে আমি আগামী জুমুআ থেকে বর্ণনা শুরু করব, ইনশাআল্লাহ। ঘটনা হল, একদিন আমি বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকি। সে-দিন আমি (স্বপ্নে) দেখি, চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব এসেছেন আর আমি কাদিয়ানের বাইরে পুরোনো রাস্তায় তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছি। সাক্ষাৎ হতেই প্রথমে তিনি

আমার সাথে কোলাকুলি করেন। অতঃপর আবেগের সাথে আমার কাঁধ এবং বুকের ওপর চুমু দিতে থাকেন। তিনি কাঁদতে থাকেন এবং চুমু দিতে দিতে বলছিলেন, হে আমার মনিব! আমার দেহ, আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত। আপনি কি আমার পক্ষ থেকে বিশেষ কোন কুরবানী আশা করছেন? আর আমি দেখলাম, তার চেহারায় নিষ্ঠা ও দুঃখ— এই উভয় প্রকারের ভাবাবেগ প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমার মতে এই স্বপ্নের তা’বীর হল, প্রথমত আল্লাহ তা’লা চৌধুরী সাহেবের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ তার কাছ থেকে যে কুরবানী চাওয়া হয়েছে, যে-কোন অবস্থায় তিনি সেই কুরবানী করতে পিছপা হবেন না। দ্বিতীয়ত জাফরুল্লাহ-এর অর্থ হল, আল্লাহ তা’লার পক্ষ থেকে আগমনকারী বিজয় এবং তার কাছে কুরবানী চাওয়া দ্বারা বুঝাচ্ছে আয়াত **مَتَى نَصْرُ اللَّهِ** [আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে— অনুবাদক]। অর্থাৎ খোদা তা’লার কাছে যে সাহায্য যাচনা করা হয়েছিল এখন সেই সাহায্য এসে উপস্থিত হয়েছে আর বুক ও কাঁধে চুমু দেবার মানে হল, জ্ঞান, বিশ্বাস এবং শক্তির আধিক্য। আর ‘আকা’ (তথা মনিব) শব্দ দ্বারা বুঝাচ্ছে, বিজয় হল মু’মিনের সেবক, যাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। আর দেহ ও আত্মার কুরবানী দ্বারা বুঝায়, দৈহিক কুরবানী এবং দোয়ার ফলে সাহায্য করা হবে, যে-সাহায্য আল্লাহ তা’লার নেক বান্দা এবং ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমরা লাভ করব।”

(আল-ফযল, ১৮ নভেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০২-০৩)

এছাড়াও এই তাহরীক যে কল্যাণকর— এ বিষয়ে অসংখ্য মানুষ বহু স্বপ্ন, কাশফ এবং এলহাম লাভ করেছেন। অনেকের স্বপ্নের মাঝে মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘এই তাহরীক খুবই কল্যাণমণ্ডিত’। আবার অনেকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, ‘এ তাহরীক খুবই কল্যাণমণ্ডিত’। আর অনেকে এলহামও লাভ করেছেন যে, ‘এ তাহরীক খুবই কল্যাণমণ্ডিত’। মোটকথা, এটি এমন এক তাহরীক যেটি কল্যাণমণ্ডিত হবার বিষয়ে শতসহস্র স্বপ্ন, কাশফ এবং এলহামের সাক্ষ্য লাভ হয়েছে।

(আল-ফযল, ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৯, পৃ. ০৫, খুতবা জুমুআ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯)

ঐশী তাহরীক

তাহরীকে জাদীদ ছিল সরাসরি খোদা তা’লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণকৃত

একটি তাহরীক যেটি জগতে আধ্যাত্মিক এবং ইসলামী বিজয়ের জন্য যত ধাপ, যত কার্যক্রম আর যত প্রতিবন্ধকতা আছে তা সবিস্তারে দিব্যদর্শনরূপে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর পবিত্র হৃদয় অবহিত হয়। এছাড়া ভবিষ্যতে ইসলাম ও কুফরের মাঝে ভবিতব্য যুদ্ধের বিস্তারিত এক চিত্র তাঁর মস্তিষ্কে গেঁথে দেওয়া হয়।

তাহরীকে জাদীদের এই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বেশ অনেকবার বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করছি:

১. “আমি যখন এ বিষয়ে ইচ্ছা পোষণ করলাম তখনও আমি নিজে জানতাম না যে, কী লিখব। কিন্তু আমি যতই নোট করছিলাম, ততই খোদা তা’লা সেই পদ্ধতি এবং মাধ্যম আমাকে বুঝাচ্ছিলেন যদ্বারা আহমদীয়াত দৃঢ়তা লাভ করতে পারে।”

(বক্তৃতা, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৩, অপ্রকাশিত)

২. “আমার মস্তিষ্কে এ তাহরীকের বিষয়ে কোন চিন্তাভাবনা ছিল না, হঠাৎই আমার হৃদয়ে আল্লাহ তা’লার পক্ষ থেকে এ তাহরীক অবতীর্ণ হয়। অতএব আমি নির্দিধায় বলতে পারি, এই তাহরীকে জাদীদ যা খোদা তা’লা জারি করেছেন, আমার মস্তিষ্কে পূর্বে এ তাহরীক ছিল না। আমি একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিলাম। হঠাৎ-ই আল্লাহ তা’লা এটি আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ করলেন আর আমি তা জামা’তের সামনে উপস্থাপন করলাম। অতএব এটি আমার নিজস্ব কোন তাহরীক নয় বরং খোদা তা’লা কর্তৃক অবতীর্ণকৃত তাহরীক।”

(আল-ফযল, ০২ ডিসেম্বর ১৯৪২)

৩. “এই স্কিমে কতক বিষয় অস্থায়ী। তাই আমিও অস্থায়ী জিনিসকে স্থায়ী বলি না। কিন্তু অন্যান্য সকল স্কিম স্থায়ী কেননা তা কেবল আল্লাহ তা’লার দিব্যদর্শনের মাধ্যমে আমাকে বুঝানো হয়েছে। আমি এই স্কিম তৈরি করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অভিনিবেশ করি নি আর এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আমি এক ঘণ্টাও ব্যয় করি নি। খোদা তা’লা আমার হৃদয়ে এ তাহরীক সৃষ্টি করেছেন যে, আমি যেন এ বিষয়ে খুতবাতে উল্লেখ করি। এরপর উক্ত খুতবায় আমি যা-কিছু বলেছি তা আমি বলি নি বরং আল্লাহ তা’লাই আমার মুখ দিয়ে বর্ণনা করিয়েছেন কেননা আমি কী বলব— তা এক মিনিটও আমি ভাবি নি।

আল্লাহ্ তা’লা আমার মুখে স্বয়ং এই স্কিম জারি করতে থেকেছেন আর আমি ভাবলাম, আমি বলছি না বরং আমার মুখ দ্বারা আল্লাহ্ বলছেন।”

(খুতবা জুমুআ, ২১ অক্টোবর ১৯৩৬; আল-ফযল, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১)

৪. “তাহরীকে জাদীদের বিষয়টি হঠাৎ-ই আমার মাথায় আসে আর আমি যখন এই তাহরীকের ঘোষণা প্রদান করি তখনও এই তাহরীকের হিকমত সম্পর্কে আমার কোন প্রকার ধারণাই ছিল না। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একটি নেক নিয়্যত ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই স্কিম আমি জামা’তের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম, কেননা প্রকৃত ঘটনা হল, ঐ দিনগুলোতে সরকারের কিছু কর্মকর্তার পক্ষ থেকে জামা’তকে ভয়ানক অপমান করা হয় এবং জামা’তের মর্যাদা শঙ্কার মধ্যে পড়ে যায়। অতএব আমি জামা’তকে শঙ্কামুক্ত করতে চাই, কিন্তু কিছু সময় আল্লাহ্র রহমত মানুষের হৃদয়ে শক্তি যোগায় এবং রুহুল কুদুস মানুষের সমস্ত কাজ ও ইচ্ছা শক্তির ওপর প্রাধান্য লাভ করে। আমি মনে করি আমার জীবদ্দশায়ও এমনই একটি ঘটনা ঘটে যখন রুহুল কুদুস আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় এবং আমার মস্তিষ্কে এমনভাবে প্রাধান্য লাভ করে, আমার মনে হচ্ছিল যেন সে আমাকে আয়ত্ত করে ফেলেছে আর জগতে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এক নতুন স্কিম আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ করে দেয়। ফলে আমি দেখি, আমার তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেবার পূর্বের জীবন আর পরের জীবনের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান আমার কাছে পূর্বেও প্রকাশিত হচ্ছিল আর এখনও প্রকাশিত হয়। কিন্তু পূর্বে এমন নির্দিষ্ট কোন স্কিম আমার মাথায় ছিল না যার প্রতিটি পদক্ষেপের ফলাফলের বিষয়ে আমি অবগত আর আমি নিশ্চিত বলতে পারি, এই এই পদ্ধতিতে আমাদের জামা’ত উন্নতি করবে। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এমনই অর্থাৎ যেভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার যখন একটি ভবন তৈরি করে তখন তার এই জ্ঞান থাকে যে, এই ভবনের কাজ কবে শেষ হবে, এর কোথায় কোথায় তাক দিতে হবে, কয়টি জানালা হবে, কয়টি দরজা হবে আর কত উঁচুতে ছাদ হবে। এমনইভাবে জগতে ইসলামের বিজয়ের ধাপ এবং কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে— তা সবিস্তারে আমার সম্মুখে আছে। শত্রুর বহু ষড়যন্ত্র আমার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিষয়ে আমি জ্ঞাত আর এই সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে আমার চোখের সামনে উপস্থিত হয়। তখন আমি বুঝলাম, এই ঘটনা এবং বিশৃঙ্খলা খোদা তা’লার বিশেষ হিকমতের অধীন, যেন তা আমার দৃষ্টিকে এই মহান উদ্দেশ্যের দিকে মনোযোগী করে, যে উদ্দেশ্যে তিনি হযরত

মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। অতএব প্রথমদিকে আমি এ বিষয়ে কেবল ঈমান রাখতাম কিন্তু এখন আমি কেবল ঈমান-ই রাখি না বরং আমি সকল বিষয় যেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি। এই জামা’তকে কী কী উপায়ে ক্ষতি করা হবে, তা আমি দেখতে পাচ্ছি। এ জামা’তেরও ওপর কী ধরনের আক্রমণ করা হবে, তা-ও আমি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের পক্ষ থেকে সেই আক্রমণের কী ধরনের জবাব দেওয়া হবে- তা-ও আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক একটি বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান আমার মস্তিষ্কে প্রথিত রয়েছে।”

(আল-ফযল, ০৭ এপ্রিল ১৯৩৯, পৃ. ০৭)

৫. “তাহরীকে জাদীদের বিষয়টিও এলকা তথা দিব্যদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা’লা আমাকে বুঝিয়েছেন। আমি যখন প্রথমদিকে এ বিষয়ে খুতবা দিচ্ছিলাম তখন আমি নিজেও জানতাম না আমি কী বলব! আর আমি যখন এই স্কিমের বিষয়ে বর্ণনা করি তখন আমি ভাবছিলাম যে, এখনই এই স্কিম পূর্ণ করব আর আমি নিজেও এ বিষয়টি বুঝি নি যে, এই স্কিমে সব কিছুই আছে কিন্তু পরবর্তীতে যতই এই স্কিম নিয়ে আমি অভিনিবেশ করেছি, ততই আমি জানতে পেরেছি যে, সকল প্রয়োজনীয় বিষয় এই স্কিমের মাঝে বর্ণনা করা হয়েছে আর কমপক্ষে এই শতাব্দীর জন্য তোমাদের জন্য যা যা দরকার তার সবকিছু এর মাঝে রয়েছে, কেবল ছোটখাটো কিছু বিষয় যা সর্বদা পরিবর্তিত হতে পারে।

অতএব জামা’তের সদস্যদের নিজেদের উন্নতি ও সম্মানের জন্য এই তাহরীক বুঝা এবং এটি নিয়ে অভিনিবেশ করা অতি আবশ্যিক। আল্লাহ তা’লা যেভাবে সংক্ষিপ্ত বাক্যে একটি এলহাম করেন অথচ এর মাঝে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা থাকে, তাঁর দিব্যদর্শনের বিষয়টিও ঠিক তেমনই। আবার এলহাম যেভাবে গোপনে হয়ে থাকে, ঠিক সেভাবে দিব্যদর্শনও গোপনে হয়ে থাকে বরং এলহামের তুলনায় দিব্যদর্শন অধিক গোপনে হয়ে থাকে। এই তাহরীকও যা ঐশী দিব্যদর্শনের ফলাফল ছিল, এটিও প্রথমে গোপনই ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে যখন গভীর অভিনিবেশ করা হয় তখন এটি এক বিশাল ব্যাখ্যার ভাণ্ডার হিসেবে উদ্ভাসিত হয়। আমি মনে করি, আল্লাহ তা’লা আমাদের এ যুগের জন্য এর মাঝে এতটা উপায়-উপকরণ একত্রিত করে দিয়েছেন যে, নীতিগতভাবে এর মাঝে ঐ সকল বিষয় আছে যা সফলতার জন্য আবশ্যিক।”

(আল-ফযল, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১)

তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কিত প্রথম ঘোষণা

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর ওপর আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে ০১ অক্টোবর ১৯৩৪ সালে আহরারীদের নামসর্বস্ব তবলীগী সম্মেলনের সময় তাহরীকে জাদীদের দিব্যদর্শন দেখানো হয়। হযরত আমীরুল মু'মিনীন (রা.) যদি চাইতেন তাহলে সম্মেলন শুরু হবার পূর্বেই এর ঘোষণা প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু হযরত আমীরুল মু'মিনীন (রা.) অপরিসীম ধৈর্য্য, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে আহরারীদের সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। যদিও ১৯ অক্টোবর ১৯৩৪ সালে অর্থাৎ সম্মেলন শুরু হবার কেবল দুই দিন পূর্বে জুমুআর খুতবায় এই ঘোষণা দেন যে, “আল্লাহ তা'লা যদি আমাকে আরও ৭-৮ দিন সুযোগ দেন তাহলে আমি জামা'তের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকের ঘোষণা করব। আমি তাহরীকে জাদীদের দাবিসমূহ আহরারীদের জলসার দিনগুলিতে প্রকাশ করতে চাই নি, পাছে এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে আর উক্ত তাহরীক নতুন কোন নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। এরপর আমি দেখতে চাই, আপনাদের মাঝে এমন কতজন আছেন যারা এই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত! আমাদের জামা'তের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত যে-সব কুরবানী উপস্থাপন করা হয়েছে তা হযরত মুসা (আ.)-এর জামা'তের সদস্যদের কৃত কুরবানী বা হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের কুরবানী অথবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের কৃত কুরবানীর তুলনায় খুবই নগণ্য। কিন্তু এখন আমাদের জন্য সেই মানের কুরবানী করার সময় এসে গেছে যা অতি শীঘ্র ফলাফল প্রকাশ করে আমাদেরকে সফলতার সেই শিখরে উপনীত করবে যে শিখরে উপনীত করার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জগতে আগমন করেছেন। আমি আশা রাখি, আপনাদের মাঝ থেকে কতককে কোন অর্থকড়ি ছাড়াই বহির্বিশ্বে যাত্রা করার আদেশ দেওয়া হলে আপনারা তৎক্ষণাৎ লাক্ষ্যায়ক বলে প্রস্তুত হয়ে যাবেন। কতককে যদি তাদের খাবারদাবার ও পোশাক-আশাকে পরিবর্তন আনার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে তারা এ দাবি পূর্ণ করবেন। কিছু লোককে যদি আজীবন জামা'তের সেবার নিমিত্তে উৎসর্গ করতে বলা হয় তাহলে তারা নির্দিধায় সম্মত হবেন। তবে যে ব্যক্তি এই দাবিসমূহ পূর্ণ করবে না— সে তো আমাদের কেউ নয়, তাই তাকে পৃথক করে দেওয়া হবে।”

(আল-ফযল, ২৩ অক্টোবর ১৯৩৪, পৃ. ০২-০৩)

তাৎক্ষণিক তিনটি আদেশ

এ বিষয়ে উক্ত খুতবায় হযূর (রা.) তাৎক্ষণিক তিনটি আদেশ দেন।
আদেশসমূহ নিম্নরূপ:

প্রথম আদেশ: “প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার চাঁদা বকেয়া আছে অথবা প্রত্যেক সেই জামা’ত যাদের চাঁদা বকেয়া আছে, তারা যেন তাদের নিজ নিজ চাঁদা আদায় করে এবং ভবিষ্যতে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত হবার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে।”

দ্বিতীয় আদেশ: “একে-অপরের মাঝে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে এবং একে-অপরের সাথে কথা বলা বন্ধ রয়েছে তারা যেন নিজ ভাইয়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে মীমাংসা করে নেয়। আর কেউ যদি ক্ষমা না করে তাহলে তার কাছে অনেক অনুনয় করে ক্ষমা যাচনা করুন এবং তার সম্মুখে সর্বপ্রকারের বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করুন যেন তার মনে দয়া হয় আর সে যেন নিজ হৃদয় থেকে নিজ ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ দূর করে। এরপর আমি যখন দ্বিতীয় এলান করব তখন যেন দুই আহমদীর মাঝে কোনরূপ দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট না থাকে আর এমন কোন দুই আহমদী যেন না থাকে যাদের পরস্পরের মাঝে কথাবার্তা বন্ধ। অতএব তোমরা যাও এবং তোমাদের মনকে পরিষ্কার করো আর নিজ ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে ঐক্যবদ্ধ হও। যাও এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভেদ ও শত্রুতাকে নিজেদের মাঝ থেকে দূর করো। তাহলে খোদা তা’লার ফেরেশতা তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য অবতীর্ণ হবে, ঊর্ধ্বলোক থেকে খোদা তা’লার সৈন্যরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অবতীর্ণ হবে এবং তোমাদের শত্রুকে খোদার শত্রু মনে করা হবে। এই দুটি দৃষ্টান্ত আমি জামা’তের মাঝে দেখতে চাই।

যে-ব্যক্তির কানে আমার এই খুতবা পৌঁছবে, সে এই আদেশের ওপর আমল করার আগ পর্যন্ত যেন না ঘুমায়। হ্যাঁ, যদি তার জন্য এরূপ করা একেবারেই অসম্ভব হয়, যেমন যে-ব্যক্তির সাথে বিবাদ হয়েছে, সে যদি ঘরে উপস্থিত না থাকে এবং তাকে খুঁজেও যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি অন্য কোন গ্রাম বা শহরে চলে গিয়ে থাকে তবে সেকথা ভিন্ন। জামা’তের সেক্রেটারিদের উচিত হবে, তারা আমার এই খুতবা শোনার পর নিজ নিজ

জামা’তের সদস্যদের একত্রিত করবে এবং তাদেরকে বলবে, হযরত আমীরুল মু’মিনীনের আদেশ হল, আজকের এই যুদ্ধে কেবল সেই ব্যক্তিই शामिल হতে পারবে যার নিজ ভাইয়ের সাথে কোনরূপ অসন্তুষ্টি বা বিবাদ নেই এবং যে মীমাংসা করে নিজ ভাইয়ের সাথে মিলে গেছে। এছাড়া আমি যখন কুরবানী করার জন্য কাউকে মনোনীত করব তখন আমি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করব- তোমার হৃদয়ে কোন ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ অসন্তুষ্টি বা বিদ্বেষ নেই তো? তবে যদি আমি জানতে পারি যে, তার হৃদয়ে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ আছে তাহলে আমি তাকে বলব- তুমি ‘বুনিয়ানুম মারসূস’ [তথা সিসা গলিত প্রাচীর] নও। তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে বুক মিলাচ্ছ না। তোমার কাঁধে ভর করে শত্রু আমাদের ওপর আক্রমণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব তুমি দূর হও, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। কাদিয়ানের লোকদের এই কাজ এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে আর কাদিয়ানের বাইরের জামা’তগুলোতে এই খুতবা পৌঁছানোর এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করা আবশ্যিক করে দিলাম।”

তৃতীয় আদেশ: “আমার দ্রুতই এমন লোকদের প্রয়োজন যারা জামা’তের স্বার্থে নিজ দেশ ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হবে, নিজ প্রাণের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থেকে কোনরূপ বেতন ছাড়াই নিজেদেরকে সকল প্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করে জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রস্তুত হবে। অতএব আমি ঘোষণা করছি, যে-সব যুবক এই কাজের জন্য প্রস্তুত, তারা যেন নিজেদের নাম উপস্থাপন করে। যুবকদের যোগ্যতার বিষয়ে আমি বলতে চাই, হয় তাদেরকে আহমদীয়া মাদাসায় পড়ে সনদধারী মৌলভী হতে হবে অথবা অন্ততপক্ষে ইন্টার পাশ অথবা গ্র্যাজুয়েট থাকতে হবে। ... শর্ত হল, সরকারি চাকুরিজীবী বা ব্যবসায়ী হলে চলবে না, এমনকি ছাত্র হলেও চলবে না। কেবল এমন যুবকদের প্রয়োজন যারা নিজ ঘরে বসে চাকুরির জন্য অপেক্ষমাণ (অর্থাৎ বেকার)।”

(আল-ফযল, ১৮ নভেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ৯)

কুরবানীর পরিবেশ সৃষ্টি করার নির্দেশনা

উক্ত তিনটি আদেশ প্রদান করার পর হযর (রা.) জামা’তকে একথাও বলেন যে, “উপযোগী সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার আগ পর্যন্ত কোন বৃহৎ কুরবানী

করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে হুযূর (রা.) বলেন: সফলতার জন্য অনুকূল পরিবেশ হওয়া আবশ্যিক আর আশপাশের পরিবেশ অনুকূল না হলে সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি না বোঝার কারণে অনেকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তাদের মাঝে পুণ্য করার উপকরণও আছে আর আবেগও আছে কিন্তু তারা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না যে পরিবেশে সঠিক কুরবানী করা সম্ভব। অতএব পরিবেশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যিক। আমার এক সন্তান একদা একটি বৈধ জিনিস চায়। তখন আমি তাকে লিখেছি, তোমার চাওয়া বৈধ কিন্তু তুমি মনে রেখ! তুমি ধর্ম-সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছ, তোমাকে ধর্মের সেবা করতে হবে আর এই যাচিত জিনিস পেলে তা তোমার জন্য এতটাই বোঝা হয়ে যাবে, যার ফলে তুমি ধর্মের কাজ সুসম্পন্ন করতে পারবে না আর এটি তোমার ধর্ম-সেবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

অতএব আমি দেখেছি, অনেক লোক পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারার কারণে পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা কেবল এতটুকু মনে করে যে, আমরা যখন বলেছি কুরবানী করব, তো সময় হলেই আমরা তা করব অথচ এটি সঠিক নয়...। আমাকে হাজার হাজার লোক বলেছে- আমরা কুরবানী করতে প্রস্তুত। আর যারা লেখে নি তারাও এই অপেক্ষায় আছে যে, স্কিম প্রকাশ করা হলে আমরাও शामिल হব। কিন্তু আমি বলছি, কোন কুরবানী ততক্ষণ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত এর জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা না হবে। একথা বলা সহজ যে, আমাদের সম্পদ জামা'তের সেবার জন্য সমর্পিত কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির কিছু অর্থ খাবারে আর কিছু পোশাকে আর কিছু বাড়ির সুরক্ষায় অথবা বাড়ি ভাড়া, কিছু অর্থ চিকিৎসার জন্য ব্যয় করার ফলে তার কাছে আর কোন অর্থকড়ি না থাকে, এমতাবস্থায় সে যদি বলে- ‘আমার সমুদয় অর্থকড়ি জামা'তের সেবায় দিয়ে দিলাম’, তাহলে এমন কথার কী-ই বা মূল্য আছে? এ ধরনের কুরবানী না কুরবানীকারীকে কল্যাণ দিতে পারে না জামা'তকে। যার ভাণ্ডার শূন্য তার একথা বলা যে, আমার সব অর্থকড়ি নিবেদিত- তার এ কথা দিয়ে কী লাভ? যে-ব্যক্তির আয় ১০০ রুপি এবং ব্যয়ও ১০০ রুপি, তার কুরবানী দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত জামা'তের কোন কল্যাণ হবে না যতক্ষণ না তার ব্যয় ১০০ রুপি থেকে ৯০ রুপিতে নেমে আসবে। তখন নিঃসন্দেহে তার এই কুরবানী শতকরা দশভাগ কুরবানী বলে বিবেচিত হবে।... তাই কুরবানী করার

পূর্বে এর জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা আবশ্যিক। পরিবেশ সৃষ্টি না করে কুরবানী করার দাবি হবে নির্বুদ্ধিতা, অন্যভাষায় কপটতা।

স্মরণ রেখ, এই পরিবেশ ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী-সন্তানরা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত না হবে। পুরুষ সাধারণত নিজের জন্য শতকরা ০৫ থেকে ১০ ভাগ ব্যয় করে থাকে। তবে যেসব পুরুষ বিলাসিতার জন্য অধিক ব্যয় করে থাকে— তাদের কথা ভিন্ন। অন্যথায় পরিবারওয়ালা পুরুষ সাধারণত নিজের জন্য শতকরা ০৫ থেকে ১০ ভাগের বেশি ব্যয় করে না। আর বাকি শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ স্ত্রী-সন্তানদের জন্য ব্যয় করে কেননা তাদের সংখ্যা অধিক হয়ে থাকে আর স্ত্রী-সন্তানের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি পুরুষ অধিক যত্নবান থাকাও এর একটি কারণ। এমতাবস্থায় এমন পুরুষ যে শতকরা ০৫ ভাগ বা ১০ ভাগ অথবা খুব বেশি হলে শতকরা ১৫-২০ ভাগ নিজের জন্য ব্যয় করে আর যে ব্যক্তি তার আয়-উপার্জনের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ স্ত্রী-সন্তানদের জন্য ব্যয় করে, সে যদি কুরবানী করতেও চায় তবে তার স্ত্রী-সন্তান তাকে যদি সঙ্গ না দেয় অথবা একথা না বলে যে, আমরা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছি— তবে সে কীভাবে কুরবানী করতে পারে?

অতএব তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কুরবানীর জন্য প্রথমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর এর জন্য আমাদেরকে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তারা আমাদের সঙ্গ দিবে কি দিবে না? তারা যদি আমাদের সাথে কুরবানী করতে প্রস্তুত না হয় তাহলে কুরবানী করার খুব বেশি সুযোগ থাকে না।

আর্থিক কুরবানীর জন্য এবং প্রাণের কুরবানীর জন্য একই কথা প্রযোজ্য। শরীরকে কীভাবে কষ্টে ফেলা যেতে পারে, যতক্ষণ না এর জন্য অভ্যাস সৃষ্টি করা হবে। যে মায়েরা নিজ সন্তানদের সময় মত ঘুম থেকে জাগায় না। সময় মত পড়ার জন্য পাঠায় না, তাদের খাবারদাবারে সাবধানতা অবলম্বন করে না, যার ফলে তারা আরামপ্রিয় ও বিলাসী হয়ে ওঠে, এমন সন্তানেরা কী আর কুরবানী করবে? শৈশবে যে অভ্যাস সৃষ্টি হয় তা আর পরিত্যাগ করা যায় না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা উচ্চমার্গের ঈমানে সমৃদ্ধ হয় না।... অতএব মহিলারা এবং সন্তানেরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে ঐকমত্য না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মায়েরা ঐকমত্য না হবে, ততক্ষণ

পর্যন্ত প্রত্যহ তারা এমন কাজ করবে যার ফলে সন্তানদের মাঝে আলস্য সৃষ্টি হবে। অতএব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবার আগ পর্যন্ত কোন লাভ নেই।”

(আল-ফযল, ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ৪-৫)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯৩৪ সালের তিনটি খুতবায় অর্থাৎ ২৩ নভেম্বর, ৩০ নভেম্বর ও ০৭ ডিসেম্বর এই স্কিম জামা’তের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং ১৯৩৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত একটি ঘোষণাপত্রে এই স্কিমকে ‘তাহরীকে জাদীদ’ বলে অভিহিত করেন।

তাহরীকে জাদীদের সাতাশটি মোতালবাত (দাবিসমূহ)

তাহরীকে জাদীদের স্কিম সাতাশটি দাবির সমন্বয়ে গঠিত যার বিস্তারিত হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নিজের ভাষায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

দাবি নং ০১

সহজসরল জীবনযাপন করা

“আজ থেকে তিন বছরের জন্য... প্রত্যেক আহমদী যারা এই যুদ্ধে আমাদের সঙ্গী হতে চান তারা এই অঙ্গীকার করুন যে, আজ থেকে এক তরকারি খাবেন। রুটি-তরকারি অথবা ভাত-তরকারি দুই পদ বলে পরিগণিত হবে না বরং দুটি মিলে একটি হবে। রুটির সাথে দুটি তরকারি বা ভাতের সাথে দুটি তরকারি খাওয়ার অনুমতি নেই... তবে দাওয়াত খেতে গেলে অথবা বাসায় অতিথি আসলে ভিন্ন কথা। অতিথির সম্মানের খাতিরে একটির স্থলে দুটি তরকারি রান্না করার অনুমতি আছে। অতিথি যদি বেশি দিন অবস্থান করে সেক্ষেত্রে ঘরে এক তরকারির রাখার চেষ্টা করুন। অথবা কারও যদি অন্য কোথাও দাওয়াত থাকে আর দাওয়াত প্রদানকারীরা একাধিক তরকারি খেতে পিড়াপিড়ি করে তবে সে খেতে পারে অথবা তার ঘরে যদি অন্য কেউ খাবার পাঠায় তাতে কোন সমস্যা নেই। অথবা এক বেলার খাবার কিছুটা বাঁচিয়ে পরের বেলায় খাওয়া যেতে পারে। অতিথি যদি জামা’তের প্রতিনিধি হয় তাহলে মেযবানকে একাধিক খাবার রান্না করাতে বাধ্য করবেন না। প্রত্যেক

আহমদীর জন্য এটি বাধ্যতামূলক নয় বরং কেবল তাদের জন্য আবশ্যিক হবে, যারা আমার কাছে নিজেদের নাম লেখাবেন।”

[০৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালের জুমআর খুতবায় হুযূর (রা.) এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেন। আল-ফযল ১৯৩৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় উক্ত খুতবা প্রকাশিত হয়]

হুযূর (রা.) বলেন: “পোশাক-আশাক সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা এখন আমার মাথায় নেই। কিন্তু আমি কিছু সাধারণ নির্দেশনা দিচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ যাদের কাছে পর্যাপ্ত কাপড় আছে তারা যেন তা নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন কাপড় তৈরি না করে। আর যাদের অধিকহারে নতুন কাপড় তৈরি করার অভ্যাস আছে, তারা যেন এ অভ্যাসকে অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগে নিয়ে আসে....। মহিলাদের জন্য সবচেয়ে আবশ্যকীয় কথা হল, তারা যেন কেবল শখ করে কাপড় ক্রয় না করে....। তবে প্রয়োজন হলে ক্রয় করবে। মহিলাদের জন্য দ্বিতীয় নির্দেশনা হল, এই সময়ে তারা যেন কোন লেইস-ফিতা বা কাতান ইত্যাদি ক্রয় না করে....।”

এ বিষয়ে তৃতীয় শর্ত হল, “যে-সকল মহিলা এই স্কিমে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় তারা যেন কোন নতুন অলংকার তৈরি না করেন এবং যে-সকল পুরুষ এই তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত হবেন, তারাও অঙ্গীকার করবেন যে, তারা নিজ স্ত্রীদেরকে নতুন অলংকার তৈরি করে দেবেন না। পুরাতন অলংকার ভেঙ্গে নতুন করে বানাতেও নিষেধ আছে....। আমরা যখন যুদ্ধ করতেই চাচ্ছি তখন কেন অযথা অর্থ অপচয় করব। স্বাচ্ছন্দ্যের দিনগুলোতে এমন বৈধ কাজগুলোর ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু যুদ্ধের দিনগুলিতে এক পয়সা হলেও তা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তবে হ্যাঁ, ভেঙ্গে যাওয়া অলংকার মেরামত করার অনুমতি আছে....। চিকিৎসার বিষয়ে আমি পূর্বেই বলেছি— ডাক্তার ও চিকিৎসকরা যেন ব্যবস্থাপত্রে স্বল্পমূল্যের ঔষধ লেখেন।”

পাঁচ নম্বর হল, “সিনেমা ইত্যাদি দেখে অর্থ ব্যয় করা। এ বিষয়ে আমি জামা’তের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে বলছি, আগামী তিন বছর পর্যন্ত কোন আহমদী যেন সিনেমা, সার্কাস এবং থিয়েটার ইত্যাদি, মোটকথা এ ধরনের কোন (আমোদিত) প্রদর্শনী দেখতে না যায়।”

ছয় নম্বর হল, “বিয়েশাদিতে ব্যয়। এটি যেহেতু আবেগের জায়গা এবং

অবস্থার ওপর নির্ভর করে, তাই আমি বলছি না যে, এত জোড়া স্বর্ণালংকার দিতে হবে, এর বেশি দেওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, আগামী তিন বছর পর্যন্ত এই সকল জিনিস যেন কম করে দেওয়া হয়— এতটুকু অবশ্যই দৃষ্টিতে রাখতে হবে। যে-ব্যক্তি নিজ কন্যাকে অধিক দিতে চান, তিনি কিছুটা স্বর্ণালংকার, কাপড় এবং বাকিটা নগদ অর্থ প্রদান করতে পারেন।”

সাত নম্বর ব্যয় হল, “ঘরের সাজসরঞ্জাম ইত্যাদিতে ব্যয়। এ সম্পর্কেও কোন বিশেষ কিছু আমার মাথায় নেই। তবে হ্যাঁ, অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে সাথে এতেও পরিবর্তন সাধন হতে পারে। মানুষ যখন সাধারণ খাবার খাবে এবং অনাড়ম্বর পোশাক পরিধান করবে, তখন এই (সাজসরঞ্জাম)-এর বিষয়ে মানুষ কৃচ্ছতা সাধন করবে। যখন খাবার এবং পোশাক-আশাক সাধারণ হয়ে যাবে তখন এমনিতেই মানুষ এদিকে কম দৃষ্টি দিবে। অতএব যারা এই ক্ষিমে অন্তর্ভুক্ত হবে, তারা যেন সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে অযথা অর্থ অপচয় না করেন। এ বিষয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করছি...”

আট নম্বর হল, “শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়। খাবারদাবারে যে ব্যয় হয় সেক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধনের বিষয়টি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া যে-সব ব্যয় আছে তার মধ্যে টিউশন ফি বা হাতিয়ার অথবা যন্ত্রপাতি ক্রয়, মুদি মালামাল আর বই-পুস্তক ক্রয়ে যে ব্যয় হয়, এক্ষেত্রে কৃচ্ছতা করতে গেলে তা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। তাই আমি এক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধন করতে বলছি না বরং এর সুযোগও নেই। অতএব সাধারণ অবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধনের জন্য আমি উল্লিখিত আটটি কুরবানী করার নির্দেশনা দিচ্ছি।”

(আল-ফযল, ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১০-১২)

দাবি নং ০২

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে অংশগ্রহণ করা

দ্বিতীয় দাবিটি মূলত প্রথম দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট। জামা’তের সদস্যদের মাঝে নিষ্ঠাবান সদস্যদের এমন এক দল গঠিত হবে যারা নিজেদের আয়ের ০৫ ভাগের ০১ ভাগ থেকে শুরু করে ০৩ ভাগের ০১ ভাগ পর্যন্ত জামা’তের কল্যাণে তিন বছর পর্যন্ত বায়তুল মালে জমা করবে। এমতাবস্থায় যতটুকু তিনি বিভিন্ন খাতে চাঁদা আদায় করেন অথবা পুণ্য লাভের আশায় অন্যান্য খাতে ব্যয় করেন অথবা দারুল আনোয়ার কমিটিতে তিনি অংশ নিয়েছেন

(পত্র পত্রিকা বা ইত্যাদির মূল্য ছাড়া) সে সমস্ত টাকা এই অংশ থেকে কেটে রাখবেন এবং বাকি টাকা এই তাহরীকে আমানতস্বরূপ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিকট জমা রাখবেন। [নোট: এই চাঁদার নাম রাখা হয়েছে “আমানতে তাহরীকে জায়েদাদ” (আল-ফযল ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৪ পৃ. ৯)]... সেখান থেকে এক পয়সাও আপাতত নেওয়া যাবে না...। তিন বছর পর জমাকৃত অর্থ নগদ অথবা সেই মূল্যের জমি তাকে ফেরত দেওয়া হবে। আমি উক্ত অর্থ সুরক্ষার জন্য যে কমিটি বানিয়ে দেব, সেই কমিটির জন্য আবশ্যিক হবে, কাউকে যদি অর্থের পরিবর্তে জমি প্রদান করা হয় তাহলে তাকে নিশ্চিত করতে হবে— উক্ত জমি সেই জমাকৃত অর্থ দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে। আমি ছাড়া উক্ত সাব-কমিটির* যারা সদস্য হবেন:

১. মির্যা বশীর আহমদ সাহেব।
২. চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব।
৩. শেখ আব্দুর রহমান সাহেব মিশরী।
৪. মির্যা মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব।
৫. মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব।
৬. মালিক গোলাম মুহাম্মদ সাহেব, লাহোর।
৭. চৌধুরী মুহাম্মদ শরীফ সাহেব, উকিল।
৮. চৌধুরী হাকেম আলী সাহেব, সারগোদা।
৯. চৌধুরী ফাতাহ মুহাম্মদ সাহেব।

* [নোট: এই সাব-কমিটি ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে কাজ শুরু করে এবং মৌলভী ফখরুদ্দীন সাহেব উক্ত কমিটির সেক্রেটারি মনোনীত হন।]

(আল-ফযল, ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪ পৃ. ১২-১৩)

দাবি নং ০৩

ছুটিকালীন সময় জামা'তের সেবায় ব্যয় করা

“আমার তৃতীয় দাবি হল, এ মুহূর্তে শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করা খুবই আবশ্যিক। শত্রু যে-সব নোংরা প্রবন্ধ আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ করছে, তার যথাযথ উত্তর যেন প্রদান করা হয় অথবা উত্তমরূপে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি যেন জনগণের সম্মুখে তুলে ধরা হয় আর আমাদের উন্নতির পথে যে অন্তরায়

সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা যেন দূর করা হয়। এর জন্যও বিশেষ ব্যবস্থাপনা আবশ্যিক, অর্থ আবশ্যিক, লোকবল আবশ্যিক এবং কাজের পদ্ধতি জানা আবশ্যিক...। এই কাজের জন্য তিন বছরের মধ্যে ১৫ হাজার রূপি প্রয়োজন। এ মুহূর্তে কাজ শুরু করার জন্য ০৫ হাজার রূপি প্রয়োজন। পরবর্তীতে ১০ হাজার চাওয়া হবে। এর অধিক যদি জমা হয়ে যায় তাহলে তা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দেওয়া হবে। এই কমিটির কেন্দ্র হবে লাহোরে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটির সদস্য হবেন:

১. পীর আকবর আলী সাহেব।
২. শেখ বশীর আহমদ সাহেব, উকিল লাহোর।
৩. চৌধুরী আব্দুল্লাহ খান সাহেব, ব্যারিস্টার লাহোর।
৪. মালিক আব্দুর রহমান সাহেব, কাসৌরী।
৫. ডা. আব্দুল হক সাহেব, লাহোর।
৬. মালিক খোদাবক্স সাহেব, লাহোর।
৭. চৌধুরী মুহাম্মদ শরীফ সাহেব, উকিল।
৮. শেখ জান মুহাম্মদ সাহেব, সিয়ালকোট।
৯. মির্যা আব্দুল হক সাহেব, উকিল গুরুদাসপুর।
১০. কাজী আব্দুল হামীদ সাহেব, উকিল অমৃতসর।
১১. সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ শাহ সাহেব।
১২. শামস সাহেব আর তিনি যদি বাইরে যান তাহলে মৌলভী আল্লাহ দিত্তা সাহেব (তথা মাওলানা আবুল আতা সাহেব) স্থলাভিষিক্ত হবেন।
১৩. শেখ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব লায়েলপুরী, উকিল।
১৪. মৌলভী গোলাম হোসাইন সাহেব।
১৫. সুফী আব্দুল গফুর সাহেব, লাহোর।

এই কমিটির কাজ হল, আমার দেওয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বিরোধীদের অপপ্রচারের বিপরীতে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মোকাবেলা করা। কিন্তু এই কমিটির কাজ ব্যবসায়িক রীতিতে হবে। বিনামূল্যে প্রচার-প্রচারণা তাদের কাজের মাঝে অন্তর্ভুক্ত নয়।”*

(আল-ফযল, ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪)

দাবি নং ০৪

ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা

“বিপদ-আপদের সময় জাতির লোকদের ছড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’লা মুসলমানদেরকে বলেছেন, মক্কায় যদি তোমাদের বিরোধিতা থাকে তবে কেন তোমরা নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছ না। তোমরা যদি বাইরে ছড়িয়ে পড় তাহলে আল্লাহ তা’লা তোমাদের উন্নতির জন্য অনেক পথ খুলে দেবেন। এখন আমরা দেখছি যে, সরকারের মধ্য থেকে একটি অংশ এমন আছে যারা আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় আর জনসাধারণও একই অভিপ্রায় রাখে। আমাদের মাদানী জীবন কোথা থেকে শুরু হবে— তা আমাদের জানা নেই। নিঃসন্দেহে কাদিয়ান আমাদের ধর্মীয় কেন্দ্র। কিন্তু আমরা জানি না— আমাদের প্রাচুর্য ও উন্নতির কেন্দ্র কোথায়। সেটা ভারতবর্ষের অন্য কোন এক শহরেও হতে পারে অথবা চীন, জাপান, ফিলিপাইন, সুমাত্রা, রাশিয়া, আমেরিকা বা পৃথিবীর যে-কোন দেশেও হতে পারে। তাই যখন আমরা উপলব্ধি করব যে, মানুষ কোন কারণ ছাড়াই জামা’তকে লাঞ্চিত করতে চাচ্ছে, ধ্বংস করতে চাচ্ছে, তখন আমাদের আবশ্যিকভাবে দেশান্তরিত হতে হবে এবং গিয়ে খোঁজ করতে হবে— কোথায় আমাদের মাদানী জীবন শুরু হবে। কোন জায়গার লোক দ্রুতই আহমদীয়াতকে কবুল করবে তা আমাদের জানা নেই।...

নতুন মিশন খোলা যে অনেক ব্যয়বহুল— এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। তাই পুরোনো নিয়মে নতুন মিশন খোলা সম্ভব নয়। এজন্য আমার পরামর্শ হল, দুজন করে লোক নতুন তিনটি দেশে পাঠানো হোক। তাদের মধ্যে একজন থাকবে ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী এবং অন্যজন থাকবে আরবী ভাষায় পারদর্শী। সর্বপ্রথম এমন মানুষ খোঁজ করতে হবে যারা স্বয়ং সকল ব্যয়ভার বহন করবে অথবা কিছুটা ব্যয়ভার বহন করে দিকনির্দেশনা অনুসারে কাজ করবে। উদাহরণস্বরূপ শুধু যাতায়াত ভাড়া নিবে কিন্তু আগে পাথের চাইবে না অথবা যাতায়াত ভাড়া নিজেই প্রদান করবে। ছয় থেকে সাত মাসের ব্যয়ভার আমাদের থেকে নিবে অথবা কিছুটা অর্থ এই কাজের জন্য দিতে সামর্থ্য রাখবে। যদি আশানুরূপ এমন লোক না পাওয়া যায় তবে সেই সকল লোক যারা গত খুতবার পর নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে, তাদের মধ্য থেকে কিছু সদস্য বেছে নেওয়া হবে যাদেরকে কেবল যাতায়াত ভাড়া দেওয়া হবে

এবং ছয় মাসের জন্য সামান্য কিছু খরচ দেওয়া হবে। ঐ সময়ের মধ্যে তারা সে দেশের ভাষা শিখে সেখানে যে-কোন কাজ করবে, পাশাপাশি তবলীগও করবে এবং জামা’তের প্রবন্ধগুলো সে-দেশের ভাষায় অনুবাদ করে বিতরণ করবে। সে-দেশের ব্যবসায়ী এবং আহমদী জামা’তের ব্যবসায়ীদের মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। মোটকথা ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে সে-দেশের সাথে আহমদীয়া জামা’তের যেন এক সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

অতএব আমি এই তাহরীকের অধীনে একদিকে এমন যুবকদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি যারা কিছু খরচের বোঝা নিজে বহন করবে। অন্যথায় ওয়াকফকারীদের মধ্য থেকে একরূপ লোক বেছে নিতে হবে যারা যাতায়াত ভাড়া ও ছয় মাসের খরচ নিয়ে ঐ সমস্ত দেশে তবলীগের কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, যে-দেশে যাওয়ার জন্য তাদেরকে মনোনীত করা হবে। ঐ ছয় মাস তাদের দায়িত্ব হবে তবলীগ করার পাশাপাশি সেখানকার ভাষা শেখা এবং নিজের জন্য এমন কোন কাজ খুঁজে বের করা যা থেকে ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। এই তাহরীকের জন্য আমি আনুমানিক দশ হাজার টাকা ব্যয় ধরেছি। অতএব এই তাহরীকের অধীনে আমার দ্বিতীয় দাবি হল, জামা’তের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ যারা শত শত রূপি বা এর চেয়েও অধিক দেবার সামর্থ্য রাখেন, তারা যেন এই খাতে অর্থ প্রদান করার মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করেন।”

(আল-ফযল, ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪; পৃ. ১৩-১৪)

“এমন যুবকেরা জামেয়া পাশ মোবাল্লেগ হবে না। কিন্তু নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণ করা এবং আমার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তবলীগ করা হবে তাদের দায়িত্ব।”

(আল-ফযল, ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১৩-১৪)

দাবি নং ০৫

বিভিন্ন ঋতুতে বা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত দীর্ঘ ছুটি জামা’তের কাজে ব্যয় করা

“তবলীগের একটি পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে যার জন্য মাসিক সম্ভাব্য ব্যয় একশত রূপি এবং এভাবে বছরে বারশ রূপির প্রয়োজন হবে। তাই যে-সকল বন্ধুদের সামর্থ্য আছে, তারা যেন অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে

আমি দরিদ্রদেরও অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করছি। তারাও এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করে পাঁচ রূপি করে দিতে পারে।”

(এই তাহরীকের নামকরণ করা হয় ‘স্কিমে খাস’) (আল-ফযল, ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪)

দাবি নং ০৬

সাইকেলযোগে তবলীগের উপযোগী এলাকা অনুসন্ধান করা

“ওয়াকফকারীদের মধ্য থেকে এমন পাঁচ জনকে নিযুক্ত করতে চাই যারা সাইকেলে সারা পাঞ্জাব সফর করবে আর কোথায় ধর্মের প্রচার-প্রসারের সুযোগ আছে তা বিস্তারিতভাবে লিখে কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। যেমন কোন্ এলাকার লোকদের ওপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে। কোন্ কোন্ প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তবলীগ করা যেতে পারে। এভাবে আহমদীয়াতের প্রচার সহজ হতে পারে। কোন্ কোন্ জায়গার লোকদের কোন্ কোন্ এলাকার লোকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তাদেরকে পাঠিয়ে সেখানে তবলীগ করা হবে ইত্যাদি। তাই যে পাঁচ ব্যক্তি সাইকেলযোগে যাবে, তাদের মৌলভী ফায়েল অথবা ইন্টার পাশ হওয়া আবশ্যিক। তিন বছরের জন্য তারা নিজেদেরকে ওয়াকফ করবে। তাদেরকে মাসে ১৫ রূপি ভাতা প্রদান করা হবে। তবলীগ করা তাদের প্রধান কাজ নয় বরং তাদের প্রধান কাজ হবে, তবলীগের জন্য যথাযথ স্থান নির্বাচন করা। তারা তবলীগের একটি রূপরেখা প্রস্তুত করবে। যেভাবে সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে জরিপ করে থাকে, ঠিক সেভাবে তারা তবলীগের দৃষ্টিকোণ থেকে পাঞ্জাবের জরিপ করবে। তাদের ভাতা এবং সাইকেল ইত্যাদি মেরামত করার ব্যয় মিলিয়ে মাসে ১০০ রূপি প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পের জন্য মোট সাড়ে সাতাশ হাজার রূপি আবশ্যিক। কিন্তু এর মাঝে সাড়ে সতেরো হাজার রূপি এই মুহূর্তে প্রয়োজন।”

(আল-ফযল, ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪)

দাবি নং ০৭

সরকারি চাকুরিজীবীরা তিন মাস করে ছুটি নিয়ে নিজেদেরকে উপস্থাপন করবেন

“ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মোবাল্লেগদের একটি নতুন রূপরেখা থাকা উচিত আর সেটি হল, সরকারি চাকুরিজীবীরা তিন মাস করে ছুটি নিয়ে

নিজেদেরকে উপস্থাপন করবেন, যেন তাদেরকে সে-সব অঞ্চলে পাঠানো যায় যেখানে তাদের চাকুরির সাথে কোনরূপ সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ গুরুদাসপুর জেলার চাকুরিজীবীদেরকে অমৃতসর প্রেরণ করা হবে, অমৃতসরের চাকুরিজীবীরা কাংগড়া অথবা হুশিয়ারপুর জেলায় কাজ করবেন। মোটকথা নিজের চাকুরির এলাকা থেকে বাইরে এমন স্থানে কাজ করবে যেখানে এখনও আহমদীয়াতের প্রচার হয় নি এবং সেখানে তিন মাস অবস্থান করে তবলীগ করবেন।... এমন বন্ধুদের আবশ্যিক দায়িত্ব হবে, তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যয়ভার বহন করবেন। এ বিষয়টি আমরা দৃষ্টি রাখব, তাদেরকে যেন এতটা দূরে পাঠানো না হয় যেখানে তাদের যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করা কষ্টসাধ্য হয়। তবে কাউকে যদি কোন দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হয় তবে যাতায়াতের পূর্ণ ব্যয়ভার জামা’ত বহন করবে আর বাকি খাবারদাবার ও পোশাক-আশাকের ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করবেন। যাদেরকে বহু দূরে প্রেরণ করা হবে তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কোনরূপ ভাতা বা ভাড়া দেওয়া হবে না।”

(আল-ফযল, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ৫)

দাবি নং ০৮

যুবকদের ০৩ বছরের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করা

“এমনসব যুবক নিজেদেরকে উপস্থাপন করবেন যারা আগামী তিন বছরের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০৫)

দাবি নং ০৯

আত্মীয়স্বজনের মাঝে গিয়ে তবলীগ করা

“যারা তিন মাসের জন্য সময় দিতে পারবেন না তারা মৌসুমি ছুটি বা বাৎসরিক ছুটির দিনগুলোতে নিজেদেরকে ওয়াকফ করবেন। তাদেরকে নিকটস্থ অঞ্চলে কাজে লাগানো হবে। কৃষকদেরও ছুটির সময় আসে। তারা সরকারের পক্ষ থেকে ছুটি পায় না বরং আল্লাহ তা’লার পক্ষ থেকে ছুটি পায়, অর্থাৎ এমন একটি সময় আসে যখন না বীজ বপনের সময় এবং না ফসল কাটার সময়। সেই সময়ে টুকটাক যে কাজ থাকে তা নিজ স্ত্রী-সন্তানদের ওপর অর্পণ করে তারা নিজেদেরকে তবলীগের জন্য উপস্থাপন করতে

পারেন। আমরা তাদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে তাদের জানা কাজে নিয়োজিত করব এবং আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় এর ফলে উত্তম ফলাফল লাভ হবে। উদাহরণস্বরূপ, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ কোন্ এলাকায় আপনাদের আত্মীয়স্বজন আছে এবং কোন্ এলাকার আত্মীয় আহমদী নয়। অতঃপর বলা হবে, আপনারা তাদের কাছে অতিথি হিসেবে যান এবং তাদেরকে তবলীগ করুন।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০৭)

দাবি নং ১০

অ-আহমদীদের উদ্দেশ্যে প্রভাবশালী এবং বিদ্বান সদস্যদের বক্তৃতা দেওয়া

“যারা পদের দিক থেকে অথবা শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে ভাল অবস্থানে আছেন যেমন, ডাক্তার, উকিল অথবা এমন উচ্চ পর্যায়ে চাকুরিরত যাদেরকে মানুষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে, এমন লোকেরা নিজেদেরকে উপস্থাপন করুন যেন বিভিন্ন স্থানে জলসার সময় মোবাল্লেগদের স্থলে আপনাদেরকে পাঠানো যায়...। আমাদের জামা’তে এ-ধরনের লোক চার-পাঁচশর কম হবে না। কিন্তু এ সময় দুই-তিনজন ছাড়া বাকিরা ধর্মীয় বক্তৃতা লেখার বিষয়ে মনোযোগ দেন না। বর্তমানে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব, কাজী মুহাম্মদ আসলাম সাহেব এবং আরও এক দু-একজন যুবক আছেন। একজন হলেন দিল্লীর আব্দুল মজিদ সাহেব যিনি চাকুরিরত অবস্থায় মৌলভী ফায়েল পাস করেন। তিনি ভাল বক্তৃতা করতে পারেন। সীমান্তে কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রয়েছেন...। আমি মনে করি, যদি ভাল অবস্থাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে, হযরত মসীহ্ মাউওদ (আ.)-কে মান্য করার কারণে কীভাবে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে এবং অবস্থার মাঝে কীভাবে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, অতঃপর ডাক্তার, উকিল বা ব্যারিস্টার হয়ে যদি কুরআন ও হাদীসের তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করেন তাহলে শ্রোতাদের হৃদয়ে এর বিশেষ প্রভাব পড়বে...। এই সকল লোক যদি তাদের বক্তৃতার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে বা নোট লেখার জন্য কাদিয়ানে আসেন তাহলে আমি নিজেই তাদেরকে নোট লেখাতে পারি অথবা অন্য মোবাল্লেগ লিখিয়ে দিতে পারেন। এভাবে তাদেরকে সাহযোগিতা করা যেতে পারে...।

পুরানো বন্ধুদের মধ্যে এরূপ দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন মরহুম মীর হামেদ আলী শাহ সাহেব। খাজা সাহেব (খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব)-এর অনেক পূর্ব থেকেই বক্তৃতা দেবার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর মাধ্যমে অনেক লাভ হয়েছে। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বরত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি তবলীগ করার জন্য অনেক ব্যস্ত থাকতেন এবং সিয়ালকোট গ্রামের বড় একটি অংশ তার মাধ্যমে আহমদীয়ায় গ্রহণ করে।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০৮)

দাবি নং ১১

২৫ লক্ষ রুপির রিজার্ভ ফান্ডের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা

“খলীফার প্রকৃত কাজ হল নব নব আক্রমণ রচনা করা এবং ইসলাম প্রচারের জন্য নতুন নতুন পথ উন্মোচন করা, কিন্তু এর জন্য অর্থ বরাদ্দ নেই। সকল অর্থ ব্যবস্থাপনার কাজে অর্থাৎ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কাজে ব্যয় হয়ে থাকে ফলে জামা’তের উন্নতি হ্রাস পাচ্ছে এবং নতুন কোন পথ উন্মোচিত হচ্ছে না...। আজ থেকে দশ বছর পূর্বে আমি রিজার্ভ ফান্ড প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলেছিলাম যেন উক্ত আয় থেকে আমরা জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধৃত কাজ সম্পাদন করতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, জামা’ত এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নি এবং কেবল বিশ হাজার রুপি জমা করেছে। এর মধ্যে থেকে কিছু অর্থ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া একটি জমি ক্রয়ের কাজে ব্যয় করেছে এবং কিছু অর্থ কাশ্মীরের কাজের জন্য ধার নেওয়া হয়েছে এবং খুব অল্পকিছু অর্থ অবশিষ্ট আছে। এই অর্থ এতই কম, যা দিয়ে রিজার্ভ ফান্ডের ভিত্তি রাখা সম্ভব না। জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধৃত কাজ সম্পাদনের জন্য অনেক অর্থ প্রয়োজন। অতঃপর উক্ত অর্থ থেকে জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধৃত কাজের জন্য ব্যয় করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা এই ফান্ডকে দৃঢ় করার জন্য রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় সেখান থেকে ব্যয় করা যায়...। জামা’তকে স্মরণ রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধৃত কাজের জন্য অর্থের এক বৃহৎ অংশ খলীফার অধীন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও জামা’তের প্রসার ও মহিমা প্রতিষ্ঠাকারী কাজ সম্পাদন হতে পারে না।”

(আল-ফযল, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ৯)

দাবি নং ১২

পেনশনপ্রাপ্ত সদস্যরা নিজেদেরকে জামা’তের জন্য উপস্থাপন করবে

“পেনশন লাভকারী এমন বহু লোক যারা ঘরে বসে আছেন। আল্লাহ তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন, তারা চাইলে ছোট সরকারের কাছ থেকে পেনশন নিয়ে বড় সরকারের কাজ করবেন অর্থাৎ ধর্মের সেবা করবেন...। উক্ত ক্ষিমের অধীনে তাদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে অথবা যেখানে উপযুক্ত মনে হয় সেখানে তাদেরকে তদারকির দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১০)

দাবি নং ১৩

সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের শিক্ষালাভের জন্য কাদিয়ান প্রেরণ করা

“হে কাদিয়ানের বাইরের বন্ধুগণ! আপনাদের সন্তানদের কাদিয়ানের হাইস্কুল বা মাদ্রাসা আহমদীয়া- যেখানে খুশি সেখানে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করুন...। আমার অভিজ্ঞতা হল, এখানে অধ্যয়নরত ছেলেদের মধ্য থেকে যাদের পরিপূর্ণ সংশোধন হয় নি, তারাও (ইল্লা মাশাআল্লাহ) যখনই কুরবানীর সুযোগ এসেছে তখন ধর্মের সেবা করার জন্য ফিরে এসে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। কাদিয়ানে বসবাসের কারণে তাদের ওপর এরূপ প্রভাব পড়ে...। কাদিয়ানে বড় হওয়া সন্তানদের মাঝে এমন বীজ বপন করা হয় এবং জামা’তের প্রতি ভালবাসা তাদের হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে যায় যার ফলে তারা যেমন-ই হোক, যখনই ধর্মের সেবার জন্য তাদেরকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের হৃদয়ে লাঝায়েকের সুর সৃষ্টি হয় (ইল্লা মাশাআল্লাহ)। কিন্তু এখন আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই তাহরীক করছি। কতিপয় ছেলেদের বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে রাখা হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা যেভাবে তাদেরকে রাখতে চাই সেভাবে রাখতে পারব- এ বিষয়ে যে-সব পিতা সম্মতি দেবেন, তারাই নিজেদের সন্তানদের উপস্থাপন করুন। তাদের বিষয়ে আমি তা’লীম ও তরবিয়তের নাযের সাহেবকে বলব, তারা যেন তাহাজ্জুদ নামায পড়ে- এবিষয়ে বিশেষ তদারকি করবেন। তাদের জন্য যেন

পবিত্র কুরআনের দরস এবং ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের ওপর যেন এমন গভীর প্রভাব পড়ে যাতে তাদের জাগতিক পড়ালেখার ক্ষতি হলেও সেদিকে যেন কোনরূপ দ্রক্ষেপ না করে। তাদের জাগতিক পড়ালেখার ক্ষতিসাধন হোক— আমি এরূপ অভিপ্রায় রাখি না এবং বাহ্যত এর সুযোগও নেই। তবে ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য আমি একথা বলছি অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় তা’লীম ও তরবিয়তের উদ্দেশ্যে সময় ব্যয় করার কারণে জাগতিক শিক্ষায় কোনরূপ ক্ষতি হলেও তাতে যেন দ্রক্ষেপ করা না হয়। এভাবে তাদের জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যা তাদের মাঝে নবজীবন সৃষ্টি করবে।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১০)

দাবি নং ১৪

সন্তানদের উচ্চশিক্ষা এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময় জামা’তের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া

“কতক এমন সচ্ছল লোক আছেন যারা তাদের সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। আমি তাদেরকে বলব, সন্তানদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নিয়ে তারা যেন তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতকে জামা’তের জন্য উপস্থাপন করেন...। সম্প্রতি যে-সকল আহমদী উচ্চপদের সন্ধান করেন, তারা কোন ব্যবস্থাপনার অধীনে করেন না, যার ফলে কিছু বিভাগে আহমদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু বিভাগ একেবারে খালি। অতএব আমি চাচ্ছি যে, উচ্চশিক্ষা একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে হোক আর এ উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। অতপর যারা উচ্চশিক্ষা দিতে চান তারা তাদের সন্তানদের নাম উক্ত কমিটির কাছে উপস্থাপন করবেন। উক্ত কমিটি ছেলেদের সামর্থ্য, তাদের যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে যে, অমুককে পুলিশ বিভাগের জন্য প্রস্তুত করা হবে, অমুককে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হবে, অমুককে বিদ্যুৎ বিভাগে কাজ শিখার জন্য পাঠানো হবে, অমুক ডাক্তারি পড়তে যাবে, অমুক রেলওয়েতে যাবে ইত্যাদি। অর্থাৎ তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাজ নির্ধারণ করা হবে যেন কোন একটি বিভাগ এমন না থাকে যেখানে আহমদীদের একটি বড় অংশের প্রভাব নেই...। অন্যান্য প্রদেশে এই কমিটি তাদের অধীনে আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করবে যারা

তাদের প্রভাব ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে যুবকদের সফল করবে। এ কাজের জন্য আমি যে কমিটি গঠন করছি, তাদের দায়িত্ব হবে এ বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা। এ মুহূর্তে উক্ত কমিটি হবে তিন সদস্যবিশিষ্ট যাদের নাম হল: ১. চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব, ২. খান সাহেব ফারজান্দ আলী সাহেব, ৩. মিয়া বশীর আহমদ সাহেব।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১০)

দাবি নং ১৫

যুবকেরা বিদেশে গিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে তবলীগ করুন

“ঐ সকল যুবক যারা বেকার এবং ঘরে বসে বসে অনু ধ্বংস করছে এবং পিতামাতাকে ঋণগ্রস্ত করছে, তাদের উচিত, তারা যেন দেশ ছেড়ে দেশান্তরিত হয়...। আর যারা বেশিদূর যেতে চায় না, তারা হিন্দুস্তানেই নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে নিক। অনেক যুবক পিতামাতাকে না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে- এ বিষয়টি আমার পছন্দ নয়। এটি অনেক মন্দ কাজ। যারা যেতে চায় তারা যেন পিতামাতাকে অবগত করে যায় আর নিজেদের খবরাখবর জানাতে থাকে।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১০-১১)

দাবি নং ১৬

নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করুন

“জামা’তের বন্ধুগণ নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করুন। আমি দেখেছি, অধিকাংশ মানুষ নিজ হাতে কাজ করাকে অসম্মান মনে করে অথচ এটি অসম্মানের নয় বরং সম্মানের বিষয়...। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর মাঝে কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) মসজিদে আকসায় কুরআনের দরস দিতেন। আমার মনে আছে, আমি তখন ছোট ছিলাম, সাত-আট বছর বয়স হবে। আমরা বাইরে খেলছিলাম। কোন এক ব্যক্তি আমাদের ঘর থেকে বের হয়ে কাউকে ডাক দিয়ে বলছিলেন, বৃষ্টি এসেছে ঘুঁটি (গোবর ও পাটকাঠি দিয়ে বানানো এক প্রকার জ্বালানি) ভিজে যাবে, দ্রুত এসে ভিতরে নিয়ে যাও। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) দরস শেষে ওই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি

সেই ব্যক্তিকে বললেন, চিৎকার করছ কেন? সেই ব্যক্তি বলল, এমন কোন মানুষ পাচ্ছি না যে ঘুঁটি ভিতরে নিতে সাহায্য করবে। খলীফা আউয়াল (রা.) বললেন, তুমি কি আমাকে মানুষ মনে করো না? এটি বলেই তিনি বুড়ি নিয়ে তাতে ঘুঁটি ভরে ভিতরে নিয়ে যাওয়া শুরু করলেন। তাঁর সাথে আরও অনেক মানুষ একত্র হয়ে তাড়াতাড়ি ঘুঁটি ভিতরে নিয়ে গেল। একইভাবে মসজিদে আকসার একটি অংশ খলীফা আউয়াল (রা.) নির্মাণ করিয়েছিলেন। এমনই একটি কাজ আমিও করেছিলাম, তবে তা বহু বছর আগের কথা।

নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টির বিষয়ে আমি যে গুরুত্বারোপ করছি, আমার প্রথম সম্বোধিত কাদিয়ানবাসী। এখানের আহমদী মহল্লায় যে-সব উঁচু-নিচু গর্ত আছে। যে-সব রাস্তা অপরিষ্কার। যে-সব ড্রেন অপরিষ্কার বরং কতিপয় স্থানে ড্রেনও নেই— সেখানে ড্রেনের ব্যবস্থা করুন। যিনি তত্ত্বাবধায়ক তিনি এ বিষয়ে তদারকি করবেন। আর যে-সব স্থানে ময়লা পানি জমে থাকে সেখানের আশপাশে বসবাসকারী দশ-বিশজনকে অসুস্থ করছে, সেই পানি নিষ্কাশনের চেষ্টা করুন আর এক একটি দিন নির্ধারণ করে সবাই মিলে মহল্লা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করুন। একইভাবে যখন জামা'তের কোন কাজ থাকবে যেমন লঙ্গরখানা অথবা অতিথিশালার কোন সংস্কারের প্রয়োজন পড়লে শ্রমিক না লাগিয়ে নিজেরাই কাজ করুন আর নিজ হাতে কাজ করে পুণ্য লাভ করুন।

একজন বুয়ুর্গ সম্পর্কে লেখা আছে যে, তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন অক্ষরের ওপর আঙুল রাখতেন। কেউ একজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কুরআনের অক্ষরগুলো চোখ দিয়ে দেখি, মুখ দিয়ে পড়ি এবং আঙুলকেও পুণ্যের অংশীদার বানানোর জন্য অক্ষরের ওপর আঙুল রাখি। অতএব যতটা অংঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুণ্যের কাজে লাগানো যায় ততটাই মঙ্গল। এর পাশাপাশি চেষ্টা-প্রচেষ্টার অভ্যাস সৃষ্টি হবে...। এই তাহরীক প্রথমে আমি কাদিয়ান থেকে শুরু করতে চাই এবং অন্য গ্রামের আহমদীয়া জামা'তগুলোকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন তাদের মসজিদগুলোর পরিষ্কার-পরিছন্নতা এবং এর প্লাস্টারের কাজ নিজেরাই করেন। এর দ্বারা প্রমাণ করুন, নিজ হাতে কাজ করায় কোন লজ্জা নেই। বিভিন্ন পেশা যেমন কামার, কাঠমিস্ত্রি এবং রাজমিস্ত্রির কাজও লাভজনক। মহানবী (সা.) নিজ হাতে কাজ করতেন। একদা খন্দকের যুদ্ধে তিনি (সা.) নিজে পাথর ভাঙেন

এবং মাটি বহন করেন। সাহাবীদের সম্পর্কে জানা যায়, সে-সময় মহানবী (সা.)-এর শরীর দিয়ে যে ঘাম ঝরছিল, অনেকেই তা বরকত লাভের আশায় মুছে নেয়। এটিই তরবিয়ত। পুণ্য ও প্রভাবের দিক থেকেও এটি বেশ উপকারী। যারা দেখবে, তাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মাটি বহন করা এবং পরিশ্রম করায় লজ্জিত হচ্ছে না, তখন তাদের ওপরও এর বিশেষ প্রভাব পড়বে।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১১)

দাবি নং ১৭

বেকারত্ব পরিত্যাগ করুন

“যারা বেকার আছেন তারা যেন বেকার না থাকেন। যদি তারা দেশ ছেড়ে বহির্বিশ্বে যেতে না চান তবে তারা সামান্য কোন কাজ পেলেও তা যেন করেন। সংবাদপত্র বা বই বিক্রি করার কাজে লেগে যান। রিজার্ভ ফান্ডের জন্য টাকা জমা করার কাজ শুরু করুন। মোটকথা কোন এক ব্যক্তিও যেন বেকার না থাকেন, মাসে দুই টাকা হলেও যেন উপার্জন করেন।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১১)

দাবি নং ১৮

সম্ভব হলে কাদিয়ানে গৃহ নির্মাণের চেষ্টা করা

“কাদিয়ানে গৃহ নির্মাণের চেষ্টা করুন। ইতোমধ্যে খোদা তা’লার কৃপায় শত শত মানুষ কাদিয়ানে গৃহ নির্মাণ করে ফেলেছেন। কিন্তু এখনও আরও সুযোগ আছে। কাদিয়ানে যত বেশি আহমদী বসবাস করবে, আমাদের কেন্দ্র ততই উন্নতি করবে...। স্মরণ রাখবেন! কাদিয়ানকে খোদা তা’লা আহমদীয়া জামা’তের জন্য কেন্দ্র আখ্যা দিয়েছেন। তাই এর আবাদিও তদনুযায়ী এত অধিক হওয়া আবশ্যিক যা জামা’তের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে। বর্তমান অবস্থা নিরিখে আমার পরামর্শ হল, কাদিয়ান, ভিনি এবং নাঙ্গলকোট ছাড়া যথাসম্ভব অন্য কোন গ্রামে বসবাসের জন্য যেন জমি ক্রয় করা না হয়। বর্তমানে ভিনি ও নাঙ্গলকোটে আমাদের আবাদি বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১১)

দাবি নং ১৯

তাহরীকে জাদীদের সফল্যের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করা

“জাগতিক উপকরণ যতই হোক না কেন, অবশেষে তা জাগতিক-ই। আমাদের উন্নাতি জাগতিক উপকরণের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং ঐশী উপকরণের মাধ্যমে হবে। একটি বিষয় যদিও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তবুও সেটিকে আমি শেষে রেখেছি তা হল, দোয়া। যারা তাহরীকে জাদীদ স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারবেন না, তারা বিশেষভাবে দোয়া করুন— যারা কাজ করতে সক্ষম, খোদা তা’লা তাদেরকে যেন কাজ করার সামর্থ্য দেন এবং তাদের কাজে বরকত দেন...। অতএব যারা প্রতিবন্ধী এবং অন্য কেউ খাওয়ালে তার কপালে খাবার জোটে, যারা অন্যের ওপর ভর করে শৌচাগারে যায়, সেসব অসুস্থ ব্যক্তি যারা বিছানায় পড়ে গেছে এবং তাদের মনের আকাজক্ষা হল, হায়! আমাদের যদি শক্তি থাকতো এবং আমরা যদি সুস্থ হতাম তাহলে আমরা এখন ধর্মের সেবা করতাম। তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, যাদেরকে খোদা তা’লা ধর্মের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন তাদের জন্য দোয়া করুন। আপনারা নিজেদের দোয়ার মাধ্যমে খোদা তা’লার দ্বারে কড়া নাড়েন এবং বিছানায় শুয়ে খোদা তা’লার আরশ কাঁপিয়ে দিন যেন সফলতা ও বিজয় লাভ হয়। এছাড়া যারা নিরক্ষর আর কেবল নিরক্ষরই নয় বরং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এবং নিজ স্থলে বসে পরিতাপ করে বলছে, হায়! আমরাও যদি আলেম হতাম। হায়! আমাদের স্মৃতিশক্তি যদি প্রখর হতো আর আমরাও যদি তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হতে পারতাম। তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, তাদেরও সেই একই খোদা যিনি উন্নতমানের শব্দচয়ন দেখেন না, উন্নত বক্তৃতা দেখেন না বরং তিনি মানুষের হৃদয় দেখেন। তারা যেন নিজেদের সরল মনে দোয়া করেন, তাহলে খোদা তা’লা তাদের দোয়া কবুল করবেন এবং তাদেরকে সাহায্য করবেন।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ১২)

দাবি নং ২০

ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা

“সব জায়গার সকল আহমদীকে একত্রিত করে পুনরায় তাদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিতে হবে— তারা ইসলামী সভ্যতা এবং এর শিক্ষা

অনুসারে তাদের জীবনযাপন করবে আর ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করবে, যেন স্বল্পতম সময়ে সেই সকল রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যা প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) প্রত্যাदिষ্ট হয়েছিলেন।”

(খুতবা জুমুআ, ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৮)

দাবি নং ২১

জাতীয় অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠা করা

“জাতীয় অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠা নৈতিক দিক থেকে চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যথা: সততা, সত্যবাদিতা, স্বাস্থ্য এবং কুরবানী। এই চারটি বিষয় যদি তোমরা নিজেদের মাঝে বিকশিত করতে পারো তাহলে তোমরা অবশ্যই সফল হবে।”

(খুতবা জুমুআ ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৮)

দাবি নং ২২

নারী-অধিকার সংরক্ষণ করা

“নারীদের যেন সম-অধিকার দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতি যেন বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। বিশেষকরে যখন একাধিক স্ত্রী থাকবে তখন তাদের আবেগ-অনুভূতি বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া উচিত। অন্যথায় একাধিক বিবাহ না করা উত্তম। তবে যদি করা হয় তাহলে তাদের প্রতি পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে হবে অন্যথায় একজনকে তালাক দিয়ে দিন।”

দাবি নং ২৩

রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা

“নিজ হাতে কাজ করে সমস্ত রাস্তা প্রশস্ত ও সোজা করা উচিত এবং উঁচু-নিচু জায়গাগুলো সমতল করা উচিত। এছাড়া ময়লা অপসারণ করা আবশ্যিক যাতে অন্যরা প্রবেশ করেই বলতে পারে— এটি নিশ্চয় আহমদী মহল্লা বা আহমদী গ্রাম।”

দাবি নং ২৪

আহমদী দারুল কাযা (তথা বিচারবিভাগ) প্রতিষ্ঠা করা

“কেবল সেই মামলাগুলো যেগুলোর ক্ষেত্রে আইনত আদালতে যাওয়া

আবশ্যক- সেগুলো অবশ্যই আদালতে নিয়ে যান কিন্তু বাকিসব মামলা যেন শরীয়ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয় আর এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জামা’তে পঞ্চগয়েত এবং কাযা বোর্ড বানিয়ে নিতে হবে।

দাবি নং ২৫

“কেউ যদি চায় যে, তার বংশধর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক এবং সে ও তার বংশধর সম্মানিত হোক- তাহলে সে যেন নিজ সম্মানদের ধর্মের পথে উৎসর্গ করে দেয়। এটি এমন এক গোপন রহস্য যদ্বারা জামা’তের সদস্যদের উপকৃত হওয়া উচিত। তারা যদি চায় যে, তাদের বংশধর পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করুক এবং শতসহস্র বছর তাদের নাম সম্মানের সাথে জীবিত থাকুক, তাহলে তারা যেন ইব্রাহীম (আ.)-এর আদর্শ অনুযায়ী আমল করে।”

(ঈদুল আযহার খুতবা, ০৯ জানুয়ারি ১৯৪১)

দাবি নং ২৬

সহায়সম্পদ ও আয়-উপার্জন ওয়াক্ফ (তথা উৎসর্গ) করা

আল্লাহ্ তা’লা যেহেতু এ যুগে ইসলামের বিজয়ের একটি ভিত্তি রেখেছেন তাই সুনিশ্চিতভাবে তাঁর অভিপ্রায় হল, তিনি ইসলাম এবং আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে কুরবানী আশা করবেন। জামা’তের সকল সদস্য নিঃসন্দেহে চাঁদা প্রদান করে এবং অনেক টাকা চাঁদা দেয় কিন্তু এই কুরবানী ইসলামের প্রচারে যথেষ্ট নয়। তাই আমার প্রস্তাব হল, (আর এই প্রস্তাবে সর্বপ্রথম আমি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করছি) আমাদের মাঝে যাদেরকে আল্লাহ্ তা’লা সামর্থ্য দিয়েছেন তারা নিজেদের সহায়-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ওয়াক্ফ করে দিন। ইসলামের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে জামা’তের পক্ষ থেকে আপনাদের কোন সম্পত্তি চাওয়া হলে তা উপস্থাপন করতে কোনরূপ অজুহাত দেখাবেন না।

(আল-ফযল, ২১ মার্চ ১৯৪৪)

“যাদের সহায়-সম্পদ নেই, তারাও যদি এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হন তাহলে নিজেদের আয়-উপার্জন থেকে ওয়াক্ফ করতে পারেন।”

(খুতবা জুমুআ, ১৪ মার্চ ১৯৪৪)

দাবি নং ২৭

হিলফুল ফুযূল

“এ যুগে ধনীরা গরিবদের সম্পদ লুটপাট করে এবং এ কাজে তারা শান্তি পায়।... আপনারা অঙ্গীকার করুন- আমরা কখনও কারও অধিকার হরণ করব না আর যেখানেই কারও অধিকার হরণ করা হচ্ছে বলে আমরা জানতে পারব, সেখানেই আমরা ছুটে যাব। কেউ আমাদের অবগত করুক বা না করুক, আমরা সেখানে যাব-ই এবং অধিকার বঞ্চিতের অধিকার উদ্ধার করে দেব।”

(আল-ফযল, ২৭ মে ১৯৪৬)

তাহরীকে জাদীদের মোতালবাত (তথা মূলনীতি ও দাবিসমূহ)-এর প্রেক্ষাপট

তাহরীকে জাদীদের উল্লিখিত সাতাশটি মোতালবাত বর্ণনা করার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর এগারোটি উপায় দৃষ্টিপটে ছিল যার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর বলেন- (এই খুতবা ছাড়া হুযূর ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে সালানা জলসার সময় বিশেষত এ বিষয়ের ওপর বিস্তারিত বক্তৃতা করেন যা ১৯৩৫ সালের আল-ফযল পত্রিকায় ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১২ মার্চ এবং ১৪ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়) “আমি এই ক্ষিমে সমন্বিতভাবে বর্তমান সময়ে যা যা প্রয়োজন তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি এবং আমি এর মাঝে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দৃষ্টিপটে রেখেছি...।

১। “জামা’তের ভিতরে ও বাইরে যেন এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে জামা’তের জ্ঞানগত ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হবে...। আমার দৃষ্টিতে এই ক্ষিমের প্রথম উদ্দেশ্য চিন্তাধারায় এমন পরিবর্তন নিয়ে আসা যেন জামা’তের সদস্যরা ধর্ম সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে আমাদের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যেন বোঝা মনে না হয় বরং তা যেন সানন্দে গ্রহণ করা হয়।”

২। “আমার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বিষয় হল, প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করাতে হবে যে, এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে আর এই

স্কিমের প্রভাব সবার ওপর পড়বে। যে-ব্যক্তির বেশি বেশি কাপড় তৈরি করার অভ্যাস আছে, সে যখন আরও কাপড় ক্রয় করতে যাবে, তখন তার মনে হবে— এখন তো আমাদের অবস্থা পাণ্টে গেছে! যখন তার স্ত্রী সবজি বা তরকারির আনতে বলবে আর দুই-তিন পদের পরিবর্তে শুধু এক পদ আনতে বলবে, তখন সে বুঝতে পারবে— এখন আমাদের বেশি বেশি কুরবানী করার সময় এসে গেছে।”

৩। “তৃতীয় যে বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে আছে তা হল, যেভাবে বিভিন্ন দিক থেকে জামা’তের ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে, সেগুলো যেন প্রতিরোধ করা যায়। এখন পর্যন্ত আমরা কিছু পছন্দ অবলম্বন করেছি এবং কিছু দুর্গও তৈরি করেছি। শত্রুদের কিছু আক্রমণ আমরা এখনও প্রতিহত করি নি কারণ, আমাদের অন্যান্য সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে গেলে পরবর্তীতে এদিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে বলে আমার ধারণা ছিল। কিন্তু এই স্কিমে এখন আমি এ বিষয়টি সামনে রাখছি যে, যতদূর সম্ভব সর্বদিক থেকে যেন জামা’তের সুরক্ষা করা যায়।”

৪। “চতুর্থ বিষয় যা আমার দৃষ্টিতে আছে তা হল, জামা’তের পক্ষ থেকে প্রথমে আমরা দু-একটি পথ নির্ধারণ করেছিলাম। সে-পথেই প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করা হতো এবং বাকিগুলো এ কথা বলে ছেড়ে দেওয়া হতো যে, এখন এটি সম্ভব নয়। কিন্তু এখন এই স্কিমের মধ্যে আমি উক্ত বিষয়টি দৃষ্টিতে রেখেছি অর্থাৎ আক্রমণ যেন প্রশস্ত হয় আর বহু দিক থেকে যেন শত্রুর ওপর আক্রমণ করা হয়। আমাদের আক্রমণ যেন একটি কৌশলেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং প্রতিরক্ষার জন্য আমরা যেভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করি, ঠিক সেভাবে আক্রমণের জন্যও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে।”

৫। “পশ্চিমা বিশ্বে যারা পৃথিবীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং যারা দাজ্জালের বিজয়ের সাহায্যকারী, তাদেরকে যেন প্রতিহত করা হয়। ফলে তারা যতই সর্বস্বান্ত হতে থাকবে, ইসলামের ভালবাসা এবং প্রভাব ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই কারণে নিজ হাতে কাজ করা এবং একটি তরকারি দিয়ে খাবার খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি আর এই দুটি বিষয়ই পশ্চিমা বিরোধী।”

৬। “আল্লাহ তা’লার কৃপা লাভ করার জন্য অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে

হবে কেননা আমাদের বিজয় এর মাধ্যমেই সম্ভব। এ জন্য দোয়া করাকেও আমি এই স্কিমের একটি অংশ হিসেবে রেখেছি। এর উদ্দেশ্য হল, আমাদের সকল উন্নতি দোয়ার সাথেই সম্পৃক্ত আর যখন আমাদের হৃদয় থেকে অহংকার দূর হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা’লার কৃপা অবতীর্ণ হতে পারে। ‘মানুষ হিসেবে সবাই সমান’- এই নীতির ওপর ভিত্তি করে শান্তি প্রতিষ্ঠা আল্লাহ তা’লা পছন্দ করেন। এই স্কিমে আমি এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রেখেছি যে, ধনী-গরিবের মাঝে যেন কোন দূরত্ব না থাকে।”

৭। “জামা’তের সদস্যদের অধিকাংশ সদস্যকে তবলীগের জন্য প্রস্তুত করা হোক। ইতঃপূর্বে সবাই এ কাজের জন্য প্রস্তুত হতেন না আর যারা হতেন তারা মোবাল্লেগ হতে পারতেন না। প্রথমদিকে আমাদের জামা’তে তবলীগের কাজ মোবাল্লেগদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ তারা আসবেন। বজুতা করে চলে যাবেন। তারা ছাড়াও আনসারুল্লাহর সদস্যগণ আশেপাশের এলাকায় গিয়ে তবলীগ করে আসতেন আর তা-ও সপ্তাহে একবার এবং এতে তবলীগের অভ্যাস সৃষ্টি হতে পারে না...। অতএব এই স্কিমে এটিও দৃষ্টিতে রাখা হবে যে, তবলীগের গণ্ডি যেন অনেক বেশি প্রশস্ত করা এবং এমন মোবাল্লেগ প্রস্তুত করা হবে যারা বিনা পারিশ্রমিকে তবলীগ করবেন।”

৮। “কেন্দ্রকে এমনভাবে সুরক্ষিত করা হবে যেন বাইরের আক্রমণ থেকে আরও অধিক নিরাপদ থাকে। এ বিষয়টি ভাল করে ভেবে দেখা উচিত যে, একজন সাধারণ সৈনিক এবং একজন সেনা প্রধানের মাঝে কত পার্থক্য, কিন্তু এই পার্থক্য বাহ্যত দেখা যায় না। যেমন ধরুন দৃষ্টি। সৈনিক এবং সেনাপতি দৃষ্টির মাঝে কী পার্থক্য? পার্থক্য হল, সৈনিকের দৃষ্টিশক্তি অনেক প্রখর হয় এবং সেনাপতি বার্ষিক্যের কারণে অতটা প্রখর দৃষ্টিশক্তি রাখে না। একইভাবে দৈহিক দিক থেকে দুজনের মাঝে কী পার্থক্য আছে? পার্থক্য হল, সৈনিক যুবক ও শক্তিশালী হবার কারণে অনেক বোঝা বহন করতে পারে এবং সেনাপতি এতটা বহন করতে পারে না। সৈনিক অনেক সময় পর্যন্ত ক্ষুধা সহ্য করতে পারে কিন্তু সেনাপতি এমনটি করতে পারে না। এ সত্ত্বেও সেনাপতির জীবন হাজার হাজার সৈনিকের চেয়ে অনেক মূল্যবান এবং অনেক সময় সকল সৈন্য তাকে বাঁচানোর জন্য জীবন বাজি রাখে। নেপোলিয়ান যখন ইংরেজ এবং জার্মান উভয় দলের সমন্বিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে অবশেষে পরাস্ত হয়, তখন তার দলের প্রত্যেক সৈনিক নেপোলিয়ানকে বাঁচানোর জন্য এক এক

করে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে কেননা প্রত্যেকেই জানতো, নেপোলিয়ান বাঁচলে ফ্রান্স বাঁচবে অন্যথায় ফ্রান্স ধ্বংস হবে...। কিছু কিছু সময় কিছু জিনিস এমন গুরুত্ব রাখে যে, তার ধ্বংসের ফলে আর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না। যেমন কাদিয়ান ও এর বাইরের ইটের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কাদিয়ানের সম্পর্কে আল্লাহ তা’লা বলেছেন, আমি একে সেভাবে মর্যাদা দান করেছি যেভাবে বায়তুল হারাম, বায়তুল মাকদাস ও মক্কা-মদীনাকে কল্যাণমণ্ডিত করেছি। এখন যদি আমাদের আলস্যের কারণে এর পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় তবে এটি হবে আমানতের খেয়ানত। তাই কাদিয়ানের ইট মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক মূল্যবান এবং এখানের পবিত্র স্থানগুলো সংরক্ষণের জন্য যদি হাজার হাজার আহমদীর জীবনও চলে যায় তবুও তার মূল্য তেমনই যেমনটি একজন কোটিপতির কাছে এক পয়সার মূল্য হয়ে থাকে। অতএব যে-কোন উপায়ে কাদিয়ান এবং এর মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের জন্য ফরয।”

৯। “জামা’তকে এমন এক অবস্থানে এনে দাঁড় করাতে হবে যেন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হয়। আমি এই ক্ষিমে এ বিষয়টিও দৃষ্টিতে রেখেছি যে, ভবিষ্যতে যদি আরও কুরবানী করার প্রয়োজন হয় তবে জামা’ত যেন প্রস্তুত থাকে এবং আরও অধিক উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী তাহরীক না করা সত্ত্বেও জামা’ত যেন উক্ত কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়।”

১০। “আমাদের জামা’তের সম্পর্কে যেন শুধু একটি সরকারের সাথে না থাকে। এখন পর্যন্ত আমাদের সম্পর্ক কেবল একটি সরকারের সাথে অর্থাৎ আফগান সরকার অথচ সেখানে আমাদের জামা’তের সদস্যরা নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না এবং আহমদীরা সেখানে কাজ করতে পারে না। বাকি অন্যান্য দেশ যেমন: ভারত, নাইজেরিয়া, মিশর, মরিশাস ইত্যাদি বৃটিশদের অধীন। ডাচ সরকার ছাড়া অন্য সরকারের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক নেই। কিন্তু ডাচরাও ইউরোপিয়ান ফলে এশিয়ার লোকদের সম্পর্কে ইউরোপিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পাল্টাবে না। আমাদের এমন রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়তে হবে যারা আমাদেরকে শাসন করার পরিবর্তে আমাদেরকে ভাই মনে করবে। পশ্চিমারা শাসক হলেও অধীনদের নিজেদের ভাই মনে করবে। এমনইভাবে দক্ষিণ আমেরিকার লোকও। তারা পূর্বে যেহেতু বহির্বিপক্ষে রাজত্ব করে নি তাই তারা এশিয়ার লোকদেরকে নিজেদের ভাই মনে করে। অতএব আমি এই

স্কিমের মাঝে এ বিষয়টিও দৃষ্টিতে রেখেছি যে, আমরা বাহির্বিশ্বে যাবো এবং সেখানকার সরকারের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করব, কারণ আমরা যেন কোন একটি সরকারের দয়ার ওপর নির্ভরশীল না হই। এমনিতে তো আমরা আল্লাহ্ তা’লার কৃপার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা যে পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন, তা ব্যবহার করা আমাদের জন্য আবশ্যিক। তাই আমাদের সম্পর্ক এতটা বিস্তৃত হওয়া আবশ্যিক যেন আমাদের বিষয়ে কোন সরকার বা প্রজাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন হলেও জামা’ত যেন উন্নতি করতে থাকে।”

১১। “ভবিষ্যত প্রজন্মও যেন এই কষ্টের মাঝে আমাদের সঙ্গী হয়। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে এক বিশেষ পুরস্কার দান করেছেন আর তা হল, হৃদয়ের বেদনা। বর্তমান সরকার আমাদেরকে অপমান করেছে। আহরারীরা যে ব্যথা দিয়েছে তার পুণ্যস্বরূপ এমনটি হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা এর মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে পুরস্কারস্বরূপ একপ্রকার ব্যথা সৃষ্টি করেছেন আর তা তেমনই যেমনটি মাওলানা রুমী বর্ণনা করেছেন যে,

بربلا کیں قوم را حق داده است
زیر آن گنج کرم بنهاده است

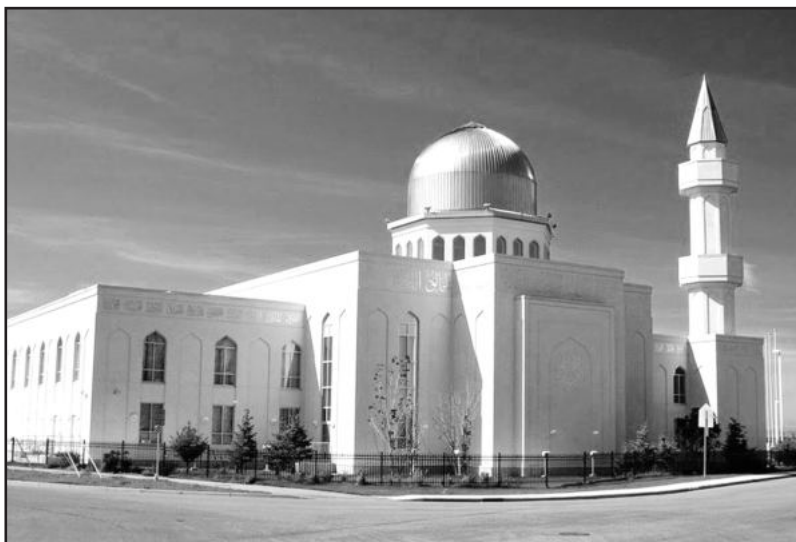
অর্থাৎ, মুসলমানদের ওপর আগত প্রত্যেক প্রকার বিপদের অন্তরালে একটি ধনভাণ্ডার থাকে। অতএব নিঃসন্দেহে এটিও একটি ধনভাণ্ডার যা খোদা তা’লা আমাদেরকে দিয়েছেন অর্থাৎ জামা’তকে জাগ্রত করেছেন এবং যারা অলস ও মন্তুর ছিল, তাদেরকেও বুদ্ধিদীপ্ত করে দিয়েছেন।

অতএব এটি এমন এক ঘটনা ছিল যা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিপর্যয় ছিল কিন্তু খোদা তা’লার দৃষ্টিতে তা ছিল এক রহমতবিশেষ। কেবল বর্তমান প্রজন্ম এতে অংশগ্রহণ করুক— আমি এটি চাই নি বরং আমি চেয়েছি, আগামী প্রজন্মও যেন এ থেকে অংশ লাভ করে আর আমি এই স্কিমকে এমন রূপ দিয়েছি যেন আগামী প্রজন্ম শিয়াদের অবলম্বনকৃত পদ্ধতি নয় বরং বিবেক খাটিয়ে এবং খোদা তা’লার পূর্বকীর পুণ্যবান বান্দাদের অবলম্বনকৃত উন্নত পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে তা স্মরণ রাখতে পারে এবং তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে।”

(আল-ফযল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০৬-০৮)



আহমদীয়া মসজিদ, কেরেলা, ভারত ।



আহমদীয়া মসজিদ, ক্যালগারী, কানাডা ।



মসজিদ বাইতুল আউয়াল, আলবেনিয়া ।



মসজিদ বাইতুল আউয়াল, ব্রাজিল ।



খাদিজা মসজিদ, বার্লিন, জার্মানি।



মসজিদ বাইতুন নাসর, অসলো, নরওয়ে।



আহমদীয়া মসজিদ, নাগোয়া, জাপান।



আহমদীয়া মসজিদ, কামপালা, উগান্ডা।



বায়তুস সালাম মসজিদ, গাম্শিয়া ।



মসজিদ বায়তুল মুকিত, অকল্যাভ, নিউজিল্যান্ড ।

তাহরীকে জাদীদ বাধ্যতামূলক নয় বরং ঐচ্ছিক এক স্কিম

তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণ প্রথম থেকেই ঐচ্ছিক ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহ মাওউদ (রা.) সকল সমস্যার চিত্র জামা’তের সামনে তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি এর নিরাময়ও বলে দিয়েছেন। যারা (এই স্কিমে) অংশগ্রহণ করবে না তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে— এমন কথা তিনি বলেন নি বরং শাস্তি বা পুরস্কার দেবার বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন যেন অংশগ্রহণকারীরা অধিক পুণ্য লাভ করতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী হুযূর (রা.) জামা’তের কর্মকর্তাদের পরিষ্কার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, পুরুষদের ওপর যেন বল-প্রয়োগ করা না হয়। ১৯৩৫ সালের ১৫ জানুয়ারির আগ পর্যন্ত যারা ওয়াদা করবেন, কেবল তাদের চাঁদা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়। তিনি (রা.) কর্মকর্তাদের আরও উপদেশ দিয়ে বলেন, অর্থ স্বল্পতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আল্লাহ তা’লা জামা’তকে পরীক্ষা করতে চান। তিনি আত্মাভিমानी এবং কারও অর্থ-সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। অতএব তাহরীকে জাদীদ পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের স্পষ্ট দিকনির্দেশন দিতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন:

“প্রথমত আপনারা কেবল আমার দিকনির্দেশনা মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন। এরপর পুরুষদেরকে এতে অংশগ্রহণের জন্য অধিক বলপ্রয়োগ করবেন না। তবে হ্যাঁ, মহিলাদের কাছে সংবাদ পৌঁছানো কষ্টসাধ্য এবং মহিলারা বাইরের বিপদ-আপদ সম্পর্কে অধিক অবগত থাকে না। এ কারণে মহানবী (সা.) কেবল পুরুষদের চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলতেন— জান্নাতে কে নিজের ঘর বানাতে চায়? কিন্তু মহিলাদেরকে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে তাদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন বরং বিভিন্ন সময় তাদেরকে পৃথকভাবে উৎসাহিত করতেন।

(হাদীসে বর্ণিত হয়েছে) ‘একদা এক মহিলা একহাতের স্বর্ণের বালা খুলে দিলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, অন্য হাতকেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।’ অতএব মহিলাদেরকে জোরালো তাগিদ দেবার অনুমতি আছে তবে তাদেরকেও বাধ্য করা যাবে না। আর পুরুষদেরকে একেবারেই বলপ্রয়োগ করা যাবে না, কেবল আমার আদেশাবলি তাদের নিকট পৌঁছে দেবেন এবং

যে-কেউ এর মধ্যে অংশগ্রহণ করতে অপারগতা জানাবে, তাকে পিড়াপিড়ি করা যাবে না। কর্মকর্তাগণ তাহরীকগুলো আমাকে দেখিয়ে সেগুলো ছাপিয়ে বৃহৎ পরিসরে প্রচার করুন। পোস্ট অফিসে যেহেতু কখনও কখনও চিঠিপত্র হারিয়ে যায় তাই যে-সব জায়গা থেকে উত্তর না পাওয়া যাবে, দশ-পনেরো দিন পর পুনরায় সেখানে ঘোষণাপত্র পাঠিয়ে দিন। এরপরও যদি উত্তর না আসে, তবে নীরব থাকুন। একইভাবে বাইরের জামা’তসমূহের সেক্রেটারিদের আবশ্যিক দায়িত্ব হল, তারা যেন আমার খুবাসমূহ জামা’তের সদস্যদের পড়ে শোনান। যারা একত্রিত হবে তাদেরকে একত্রে শোনাবেন আর যারা একত্রিত হতে পারবে না, তাদেরকে তাদের ঘরে গিয়ে শোনাবেন। কিন্তু এ তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য পিড়াপিড়ি করবেন না, আর যে অপারগতা দেখাবে, তাকে বাধ্য করবেন না।”

তিনি (রা.) আরও বলেন, “তৃতীয় যে বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখতে হবে তা হল, হিন্দুস্থানের সকল আহমদী তাদের চাঁদা ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৫ তারিখের মধ্যে আদায় করবেন। যার চাঁদা ১৬ জানুয়ারিতে আসবে বা যারা ১৫ জানুয়ারির পূর্বে ওয়াদা করেন নি, তা যেন গ্রহণ করা না হয়। প্রথমে আমি এক মাস সময় নির্ধারণ করেছিলাম। অধিকাংশ সদস্যরা যেহেতু এই মাসের বেতন ব্যয় করে ফেলেছে, তাই আমি এই সময়সীমা ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করলাম। যে অর্থ ১৫ জানুয়ারির মধ্যে আসবে এবং যাদের ওয়াদা উক্ত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে করা হবে— তা যেন গ্রহণ করা হয়। কৃষক বন্ধুগণ যারা ফসলের ওপর চাঁদা দেন বা এমন বন্ধুগণ যারা কিস্তি আকারে চাঁদা দিতে চান, তাদের জন্য ১৫ জানুয়ারির মধ্যে আদায় করা আবশ্যিক হবে না, তবে তাদেরকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে অবশ্যই ওয়াদা করতে হবে। যে অর্থ বা ওয়াদা ১৬ জানুয়ারিতে আসবে তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। হিন্দুস্থানের বাইরের জামা’তগুলোর জন্য এই সময়সীমা ০১ এপ্রিল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হল। যাদের চাঁদা বা ওয়াদা উক্ত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আসবে, তা গ্রহণ করা হবে কিন্তু এর পরে আসলে নেওয়া যাবে না। এই অবস্থার নিরিখে যে-সকল সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে চান তাদের জন্য আবশ্যিক, তারা যেন নিজ ওয়াদা উক্ত তারিখের মধ্যে প্রেরণ করে দেন। চাঁদা ফেব্রুয়ারি, মার্চ বা এপ্রিল মাসে পাঠাতে পারেন। যে-সকল বন্ধু বড় অঙ্কের অর্থ তথা মাসিক দশ, বিশ, ত্রিশ অথবা চল্লিশ রূপি দিতে চান, তারা কিস্তিতে আদায় করতে পারেন আর যারা

এর থেকে বেশি আদায় করতে আগ্রহী, তাদেরকে এক বছর সময় দেওয়া যেতে পারে। তবে এমন লোকদের ওয়াদাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসে যেতে হবে। এই মেয়াদের পর কেবল ঐ সকল সদস্যদের নিকট হতে চাঁদা বা ওয়াদা নেওয়া হবে যারা কসম খেয়ে বলবে যে, যথা সময়ে তাদের নিকট সংবাদ পৌঁছায় নি। উদাহরণস্বরূপ এমন মুমূর্ষু রোগী যিনি সংবাদ পান নি অথবা এমনসব সদস্য যারা দূর দেশে বসবাস করেন।

অতএব কর্মকর্তাদের এই বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জামা'তের ওপর এমন মুহূর্তও আসে যে, তিনি একটি পার্থক্য তৈরি করতে চান। তাঁর আকাঙ্ক্ষা হল, কিছু মানুষ যেন পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। অতএব যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পশ্চাত্তপদ রাখতে চান তাদেরকে অগ্রসর করার কোন অধিকার আমাদের নেই। তাঁর পথে অন্তরায় হবার আমরা কে? আমাদের মূল উদ্দেশ্য অর্থ নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্র ধর্মের মাহাত্ম্যকে কীভাবে প্রকাশ করা যায়— সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা ভীষণ আত্মাভিমानी। তিনি কারও অর্থের মুখাপেক্ষী নন। এই সাড়ে সাতাশ হাজার রূপির ওপর ধর্মের বিজয় নিহিত— এমনটি মনে করো না। কিছু লোক এই তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত না হলে এই অর্থ কীভাবে পূর্ণ হবে— এ বিষয়টি নিয়েও দৃষ্টিস্তা করো না। আল্লাহ্ যখন এই কর্ম সম্পাদন করতে মনস্ত্ব করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই করে দেখাবেন। এই অর্থ একত্র না হোক— এটিই যদি আল্লাহ্র অভিপ্রায় হয়ে থাকে তাহলে উক্ত অর্থ ছাড়াই আল্লাহ্ কার্যসম্পাদন করে দিবেন। অতএব পুরো অর্থই লাগবে, এমনটি ভাবার প্রয়োজন নেই। কর্মকর্তাদের কাজ কেবল এই তাহরীক লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং দশ-পনেরো দিন পর পুনরায় স্মরণ করানো। একইভাবে জামা'তের সেক্রেটারিগণ বন্ধুদের কাছে এই তাহরীক পৌঁছে দেবেন। তবে এটি যেন বলা না হয় যে, এ তাহরীকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। যে এই তাহরীকে অংশ নিতে অপারগতা দেখাবে তাকে বলা যাবে না- অংশগ্রহণ করুন, কেননা যে-ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এ তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে চায় না, তাকে এই পবিত্র তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে দেখা খোদা তা'লার অভিপ্রায় নয়। এমন ব্যক্তি যদি অন্যের পিড়াপিড়িতে উক্ত তাহরীকে অংশগ্রহণ করেও, তবে সে আমাদের পবিত্র সম্পদ অপবিত্র করবে। তাই আমাদের পবিত্র সম্পদে তার অপবিত্র সম্পদ মিলিয়ে এর বরকতে ঘাটতি সৃষ্টি করো না।”

(আল-ফযল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০৯-১০)

সাড়ে তেরশ বছর পূর্বের তাহরীক

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এই ক্বিমের নাম রাখেন তাহরীকে জাদীদ (নব-আন্দোলন) কারণ অনেকের জন্য নতুন জিনিস আকর্ষণীয় হয়। অন্যথায় এই তাহরীকের উদ্দেশ্যে মূলত আহমদীয়া জামা‘তকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ সাড়ে তেরশ বছর পেছনে নিয়ে যাওয়া। এ দিক থেকে এটি এমন এক প্রাচীন তাহরীক যার প্রত্যেকটি শব্দ পবিত্র কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত করা যায়। তাই হুযূর (রা.) প্রারম্ভেই বলে দিয়েছিলেন— “একথা মনে করো না যে, তাহরীকে জাদীদ আমার পক্ষ থেকে সৃষ্ট বরং এর প্রতিটি শব্দ আমি পবিত্র কুরআন থেকে সাব্যস্ত করে দিতে পারি আর প্রত্যেক আদেশ মহানবী (সা.)-এর আদেশের মাঝে দেখাতে পারি। কিন্তু চিন্তাশীল মস্তিষ্ক এবং ঈমানদার হৃদয়ের প্রয়োজন। অতএব একথা ভেবো না, আমি যা বলেছি তা আমার পক্ষ থেকে বলেছি বরং তিনি বলেছেন যার হাতে তোমাদের প্রাণ। আমি যদি মারাও যাই তবুও তিনি অন্য কাউকে দিয়ে এ কথাই বলাবেন আর তার মৃত্যুর পর অন্য একজনকে দিয়ে এ কথা বলাবেন। যাহোক, তিনি এই কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করবেন না যতক্ষণ তিনি তোমাদেরকে দিয়ে এর বাস্তবায়ন না করান। এটি হল প্রথম পদক্ষেপ, এরপর আরও অনেক পদক্ষেপ আছে। এ কথাগুলো পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আছে আর তোমরা যখন প্রথম নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবে, তখন আরও নির্দেশনা দেওয়া হবে।”

(আল-ফযল, ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ১১)

এ বিষয়টি অন্য ভাষায় তিনি (রা.) বলেন:

“তাহরীকে জাদীদ কোন নতুন তাহরীক নয় বরং এটি সেই পুরোনো তাহরীক যা আজ থেকে সাড়ে তেরশ বছর পূর্বে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে জারি করা হয়। ইঞ্জিলের পরিভাষা অনুযায়ী এটি একটি পুরাতন শরাব যা নতুন পাত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এটি মদ নয় যে নেশা সৃষ্টি করবে এবং মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে, বরং এটি সেই শরাব যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলে,

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

(সূরা আস-সাফ্যাত, আয়াত: ৪৮)

অর্থাৎ, এই শরাব পান করলে কেউ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হবে না এবং কেউ অযথা বকাবকি করবে না, কেননা এর বর্ণাধারা সেই ঐশী নূর যা মহানবী (সা.) এ জগতে নিয়ে এসেছেন।”

(বক্তৃতা: ৩১ জুলাই ১৯৩৮)

তাহরীকে জাদীদ সফল হওয়া সম্পর্কে সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত আমীরুল মু’মিনীন (রা.) তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুতবা দেবার পূর্বেই তাহরীকে জাদীদের সফল হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি (রা.) বলেন:

১। “তোমরা যদি সবাই আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাও, তবে খোদা অদৃশ্য থেকে উপকরণ সৃষ্টি করে দেবেন। যে বিষয়টি খোদা তা’লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে বলেছেন এবং যার চিত্র তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন— তা পূর্ণ না হওয়া অসম্ভব। তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, তাই বন্ধু-শত্রু সবাই আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেও খোদা তা’লা স্বয়ং উর্ধ্বলোক থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং এই ভবন নির্মাণ করে তবেই ক্ষান্ত হবেন।”

(আল-ফযল, ০৭ নভেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ০৮)

২। “এতৎসঙ্গেও আমরা বাড়াবাড়িও করব না আর দেশদ্রোহিতাও করব না। আমরা অবশ্যই সরকারের আইনকে শ্রদ্ধা করব। তবে সেই সমস্ত দায়িত্বাবলি পালন করব যে-সব দায়িত্ব জামা’তে আহমদীয়া আমাদের ওপর ন্যস্ত করেছে। এছাড়া আমরা সেই সমস্ত দায়িত্বাবলিও পালন করব যা খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এর ফলে আমাদের ক্ষিম অবশ্যই সফল হবে। আহমদীয়া নামক নৌকার মাঝি সকল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে নিরাপদে একে তীরে পৌঁছে দেবেন। আমি বিশ্বাস করি এবং এর ওপর আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, যাদের ওপর ঐশী জামা’তের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাদের বিচারবুদ্ধি খোদা তা’লার হেদায়াতের অনুসারী হয়ে থাকে এবং তারা খোদা তা’লার পক্ষ থেকে জ্যোতি লাভ করে আর তাঁর ফেরেশতা তাদের হেফাজত করে এবং আল্লাহর রহমানী গুণাবলি দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা হয়। আর যদি তারা জগৎ থেকে বিদায়ও নেয় এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার

কাছে চলেও যায় তবুও তাদের প্রবর্তনকৃত কাজ থেমে যায় না এবং আল্লাহ্ তা’লা তাদেরকে বিজয়ী করেন।”

(আল-ফযল, ১১ নভেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০৪)

৩। “আমি বিশ্বাস রাখি, শুধু বিশ্বাস নয় বরং এমন বিশ্বাস যার সাথে দলিল-প্রমাণও আছে এবং এর প্রত্যেকটি বিষয় আমার মাথায় আছে। আমি বিশ্বাসের সাথে বলছি, অতি উৎসাহী মানুষ এই স্কিমকে হয়ত পছন্দ করবে না কিন্তু আমাদের জামা’তের সদস্যরা যদি সাত্যিকার অর্থে উক্ত স্কিম অনুযায়ী আমল করে তবে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত।”

(আল-ফযল, ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৫, পৃ. ০৪)

দুর্বল প্রকৃতির আহমদীদের অস্থিরতা এবং হযরত আমীরুল মু’মিনীন (রা.)-এর ঈমান উদ্দীপক জবাব

আহমদীয়া জামা’তের নিষ্ঠাবান সদস্যরা এই তাহরীকে কত নিষ্ঠার সাথে লাক্ষ্যক বলেছেন, সে বিষয়ের বর্ণনা পরবর্তী অংশে আসতে যাচ্ছে। এই তাহরীকের ফলে মুনাফিকদের কী প্রতিক্রিয়া ছিল সে-বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন: “আমাদের মাঝে কিছু নির্বোধ এমনও আছে, আমি যখন তাহরীকে জাদীদের ধারাবাহিক খুতবা দেওয়া আরম্ভ করি তখন তারা এবং কাদিয়ানের কিছু মুনাফেক বলতে থাকে, ‘এখন তো (ব্রিটিশ) সরকারের সাথে বিবাদ শুরু করা হয়েছে’, অথচ সরকারের সাথে আমাদের তো মোকাবেলা চলে না?’ তাদের একথা ঠিক যে, সরকারের সাথে আমাদের এক ধরনের মোকাবেলা আছে তবে তা ‘সরকার বড় এবং আমরা ছোট’- এই কারণে নয় বরং আমরা বড় আর সরকার ছোট- এই কারণে হতে পারে। আল্লাহ্ তা’লা যদি আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে থাকেন আর সুনিশ্চিতভাবে তিনিই আমাদেরকে দাঁড় করিয়েছেন, তাই আমরা যদি নিহত হই তবে আমাদের মৃত্যু মৃত্যু নয় বরং জীবিত হওয়া...। আল্লাহ্ জামা’ত কখনও মরতে পারে না। রাজত্ব ধ্বংস হয় কিন্তু ঐশী জামা’ত কখনও ধ্বংস হয় না। (ব্রিটিশ) সরকার খুব বেশি কিছু করতে চাইলে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারে অথবা আমাদের কাউকে মামলা দিয়ে ফাঁসাতে পারে, অনেককে হয়ত ফাঁসিও দিতে পারে। তবে কোন ব্যক্তির নিহত হওয়াতে তো জামা’ত

শেষ হয়ে যায় না বরং ঐশী জামা’তের কোন এক ব্যক্তি নিহত হলে খোদা তা’লা তার স্থলে ১০জনকে দাঁড় করিয়ে দেন।”

(রিপোর্ট, মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৭, পৃ. ২১-২২)

অ-আহমদীদের ওপর তাহরীকে জাদীদের প্রভাব

তাহরীকে জাদীদ বিস্তারিত বিবরণ আল-ফযলের মাধ্যমে যখন জনসমক্ষে আসে তখন কিছু অ-আহমদী বন্ধু হুযূর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং এই তাহরীক অনেক পছন্দ করেন। কিছু অ-আহমদী সম্পদশালী পরিবার এই তাহরীকের কিছু দাবি নিজেদের মাঝে প্রচলন করেন। একইভাবে হিন্দু এবং শিখদের নিকট থেকে অনেক চিঠি আসে যা থেকে বুঝা যায় যে, তারা তাহরীকে জাদীদ দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছেন এবং এর একটি অংশের ওপর আমল করতে আগ্রহী। লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জন ডগলাস ইয়াংগ এই তাহরীকের কথা শুনে বেশ প্রশংসা করেন। মোটকথা এই তাহরীক এতটাই কল্যাণকর, ফলে অন্যদেরও এর গুণাগুণ দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

(আল-ফযল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০৪)

দেশীয় পত্র-পত্রিকায় তাহরীকে জাদীদের উল্লেখ

দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতেও তাহরীকে জাদীদের এই স্কিম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা হয়। সংবাদপত্র ‘ইনকিলাব’ লাহোর ১৯৪৩ সালের ০৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় নিম্নোক্ত নোট প্রকাশ করে:

“আহমদীদের ইমাম নিজ অনুসারীদের আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন আগামী তিন বছর চলচ্চিত্র, থিয়েটার, সার্কাস ইত্যাদি একেবারেই না দেখে এবং খাবারদাবার ও পোশাক-আশাকে যেন চূড়ান্ত পর্যায়ে সরলতা অবলম্বন করে। এছাড়া প্রয়োজন ছাড়া যেন নতুন কাপড় তৈরি না করে আর যতটুকু সম্ভব বর্তমান কাপড় দিয়েই দিনাতিপাত করবে এবং তবলীগের জন্য চাঁদা দিবে। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তিবর্গ আজকাল কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে, তাদের এই সুযোগে উপকৃত হওয়া উচিত এবং সাধারণ মুসলমানদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া উচিত যে, তারা আগামীতে চলচ্চিত্রও দেখবে না আর থিয়েটারেও যাবে না এবং সার্কাসের প্রদর্শনীও দেখতে যাবে না। একান্ত প্রয়োজন না হলে নতুন কাপড়

ক্রয় করবে না। এক বেলার খাবারে শুধু একটি তরকারি রান্না করে খাবে এবং ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা অবশ্যই প্রদান করবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিযোগিতা যদি এমন পদ্ধতিতে হয় যার ফলে ইসলাম ধর্মের উপকার সাধন হয় তাহলে সুবহানাল্লাহ তা কতই উত্তম! অর্থাৎ যে-সব মুসলমান তাদের নেতাদের অনবরত চিৎকার-চেচামেচি সত্ত্বেও নিজেদের আর্থিক সংশোধনের দিকে মনোযোগী হয় নি, তারা কাদিয়ানীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এ দিকে মনোযোগী হবে।

কিন্তু আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অন্য দিকেও গড়াতে পারে। এমনও হতে পারে যে, কিছু এমন হযরত দাঁড়িয়ে গেল যারা সিনেমা দেখা ছেড়ে দেওয়াকে আহমদীদের নিজস্ব রীতি মনে করবে আর নিজেরা সিনেমা দেখা শুরু করে দিবে এবং যে ব্যক্তি সিনেমা দেখতে অস্বীকার করবে তাকে কাদিয়ানী বলে প্রচার করবে। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

[অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে- অনুবাদক]। কাদিয়ানীরা যদি এক বেলায় এক তরকারি দিয়ে রুটি খায় তবে প্রত্যেক মুসলমান কমপক্ষে দুই রকম তরকারি রান্না করবে, অন্যথায় সাদৃশ্যের কারণে তাদেরকেও কাদিয়ানী মনে করা হবে। আল্লাহ করুন, এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন না হয় বরং প্রথমে উল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হোক তাহলে মুসলমানরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে।”

(ইনকিলাব; লাহোর, ০৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪)

হিন্দু পত্রিকা ‘মিলাপ’-এ লেখা হয়েছে:

আহমদী খলীফার অনুসরণীয় নির্দেশ

“আহমদীদের খলীফা সাহেব নিজ অনুসারীদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, তারা আগামী তিন বছর পর্যন্ত সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস ইত্যাদি একেবারেই যেন না দেখে এবং খাবারদাবারে যেন একেবারেই সরলতা অবলম্বন করে। এছাড়া প্রয়োজন ছাড়া কাপড় তৈরি করবে না, যথাসম্ভব বর্তমান কাপড় দিয়ে জীবনযাপন করবে এবং তবলীগের জন্য চাঁদা দিবে। এই আদেশ নিঃসন্দেহে অনুসরণীয়। বিশেষ করে ঐ হিন্দুদের জন্য যারা বেদ প্রচার করা একেবারেই ভুলে বসে আছে, অথচ বেদ প্রচারের মাঝেই হিন্দুদের

জীবন নিহিত। হিন্দুরাও যদি নিজেদের অধিকাংশ অর্থকড়ি বেদ প্রচারে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত তবে তা কতই না উত্তম হতো!”

(দৈনিক মিলাপ, ০৫ ডিসেম্বর ১৯৩৪)

তাহরীকে জাদীদের আহ্বানে আহাদীয়া জামা’তের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা ও কুরবানীর অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ এবং অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে প্রশংসা

তাহরীকে জাদীদের স্কিম যদিও একেবারেই বিরূপ পরিস্থিতি এবং সীমাহীন বিপদের মুহূর্তে প্রবর্তন করা হয়েছিল কিন্তু অবস্থা যতটা স্পর্শকাতর ছিল, আহমদীয়া জামা’তের পক্ষ থেকে ততই বিস্ময়কর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন: “যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে জামা’তের বন্ধুরা প্রথম বছরের ঘোষণা অনুযায়ী আমল করেছেন এবং যে স্বল্প সহায়-সম্মল এবং দুর্বল অবস্থা থেকে আমরা এ কাজ গুরু করেছিলাম, এ উভয় বিষয় ঈমানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা রাখে...। তা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, পূর্ববর্তী নবীদের জামা’তকে এমন বিপদসংকুল অবস্থার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। অতএব সেই অসহায়ত্ব ও নিঃসঙ্গতা এবং স্বল্প সহায়-সম্মল মু’মিনদের জামা’তের সাথে আমাদের জামা’তের সাদৃশ্য সৃষ্টি করে আর যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কুরবানী জামা’ত প্রদর্শন করেছে তা-ও আমাদেরকে মু’মিনদের জামা’তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে। মোটকথা ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিরোধীদের জন্য এক নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। বিচক্ষণ চিন্তাশীলদের জন্য তা ছিল এক সুস্পষ্ট নিদর্শন অর্থাৎ এ জামা’ত সত্যিই খোদা তা’লার পক্ষ থেকে দাঁড় করানো হয়েছে আর এ জামা’ত পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের জামা’তের পদচিহ্নের অনুকরণে ধাবমান।”

(আল-ফযল, ০২ ডিসেম্বর ১৯৪৯, পৃ. ০৩)

চাঁদার তাহরীক আহ্বান এবং আহমদীয়া জামা’ত

আহমদীয়া জামা’তের বিস্ময়কর উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কুরবানীর সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আমাদের প্রথম তাহরীকে জাদীদের চাঁদার তাহরীক দেখতে হবে। হযূর (রা.) প্রথম বছরের জন্য সাড়ে সাতাশ হাজার

রূপি চাঁদা আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু জামা’ত দেড় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তেত্রিশ হাজার রূপি তাদের প্রিয় ঈমামের সমীপে উপস্থাপন করে এবং এক লাখের অধিক রূপি চাঁদা প্রদানের ওয়াদা করে। হযর (রা.) ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৫ সালে ঘোষণা করেন যে, “আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আহমদীয়া জামা’তের নিষ্ঠাবান সদস্যরা আমার আর্থিক কুরবানীর তাহরীকে যেভাবে অংশ নিয়েছে তা বিরোধীদের চক্ষু উন্মোচন করে দিয়েছে এবং সাহায্যকারীদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। সকল পুণ্যের উৎস সেই আল্লাহ তা’লার সত্তা। তাই আমি সেই পবিত্র সত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কেননা তিনি আমাদেরকে ক্ষুদ্র ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে আমাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। সাড়ে সাতাশ হাজার রূপি চাঁদা প্রদানের তাহরীক করা হয়েছিল। কিন্তু আজকের দিন পর্যন্ত নগদ তেত্রিশ হাজার রূপি পৌঁছে গেছে আর ১৫ জানুয়ারির পূর্বেই মোট ০১ লক্ষ ২৬ হাজার রূপির ওয়াদা এসেছে যা আহ্বানকৃত চাঁদার পৌনে চারগুণ বেশি। এখনও হিন্দুস্তানের বাইরের ওয়াদাসমূহ আসছে।”

(আল-ফযল, ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৫, পৃ. ০২)

আমানত ফান্ড

আমানত ফান্ডের তাহরীকও জামা’তের কাছে অনেক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং নিষ্ঠাবান সদস্যরা এই তাহরীকে আগ্রহের সাথে অংশ নিয়েছেন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এই ফান্ডে পাঁচ হাজার রূপির কাছাকাছি জমা হয় (আল-ফযল, ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৫)। পরবর্তীতে মাসে সাড়ে পাঁচ হাজার রূপির কাছাকাছি জমা হওয়া শুরু হয়।

(আল-ফযল, ০৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ০৭)

আমানত ফান্ড সম্পর্কে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গত এটিও বলা প্রয়োজন যে, আমানত ফান্ডের তাহরীক আহরারী এবং এরপর অন্যান্য নৈরাজ্যের দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন: “আমানত ফান্ডের মাধ্যমে আহরারীদের ভয়ানক পরাজয় হয়েছে। এতই ভয়ানক পরাজয় যে, আমি মনে করি তাদের পরাজয়ে আমানত ফান্ডের ভূমিকা শতকরা ২৫ ভাগ। এতটা কল্যাণ লাভ করা সত্ত্বেও বন্ধুদের সকল অর্থ এখনও সুরক্ষিত আছে।

মোটকথা এই তাহরীক এতই গুরুত্বপূর্ণ, আমি যখনই তাহরীকে

জাদীদের দাবিগুলো নিয়ে গভীরভাবে অভিনিবেশ করি তখন আমানত ফান্ডের তাহরীকের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই আর আমি মনে করি, আমানত ফান্ডের তাহরীক একটি এলহামী তাহরীক কেননা কোন প্রকার চাপ ছাড়া এবং অসাধারণ চাঁদা ছাড়াই এই ফান্ড দ্বারা এমন এমন কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যারাই তা জেনেছে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।”

(আল-ফযল, ০৪ ডিসেম্বর ১৯৩৭, পৃ. ১৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর দোয়ার বরকত

সত্যি বলতে আর্থিক কুরবানীর আহ্বানে জামা’তের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর দোয়ার ফসল। তিনি (রা.) নিজেই বলেন:

“আমি যখন তাহরীকে জাদীদ প্রবর্তন করি তখন আমি জামা’তের সদস্যদের কাছে ২৭ হাজার রূপি আহ্বান করেছিলাম আর আমি আপনাদেরকে নিশ্চিত করছি, আমার মন তখন আমাকে বলছিল, ২৭ হাজার রূপি অনেক বড় অঙ্ক, এত রূপি আদায় হবে না। কিন্তু আমার হৃদয় বলছিল, এই অর্থ ছাড়া কাজ চলবে না। যদিও আমার ধারণা ছিল, এত অর্থ একত্রিত হবে না তবুও আমি ধর্মের প্রয়োজনে এই তাহরীক করি, সাথে দোয়াও করি, হে আমার আল্লাহ্! এই পরিমাণ অর্থ তো আবশ্যিক কিন্তু যাদের কাছে আমি আহ্বান করেছি, তাদের বর্তমান অবস্থার নিরিখে তারা এতটা আদায় করবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি নিজ কৃপায় তাদের হৃদয়ে এ বিষয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি করো যেন তারা তোমার ধর্মের এই প্রয়োজন পূর্ণ করে। এই দোয়ার ফলে জামা’ত ২৭ হাজার রূপির পরিবর্তে এক লক্ষ দশ হাজার রূপি ওয়াদা করে... এবং তা আদায়ও করে।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৪৩, পৃ. ১০৩-১০৪)

মজলিসে আহরারীর সভাপতির স্বীকারোক্তি

দোয়া কবুলিয়াতের এই নিদর্শন আহমদীয়া জামা’তের বিরোধীদেরকেও বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। ১৯৩৫ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে মজলিসে আহরারীর সভাপতি মৌলভী হাবিবুর রহমান সাহেব লুথিয়ানভী একটি বক্তৃতায়

তাহরীকে জাদীদের সফলতার কথা স্বীকার করে বলেন, “আমরা মিয়া মাহমুদের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছি। হিন্দুস্তানে তার এই জামা’ত এক খড়সদৃশ তা সত্ত্বেও তিনি তার জামা’তকে বলেছেন, ‘আমার সাড়ে সাতাশ হাজার রূপি প্রয়োজন, বিনিময়ে জামা’ত তাকে এক লক্ষ রূপি উপস্থাপন করেছে। পরবর্তীতে আবার বললেন, এখন এগারো হাজার রূপি প্রয়োজন, জামা’ত তাকে এর দ্বিগুণ আদায় করে দিয়েছে।*

(আল-ফযল, ২৬ এপ্রিল ১৯৩৫, পৃ. ০৪)

* আহমদীয়া জামা’তের অসাধারণ কুরবানীর বিপরীতে দশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের দাবিকারীদের সাথে জনসাধারণ কীরূপ আচরণ করেছে তা বুঝতে কেবল একটি উদাহরণই যথেষ্ট। ১৯৩৫ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে আহরারীর আমীর মৌলভী আতাউল্লাহ শাহ্ সাহেব বুখারী অমৃতসরের খায়ের উদ্দীন মসজিদে একটি বক্তৃতা করেন। আল-ফযলের প্রতিবেদকের বর্ণনা অনুযায়ী বুখারী সাহেব বলেন, “হে মুসলমানরা! আমি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করব না। আমৃত্যু আমি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করব না বরং মৃত্যুর পরও ছেড়ে যাব না। আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্র তোমাদের থেকে চাঁদা নিবে। আমি যেহেতু এ জগতে থাকা অবস্থায় তোমাদেরকে পরিত্যাগ করছি না, পরকালে গিয়েও না তাই তোমাদের চাঁদা দেবার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অপরাগতা প্রকাশ করা উচিত নয় (এটি বলে তিনি উপস্থিত সবার দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেন, কিন্তু তার ভিক্ষার বুলিতে কেউ একটি দানা-কড়িও দেয় নি) পরে তিনি বলেন, তোমরা কিছু বলছ না কেন? তোমরা কেন চুপ হয়ে আছো? অতঃপর লোকজন উঠে চলে যাওয়া শুরু করে।”

(আল-ফযল, ২১ নভেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ০৯)

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন

জামা’তের নিষ্ঠাবান সদস্যদের এই অতুলনীয় আর্থিক কুরবানীতে আল্লাহ্ তা’লার এক বিস্ময়কর প্রভাব কার্যকর ছিল। যার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর (রা.) বলেন:

“সেই সময় আমাদের আর্থিক অবস্থা এতটা নাজুক ছিল যে, তবলীগী লিফলেট ছাপানোও আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় আমি তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা করি এবং এর একটি অংশ রিজার্ভ ফান্ড হিসেবে রাখি। আমি যখন এর জন্য তাহরীক করি তখন আমার জানা ছিল না যে, আমি কী বলছি। সে-সময় আমি যে বক্তৃতা করি তার ভাষা কিছু অস্পষ্ট ছিল। জামা’ত মনে করে, তিন বছরের জন্য আমি চাঁদা চেয়েছি এবং তা একসাথে দিতে হবে। ফলে যিনি বছরে একশত রূপি চাঁদা দিতে চাইছিলেন তিনি তিন

বছরের চাঁদা তিনশত রূপি একেবারে দিয়ে দেন। এমনও লোক ছিলেন যারা সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারেন। কিন্তু এমনও অনেকে ছিলেন যারা ভুল বুঝেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় এক লক্ষ সাত হাজার রূপি ওয়াদা আসে। যখন দ্বিতীয় বছরের জন্য তাহরীক করা হয় তখন কিছু মানুষ বলতে শুরু করেন, ‘আমরা তো তিন বছরের চাঁদা একেবারে দিয়ে দিয়েছি এখন আমাদের কী করা উচিত?’ আমি বলি, এটি ঐচ্ছিক চাঁদা, আপনারা এখন না-ও দিতে পারেন। কিন্তু তারা বলেন, আমরা কষ্ট সহ্য করব এবং যদি আমাদের কিছু হয়েও যায় তবুও আমরা চাঁদা দেব। একইভাবে যারা তিন বছরের জন্য চাঁদা দিয়ে দিয়েছিলেন, তারা পরবর্তী বছর এরও অধিক চাঁদা দিয়ে দেন, কেননা নিজেদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাদের আত্মা তাদেরকে এ কাজে বাধ্য করেছে। কিছু এমন নিষ্ঠাবান সদস্য ছিলেন যারা তাদের সম্বন্ধে সমুদয় অর্থ প্রদান করেন। একজন পত্রে লিখেছেন যে, দ্বিতীয় বছর আমি লজ্জার কারণে কিছু বলতে পারি নি। আমি আমার কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করে চাঁদা দেই। তৃতীয় বছর সব কিছু বিক্রি করে চাঁদা দেই। এখন চাঁদার পরিমাণ কমাতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু নবম বছরে লেখেন, খোদা তা’লা আমাকে কিছু টাকা জমা করার সুযোগ দিয়েছেন, তাই আমি পূর্বের মত এখন প্রতি বছরই বাড়িয়ে চাঁদা আদায় করব।

মোটকথা আমি যখন তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ঘোষণা করছিলাম তখন খোদা তা’লা পূর্বে ঘোষণাকৃত পঁচিশ লক্ষ রূপি রিজার্ভ ফান্ডের তাহরীকের সফলতার ভিত্তি রাখাছিলেন। প্রথম থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল, এই চাঁদা থেকে রিজার্ভ ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হোক যা তবলীগ ও জামা’তের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে। আমি উক্ত অর্থ দিয়ে জমি ক্রয় করেছি যার ব্যাপ্তি সাড়ে নয় হাজার একর। এটি মূলত তাহরীকে জাদীদের সম্পত্তি।”

(বক্তৃতা, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪)

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার চাঁদার ওপর তাহরীকে জাদীদের সুপ্রভাব

তাহরীকে জাদীদের এক অদ্ভুত কল্যাণ অবতীর্ণ হয় আর তা হল, যেখানে পূর্বে আহমদীয়া জামা’তের চাঁদায়ে আম-এর গতি কিছুকাল যাবৎ কিছুটা মন্থর হয়ে গিয়েছিল, সেখানেও গতি সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে হুযূর (রা.) বলেন:

“এটি খোদা তা’লার কুদরত। ইতঃপূর্বে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া সবসময় ঋণগ্রস্ত থাকত এবং প্রতি বছর তাদের বাজেটে ঘাটতি হতো। আমি যখন এই তাহরীকের ঘোষণা করি তখন নাযেরগণ আমার কাছে এসে অভিযোগ করেন যে, এই তাহরীকের ফলে আঞ্জুমানের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে। আমি তাদেরকে বলি, আপনারা খোদা তা’লার ওপর ভরসা করুন এবং অপেক্ষা করুন আর দেখুন— অবস্থার উন্নতি হয় নাকি অবনতি হয়। এমতাবস্থায় খোদা তা’লা এমন অনুগ্রহ করেন যে, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বাজেট যেখানে দুই আড়াই লক্ষ রূপি হতো তা এই তাহরীকের ফলে চার পাঁচ লক্ষ রূপিতে গিয়ে ঠেকে। এদিকে জামা’তের সদস্যরা বড় অঙ্কের অর্থ তাহরীকে জাদীদ খাতে কুরবানী করতে থাকে এবং আল্লাহ তা’লার কৃপায় প্রথম বছরেই আহ্বানের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি চাঁদা জমা হয়। প্রথম দিন যখন আমি জামা’তের কাছে সাতাশ হাজার রূপির আহ্বান করি তখন সত্যিকার অর্থে আমি এটি মনে করি, আমার মুখ ফসকে এত বড় অঙ্ক বের হয়ে গেছে, তবে এতটা অর্থ জমা হওয়া বাহ্যত অনেক কষ্টসাধ্য। কিন্তু আল্লাহ তা’লার অশেষ কৃপায় সাতাশ হাজার তো বটেই, এখন পর্যন্ত ২৭ হাজারের চেয়ে ৫০গুণ অধিক অর্থ জমা হয়েছে।”

(আল-ফযল ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪, পৃ. ০৭)

মালী কুরবানীর আহ্বানে সর্বপ্রথম অংশগ্রহণকারী জামা’তসমূহ

হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর আহ্বানে লাক্ষ্যক বলে যে জামা’ত অত্যন্ত উচ্চমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেটি হল কাদিয়ানের জামা’ত। এ বিষয়ে হযূর (রা.) বলেন:

“সবচেয়ে বেশি কুরবানীর উদাহরণ এবং উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে কাদিয়ানের জামা’ত...। বর্তমানে কাদিয়ানে প্রায় ০৭ হাজার আহমদী বসবাস করে। ১৯৩১ সালের সরকারি আদমশুমারি অনুযায়ী পাঞ্জাবে বসবাসকারী আহমদীর সংখ্যা ৬৫ হাজার। প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। কিন্তু আমরা যদি উক্ত সংখ্যা সঠিক মনে করে ৭০ হাজারও ধরি তাহলে কাদিয়ানের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় সমস্ত পাঞ্জাবের এক-দশমাংশ। কিন্তু সাড়ে

সাতাশ হাজার রূপির তাহরীকে কাদিয়ান জামা'তের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার রূপির কিছু নগদ ও কিছু ওয়াদা আসে আর এমন এমন লোক এটিতে অংশ নিয়েছেন যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। পরিতাপ করে বলতে হয়, কিছু লোক এমন আছেন যারা আরও বেশি করে চাঁদা দিতে পারতেন কিন্তু কম দিয়েছেন। তবে বড় সংখ্যায় এমন লোক আছেন যারা নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে চাঁদা দিয়েছেন। অনেকে তো তাদের সমস্ত সঞ্চয়কৃত অর্থ দিয়ে দিয়েছেন। আবার কিছু লোক এমন আছেন, যাদের মাসিক আয় চার বা পাঁচ রূপি তারা জোটবদ্ধ হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। আবার অনেকে সম্পদ বিক্রি করে যা গচ্ছিত রেখেছিলেন তার সবটাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। বাইরের জামা'তগুলোর মধ্য থেকে অনেক জামা'তের উত্তর এসেছে এবং অনেকেরটা এখনও আসে নি অথবা আসা সম্ভব না। কিন্তু বাহ্যত মনে হচ্ছে, কাদিয়ান জামা'ত প্রথম স্থান অধিকার করবে। কাদিয়ান জামা'ত রীতি অনুযায়ী এ সুযোগে নিজেদের উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। বাইরের জামা'তগুলোর মধ্য থেকেও কিছু জামা'ত উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে আবার কিছু জামা'ত এতটাই সাবধানতা অবলম্বন করেছে— যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ লাহোর ছাউনি জামা'তের ওয়াদা কাদিয়ান জামা'তের প্রায় অনুরূপ ছিল। কোন এক বন্ধু এখান থেকে খুতবা শুনে গিয়েছিলেন। তার কথা শুনে জামা'তের সদস্যরা দ্রুত ঐক্যবদ্ধভাবে এ তাহরীকে অংশগ্রহণ করেন। যে সময় কাদিয়ান জামা'তের রিপোর্ট আমার কাছে আসে ঠিক সেই সময় লাহোর ছাউনি জামা'তের রিপোর্টও আমার কাছে আসে।... আপাতদৃষ্টে ১৪ দিনের মধ্যে ১৫ হাজার রূপির কাছাকাছি ওয়াদা এবং ০৪ হাজার রূপি নগদ এসেছে। এখনও জামা'তের বড় অংশ, বিশেষকরে যাদের আয় বেশি, তারা নীরবতা অবলম্বন করছেন অথবা ঐক্যবদ্ধভাবে ওয়াদা প্রেরণের অপেক্ষা করছেন। কিন্তু অন্য দিকে মধ্যবিত্ত যারা আছেন বা দরিদ্রদের মাঝে অনেকে এমন আছেন যাদের কাছে অর্থ-কড়ি ছিল না, তারা ঘরের আসবাব উপস্থাপন করেছেন আর বলেছেন, আমাদের সকল সহায়-সম্মল নিয়ে নেওয়া হোক। তবে আমরা তা গ্রহণ করি নি কেননা আমি ধনীদের কাছে আশা করেছিলাম। কিন্তু এর দ্বারা এতটুকু বুঝা গেছে, জামা'তের মাঝে এমন নিষ্ঠাবান বন্ধুরাও আছেন যারা নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে আমার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে যে, অনেক জামা'তের কর্মকর্তারা নিজ জামা'তের সদস্যদের এ কথা বলে চুপ

করাচ্ছেন যে, ‘তাড়াহুড়া করার দরকার নেই, প্রথমে চিন্তাভাবনা করো’, যেন তাদের আরও অধিক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে! দেড়-দুই মাস ধরে আমি খুতবা দিয়ে চলেছি আর সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাও করেছি, এতৎসত্ত্বেও তাদের এখনও চিন্তা করার সুযোগ হয় নি! তাদের এই পরামর্শ সুপরামর্শ নয় বরং হয় এটি তাদের সরলতা নতুবা তাদের কেউ কেউ নিজে কুরবানী করতে ভয় পায় তাই অন্যদেরকেও এ থেকে বিরত রাখতে চায় যেন তাদের নিজেদের অলসতা এবং দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। মহানবী (সা.)-এর যুগে জেহাদের সময় কি প্রথমে চিন্তা করার সুযোগ ছিল? অথবা এ কথা কি বলা হতো যে, তড়িঘড়ি করার প্রয়োজন নেই, আগে চিন্তা করো? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’লা বলেছেন, ‘ফাসতাবেকুল খায়রাত’ অর্থাৎ পুণ্যকর্মে অন্যের তুলনায় অগ্রসর হবার চেষ্টা করো এবং দ্রুত কার্যসম্পাদনের চেষ্টা করো।...

অনেক জামা’ত আমাকে জানিয়েছে, তারা সবার তালিকা একত্র করে পাঠাবে, তাই তালিকা প্রেরণ করতে দেরি হচ্ছে। সে-সব জামা’ত বা জামা’তের সদস্যদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কতক এমন নিষ্ঠাবান সদস্যও আছেন যারা এই কালক্ষেপণকেও সহ্য করতে পারেন নি এবং নিজেরাই অর্থ প্রেরণ করেছেন, জামা’তের জন্য অপেক্ষা করেন নি। এটি বাহ্যত সামান্য বিষয় মনে হলেও আধ্যাত্মিক জগতে এটি অধিক পুণ্য লাভের কারণ হয়।”

(খুতবা জুমুআ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪, আল-ফযল, ২০ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ৫-৬)

বহির্বিশ্বে তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণ

“বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম এক আরব দেশের আহমদীরা তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণ করে। তারা কেবল চাঁদা প্রদানের ওয়াদা-ই করে নি বরং তাদের একাংশ নগদ অর্থও প্রেরণ করে। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফিলিস্তিনের হাইফা জামা’তের পক্ষ থেকে চারশত শিলিং ওয়াদা প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে ৭৫ শিলিং নগদ প্রেরণ করে। এছাড়া মাদ্রাসায়ে আহমদীয়া কাবাবীর (হাইফা)-এর শিশু-কিশোরেরাও আট শিলিং চাঁদা প্রেরণ করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) হাইফা জামা’তের সদস্যদেরকে বিশেষকরে আহমদী শিশু-কিশোরদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং কুরবানীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেন যেন আল্লাহ তা’লা ঐ

শিশু-কিশোরদের আন্তরিকতা কবুল করেন এবং তাদেরকে জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করেন। তাদের আলো কেবল ফিলিস্তিন নয় বরং সমস্ত জগতে যেন ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা যেন আহমদীয়াতের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতে পারে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বানায়। এরাও ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের ন্যায় بِرِّصَاعَةٍ مُّزْجِيَةٍ (ইউসুফ: ৮৯) অর্থাৎ যথাসাধ্য দ্রব্যমূল্য নিয়ে এসেছে। আল্লাহ তাঁলা তাদের সাথেও অনুরূপ আচরণ করুন আর তাদেরকে ইউসুফ নামি হারানো ইসলাম লাভ করার সৌভাগ্য দিন যাকে নিজেদের ইয়াকুব [মুহাম্মদ (সা.)]-এর কাছে নিয়ে এসে নিজ জাতির পূর্ববর্তী দোষ মোচন করতে সক্ষম হবে।”

(আল-ফযল, ০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫, পৃ. ০৮)

হিন্দুস্থানের বাইরে আরও কিছু নিষ্ঠাবান জামা'ত

জামা'তে আহমদীয়া হাইফার অনতিপার ইরান, লন্ডন, বাগদাদ, কামপালা, বানজাবর, দারুস সালাম, টাংঙ্গা, নাইরোবি, জাভা, কলম্ব ইত্যাদি দেশসমূহের জামা'তের পক্ষ থেকে খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর কাছে শুধু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রই আসে নি বরং চাঁদার ওয়াদা ও নগদ অর্থও আসে।*

(আল-ফযল, ১২ মার্চ ১৯৩৭, পৃ. ০৮)

* নোট: বাইরের জামা'তের কিছু দরিদ্র বন্ধু এই সুযোগে নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের উল্লেখযোগ্য উপমা উপস্থাপন করেছেন। যেমন- হিন্দুস্থানের বাইরের একজন মহিলা দুই বছর জাঁতা ঘুরিয়ে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা পূর্ণ করেন।

দ্বিতীয় দাবি এবং আহমদীয়া জামা'ত

আহমদীয়া জামা'ত তাহরীকে জাদীদের আর্থিক জিহাদে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়াও দ্বিতীয় দাবি (তথা দ্বিতীয় আহ্বানে) অসাধারণ আমল করে দেখিয়েছে।

সহজসরল জীবনযাপন

যেমন তাহরীকে জাদীদের সর্বপ্রথম আহ্বান যেটি ইসলামী সভ্যতার ভবনের মৌলিক ইট হিসেবে পরিগণ্য হয় তা হল, সহজসরল জীবনযাপনের আহ্বান।

জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যরা এই আহ্বান অনুযায়ী খাবারদাবার,

চিকিৎসা এবং সিনেমা দেখা ইত্যাদি বিষয়ে প্রিয় ইমামের দিকনির্দেশনা সুচারুরূপে পালন করেন। খাবারের আড়ম্বরতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন। অনেকে বাড়িয়ে চাঁদার ওয়াদা করেন এবং দুই-তিন বছর পর্যন্ত কোন নতুন পোশাক তৈরি করান নি।

(আল-ফযল, ০২ ডিসেম্বর ১৯৩৮, পৃ. ০৬)

অধিকাংশ যুবক সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস ইত্যাদি দেখা পরিত্যাগ করে। যারা এগুলোতে পূর্বে অভ্যস্ত ছিল, তারা এগুলোকে ঘৃণা করা শুরু করে। মোটকথা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানীর (রা.)-এর আদেশে স্বল্প সময়ে জামা’তের মধ্যে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যা অন্যদের ধারণায় প্রায় অসম্ভব ছিল। অমৃতসরের রঙিন পত্রিকার শিখ সম্পাদক অর্জুন সিং লেখেন—

“আহমদীদের খলীফা তাদের পারিবারিক জীবনযাত্রার ওপরও গভীর দৃষ্টি রাখেন, আর বিভিন্ন সময় তিনি তাদেরকে এমন এমন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন যার ওপর আমল করলে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন লাভ হয়। আমি এখানে তাদের খলীফার কিছু দিকনির্দেশনা বর্ণনা করছি, যা থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে- এ জামা’ত কেন উন্নতি করে চলেছে।

১। ইদানীং খলীফা তার অনুসারীদের জন্য যে স্কিম জারি করেছেন তার মধ্যে একটি হল, প্রত্যেক ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবার দস্তরখানে যেন একটির বেশি তরকারি না থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্র এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই নির্দেশনা চমৎকার ফলাফল বয়ে আনতে পারে।

এমনিতে প্রত্যেক সংস্কারক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ অনুসারীদেরকে এ ধরনের দিকনির্দেশনা দিতেই পারে কিন্তু এমন কোন সংস্কারক আছে কি যে দাবির সাথে বলতে পারে যে, তার শতভাগ অনুসারী তার এমন নির্দেশনার ওপর পূর্ণ আমল করতে প্রস্তুত? কেবল কাদিয়ানের খলীফার এই একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে যে, তার এমনসব অনুসারী যাদের দস্তরখানে বহু পদের খাবার থাকতো, তারা নিজ খলীফার আদেশে নিজেদের জীবনধারায় দ্রুত পরিবর্তন এনেছে। আজ কোন ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারবে না যে, কোন আহমদী নিজ খলীফার এই আদেশ অমান্য করেছে।

২। খলীফার আদেশ হল, কোন আহমদী তিন বছর পর্যন্ত নতুন

অলংকার তৈরি করবে না, কোন কারণ ছাড়া নতুন কাপড় ক্রয় করবে না, মহিলারা তাদের কাপড়ের মধ্যে চুমকি, লেইস বা পাড় ইত্যাদি লাগাবে না। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই আদেশ বলবৎ হওয়া মাত্রই সকল আহমদী পুরুষ ও মহিলা সজাগ হয়ে যায় এবং নিজ খলীফার ইশারায় ঐ সকল বিষয় পরিত্যাগ করে। এটি এত বৃহৎ কুরবানী যার ফলে সুনিশ্চিতভাবে এই জামা’ত হিন্দুস্তানের অন্য সকল জামা’তের ওপর বিজয়ী হবে। যারা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং বৈধ চাহিদা পরিত্যাগ করতে সক্ষম, তারা কখনও অবৈধ কামনা-বাসনার বশবর্তী হবে না আর একথা সুনিশ্চিত যে, কামনা-বাসনার অনুসরণই মানুষের অধঃপতন ডেকে আনে। অতএব এ দিক থেকে আহমদীরা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।”

(কাদিয়ান ভ্রমণ, পৃ. ১৭-২০)

এক মাস তবলীগের জন্য ওয়াকফ

তবলীগের উদ্দেশ্যে এক মাসের জন্য ওয়াকফ করার আহ্বানে সাড়া দেবার বিষয়টিও বেশ সুখকর ছিল। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ভিতরে ১৩০০ বন্ধু নিজেদের ছুটি ওয়াকফ করেন (তথা ওয়াকফে আরযী করেন)। (আল-ফযল, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) এবং উত্তর ভারত এবং মধ্য ভারত ছাড়াও দক্ষিণ ভারত যেমন মহীশূর, মাদ্রাজ, কলম্ব এবং বোম্বে ইত্যাদি এলাকায় তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর পক্ষ হতে এমন ব্যক্তিদের কাছে দোয়াসম্বলিত সম্ভ্রষ্টিমূলক পত্র প্রেরণ করা হতো।

(আল-ফযল, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬)

তিন বছরের জন্য ওয়াকফ

মৌলভী ফায়েল, বি.এ., এফ.এ. এবং ইন্টার পাস করা কমপক্ষে দুইশত যুবক নিজেদেরকে তিন বছরের জন্য ওয়াকফ করেন।

(আল-ফযল, ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৭, পৃ. ০৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন: “কুরবানীর এই প্রেরণা অর্থাৎ তিন বছরের জন্য ধর্মের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা ইসলাম এবং ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব সাধারণ বিষয় হতে পারে কিন্তু বর্তমান যুগের

নিরিখে এটি বিস্ময়কর এক কাজ...। আহমদীয়া জামা’তের চেয়ে হাজারগুণ বড় জামা’ত থাকলেও তাদের মাঝে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার।”

(আল-ফযল, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০৫)

অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের বাকী জীবন উৎসর্গীকরণ

অবসরপ্রাপ্ত কিছু সদস্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নির্দেশ পালনে এগিয়ে আসেন এবং মরকযের কাজে যোগ দেন।... হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তার একটি খুতবায় বিশেষভাবে তাদের সেবার উল্লেখ করেন।

(আল-ফযল, ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৬, পৃ. ০৮)

বেকার যুবকদের প্রতি আহ্বান

বেকার যুবকেরা যেন বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে— হুযূরের এই আহ্বানে যুবকেরা নিজেদের ঘর থেকে রিক্তহস্ত বেরিয়ে পড়া সত্ত্বেও প্রবাসে পৌঁছে যায়। অতএব খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯৩৫ সালের প্রথমদিকে বলেনঃ “রেঙ্গুন থেকে জামা’তের দুইজন বন্ধু আমার কাছে পত্র লিখেছে। তাদের মধ্যে একজন জলন্ধরের অধিবাসী এবং অন্য জন জলন্ধরের আশপাশের অধিবাসী। তারা লিখেছেন— আমরা আপনার উক্ত তাহরীকের অধীনে পদব্রজে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি আর আমরা হাঁটতে হাঁটতে রেঙ্গুন (মিয়ানমার) এসে পৌঁছেছি এবং আরও সুখে অগ্রসর হচ্ছি। কোথায় জলন্ধর আর কোথায় রেঙ্গুন; পনেরো শত (১৫০০) মাইলের সফর কিন্তু তারা সাহস করেছেন এবং পৌঁছে গেছেন। পশ্চিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন কিন্তু দুই মাস অসুস্থ থাকার পর পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। এখন তারা সেটেলমেন্ট এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সাহস করে কাজে অগ্রসর হওয়া যুবকদের জন্য আল্লাহ্ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।”

(আল-ফযল, ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৬, পৃ. ০৭)

তিনি (রা.) আরও বলেন: “এক যুবক গত বছর আমার তাহরীক সম্বন্ধে অবগত হয়। উক্ত যুবক সারগোদার অধিবাসী। সে কোন পাসপোর্ট ছাড়াই আফগানিস্তানে গিয়ে উপনীত হয় এবং সেখানে গিয়ে তবলীগ করা শুরু করে। সরকার তাকে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। সে তখন জেলের কয়েদি

এবং অফিসারদের সাথে তবলীগ করা শুরু করে।... সেখানে আহমদীদের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং কিছু লোককে সে প্রভাবিত করে। অবশেষে অফিসারেরা অভিযোগ করে বলে, এই ব্যক্তি কারাগারে প্রভাব বিস্তার করেছে। মোল্লারা তার বিরুদ্ধে হত্যার ফতোয়া জারি করে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলে, এই ব্যক্তি ইংরেজ সরকারের প্রজা, তাকে আমরা হত্যা করতে পারব না। ফলে সরকার নিজ হেফাজতে তাকে নিরাপদে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দেয়। অতএব কয়েক মাস পর সে দেশে ফিরে আসলো। তার সাহস দেখুন! আমি তাকে বললাম যে, তুমি ভুল করেছ। আরও তো অনেক দেশ ছিল, সেখানে তুমি যেতে পারতে এবং নিরাপদে তবলীগ করতে পারতে, গ্রেফতার হতে না। তৎক্ষণাৎ সে বলে ওঠে, আপনি এখন কোন দেশের নাম বলে দিন, আমি সেখানে চলে যাবো। সেই যুবকের মা এখনও জীবিত আছেন কিন্তু সে মায়ের সাথে সাক্ষাৎ না করেই অন্য কোন দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে প্রস্তুত ছিল। তবে আমার অনুরোধে সে এখন তার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে। অন্যান্য যুবকেরাও যদি আফগানিস্তান থেকে ফেরত আসা যুবকের মত সাহস সঞ্চয় করে তাহলে স্বল্প সময়ে জগতের চিত্র পালটে দিতে পারে। কেবল অর্থ দিয়ে কোন মিশন বানানো যায় না। এ মুহূর্তে দু-একটি মিশন যা আছে সেখানে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা দিয়ে আরও কয়েকটি মিশন খোলা যেতে পারে। কিন্তু যদি এমন কয়েকজন যুবক সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে দু-এক বছরে এত তবলীগ হতে পারে যার ফলে জগতে সাড়া পড়ে যাবে। জগৎ বুঝে যাবে যে, আহমদীয়াত এমন এক ঢল— যাকে বাধাগ্রস্ত করা অসম্ভব।”

(আল-ফযল, ০৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ০৮-০৯)

নিজ হাতে কাজ করার আহ্বান

নিজ হাতে কাজ করার আহ্বানে জামা'তের সদস্যরা বিশেষ মনোযোগ দেয়। এ ক্ষেত্রে মাদ্রাসা আহমদীয়ার শিক্ষক এবং ছাত্র প্রথম সারিতে অবস্থান করে এবং ১৯৩৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর কাদিয়ানের অভ্যন্তরীণ অংশ থেকে এক হাজার বাঁশ জলসা গাছে পৌঁছে দেয়।

(আল-ফযল, ০৬ ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ০১)

১৯৩৬ সালে এই আহ্বানের অধীনে ইজতেমায়ী ওয়াকারে আমল জারি করা হয়।

কাদিয়ানে গৃহ নির্মাণের আহ্বান

এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) জামা'তের প্রতি সম্ভ্রষ্ট প্রকাশ করে ১৯৩৬ সালের শুরুর দিকে বলেন: “আহমদীয়া জামা'ত এ বিষয়ে যথেষ্ট আমল করেছে ফলে বছরে প্রায় ২০০ টি গৃহ নির্মিত হচ্ছে আর অনেক বন্ধু কাদিয়ানে জমিও ক্রয় করছেন।”

(আল-ফযল ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ পৃ.০৬)

দোয়ার আহ্বান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যদিও সর্বদা সত্যের বিজয়ের জন্য দোয়ায় রত থাকে তবুও তাহরীকে জাদীদের আহ্বানের মাঝে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) যে বিশেষ তাহরীক করেন, এর ফলে জামা'তের মাঝে বিশেষ উৎসাহ- উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় আর জামা'তের সদস্যরা আল্লাহ তা'লার সমীপে মাথা অবনত করার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া শুরু করে এবং নামাযের মাঝে দোয়া করার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়, আর জামা'তের মাঝে নতুন এক আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পরিবারের সদস্যদের কুরবানী

যেভাবে অন্যান্য আহমদী জামা'তের মাঝে কাদিয়ানের কেন্দ্রীয় জামা'ত তাহরীকে জাদীদের চাঁদা এবং অন্যান্য আহ্বানে সাড়া দেবার ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করে, এমনভাবে কাদিয়ানের জামা'তের মাঝে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পরিবার তাহরীকে জাদীদে কুরবানীর ক্ষেত্রে ছিল অনন্য যেমন, হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.), হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.), হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.), হযরত সৈয়দা মোবারাকা বেগম সাহেবা (রা.) এবং সাহেবযাদী হযরত সৈয়দা উম্মাতুল হাফিজ বেগম সাহেবা (রা.) আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অন্যান্য সদস্যরা কুরবানীর ঈর্ষণীয় ইতিহাস রচনা করে।

(চাঁদার বিস্তারিত জানতে তাহরীকে জাদীদের পাঁচ হাজার মুজাহিদীন পুস্তক দেখুন)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সত্তা মূর্তিমান তাহরীকে জাদীদ হয়ে গিয়েছিল

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পরিবারে মাঝে তাহরীকে জাদীদের দাবীসমূহের ওপর যিনি সবচেয়ে বেশি আমল করে দেখিয়েছেন তিনি হলেন হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) যাঁর সারাটা জীবন তাহরীকে জাদীদকে সফল করার জন্য ব্যয় হয়েছে, যেন তিনি মূর্তিমান তাহরীকে জাদীদ হয়ে গিয়েছিলেন।

হযূর (রা.)-এর কর্মব্যস্ততা

তাহরীকে জাদীদের প্রথম দিনগুলোতে হযরত আমিরুল মু’মিনিন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর কর্মব্যস্ততা এত বেশি ছিল যে, কখনও রাত একটার পূর্বে তিনি ঘুমাতে যান নি আর কখনও কখনও রাত তিনটা-চারটা পর্যন্ত কাজের মাঝে ডুবে থেকেছেন। এ বিষয়ে তিনি (রা.) বলেন:

১। “১৯৩৪ সালের ১৭-১৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত কেবল চার-পাঁচ রাত ছাড়া আমি কোনদিন একটার পূর্বে ঘুমাতে পারি নি। কোন কোন সময় রাত দুইটা, তিনটা, চারটার সময় আমি ঘুমাতে যাই আর অনেক সময় কাজ করতে করতে আমার মাথা অকেজো হয়ে যায়, তবে আমি কাজ শেষ করেই ছাড়ি আর তা হল লেখা লেখির কাজ, যার জন্য গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। অন্যান্য কাজ তো সহজ। এ সত্তাহে আমি আনুমানিক দুই হাজার অভিনন্দন-পত্র এবং অন্যান্য চিঠিপত্র পড়েছি, অনেক উত্তর দিয়েছি আর প্রতিদিন তিন ঘণ্টা মোলাকাত এবং পরামর্শ প্রদানে ব্যয় করি। এছাড়া কয়েকটি খুতবা পরিমার্জনও করা হয়েছে আর একটি বইয়ের দুই হাজার পৃষ্ঠা পরিমার্জন করা হয়েছে, বরং বলা চলে অনেক পৃষ্ঠা আমি নিজ হাতে লিখেছি।”

(আল-ফযল, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫, পৃ. ০৮)

২। “একজন সৈনিকের ন্যায় নিজ কাজে নাক বরাবর চলা আমার জন্য আবশ্যিক। প্রয়োজনে প্রাণ উৎসর্গ করতে আমি প্রস্তুত। আমার বয়স কত হল তা আমার দেখার বিষয় না। আমি আমার উদ্দেশ্যকে সামনে রাখি এবং তা

পূর্ণ করার চেষ্টা করি আর আমি আল্লাহর কৃপার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বলতে পারি, এই উদ্দেশ্য অবশ্যই অর্জিত হবে এবং এই কাজ অবশ্যই সফল হবে। দিবা-নিশি আমার মাথায় এ কাজগুলো ঘুরতে থাকে আর কখনও কখনও আমার হৃদয়ে এতটা উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তা’লার কৃপা না হলে আমি পাগল হয়ে যাবো। একটিই বিষয় যা আমাকে উৎসাহ দেয় তা হল, আমার এই স্কিমের সবটাই খোদার জন্য তাই আমার খোদা আমাকে বিনষ্ট করবেন না অন্যথায় কাজ এবং কাজের চিন্তা এতটাই ভারি হয় যে, বাহ্যত মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে যাবে, আমি পাগল হয়ে যাবো কিন্তু আল্লাহ তা’লা আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার সৌভাগ্য দেন ফলে আঁধারের মাঝ থেকে আলোকরশ্মি দেখতে পাই আর চতুর্দিকের হতাশা এবং নিরাশার বিষয়গুলোকে আল্লাহ তা’লা আশা এবং খুশিতে পরিবর্তন করে দেন, বরং শুরু থেকে আমার সাথে আল্লাহর আচরণ এমনই।”

(আল-ফযল, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫, পৃ. ০৬)

৩। “এ যুগ আমাদের জন্য খুবই স্পর্শকাতর যুগ, বহু রাত শুয়ে শুয়ে আমার মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি উঠে পায়চারি করতে থাকি। কোন বিপদ ঘটতে যাচ্ছে বিষয়টি এমন নয় বরং এমন অনেক বিষয় আছে যা আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হযরত উমর (রা.)-এর কথা আমার মনে পড়ে। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, খালেদকে কেন পদচ্যুত করেছেন? তিনি (রা.) বলেন, তুমি আমাকে কারণ জিজ্ঞেস করছ? আমার জামার ঝুল ও যদি তা জানতে পারে যে, কেন আমি তাকে পদচ্যুত করেছি তাহলে আমি জামার ঝুল টেনে ছিঁড়ে ফেলব। অতএব জামা’তের বিরুদ্ধে এমন অপতৎপরতা সৃষ্টি হচ্ছে যা আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না আর আমি যা বলছি তাও- বিরাট বিষয় আর এতে ঘুম হারাম হয়ে যায়, ফলে আমি আমার সাথে যারা কাজ করে, তাদের ঘুম হারাম করে দেই। শরিয়ত বলে, নিজের শরীরের প্রতিও যত্ন নাও কিন্তু ব্যস্ততা এত বেশি যে, নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেবারও সুযোগ নেই।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৫, পৃ. ৯০-৯১)

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, “আমি কিছু মানুষকে দেখেছি, যারা কষ্ট দেখে ভয় পেয়ে যায় অথবা অন্য কোথাও বেশি বেতন পেলে সেখানে চলে যায়। অনেকে কাজ থেকে পালায়। অনেকে কাজে অভ্যস্ত থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে ওয়াকফের অর্থ হল, সে মনে করবে— এ কাজেই আমার মৃত্যু হবে। ফলে সে দিনেও নিশ্চিত থাকতে পারে না আর রাতেও ঘুমাতে পারে না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল, প্রকৃত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যারা কাজ করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। আমার নিজেরও কয়েকবার এমন হয়েছে অর্থাৎ খাটে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তাভাবনা করতে থেকেনি, ফলে আমার ঘুম আসে নি আর মন পড়ে থাকে জামা’তের কাজের চিন্তায়। অতএব যারা কাজের লোক, তাদের ঠিকমতো ঘুম হয় না। পবিত্র কুরআন বলে, ‘মু’মিন ঘুমিয়েও আল্লাহ তা’লার যিকর করে’-এর অর্থ এটিই অর্থাৎ সে খোদা তা’লার ধর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তবেই ঘুমায়। তাই ঘুমের মাঝেও তাদের মস্তিষ্ক ধর্মের কাজে লেগে থাকে।”

(আল-ফযল, ০৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ১০)

এ সম্পর্কে তিনি (রা.) আরও বলেন, “স্মরণ রেখ! এখন আমরা যুদ্ধের ময়দানে আছি। আর যুদ্ধের ময়দানে হেঁটে চলা অসহ্য বরং দৌড়ানো উচিত। এ মুহূর্তে জামা’তে আহমদীয়ার ছেলে-মেয়েদের মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দেওয়া আবশ্যিক যে, আমরা ইসলামের জন্য গরু-ছাগলের ন্যায় কুরবান (তথা উৎসর্গিত) হতে চলেছি। অতএব আমাদের ঘাড়ের ছুরি চালানো হতে পরে— এ জন্য আমরা যেন প্রস্তুত থাকি। তাদেরকে অহর্নিশি একথা বলা আবশ্যিক যে, পশ্চিমাদের কুরবানগাহে নিজেদের কুরবানী করবে না বরং পশ্চিমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর দোর গোড়ায় এনে কুরবানী করবে (তথা ধর্মসেবায় উৎসর্গ করবে)।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৬, পৃ. ২৩-২৪)

হযরত আমীরুল মু’মিনীন (রা.) এবং হযূরের আহলে বায়ত-এর অতুলনীয় মালী জেহাদ

“তাহরীকে জাদীদের রেকর্ড অনুযায়ী হযূর (রা.) তাঁর নিজের পকেট থেকে উনিশ বছরে ০১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৮৬ রুপি তাহরীকে জাদীদে চাঁদা দেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর একটি মূল্যবান জমি তাহরীকে জাদীদে দিয়ে দেন যা তাহরীকে জাদীদ ০১ লক্ষ ৫২ হাজার ৭০০ রুপিতে বিক্রি করে। এভাবে হযূর মোট ০২ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৮৬ রুপি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দেন।

হুযূর (রা.)-এর আহলে বায়তও তাহরীকে জাদীদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয় যা ছিল হুযূরের কল্যাণময় তরবিয়ত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির ফল।”

(তাহরীকে জাদীদের পাঁচ হাজার মুজাহিদ্দীন; পৃ. ৫৬)

অন্যান্য দাবির ক্ষেত্রে দীপ্ত আলোকবর্তিকা

হযরত আমীরুল মু’মিনীন (রা.) ব্যক্তিগতভাবে কতটা জোরালোভাবে তাহরীকে জাদীদের ওপর আমলকারী ছিলেন, হযরত সৈয়দা মেহের আপা সাহেবা (রা.)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্বারা তা উপলব্ধি করা সম্ভব। তিনি বলেন:

“ডালহৌজির ঘটনা। একদা তিনি (রা.) খাবার খাওয়ার জন্য ডাইনিংয়ে বসেন। দেখলাম কিছুক্ষণ বসে থেকে খাবার না খেয়েই উঠে নিজ কামরায় চলে গেলেন। তিনি কেন মনক্ষুণ্ণ হলেন তা বুঝতে পারলাম না। সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল যে, এখন সারাদিন তিনি অভুক্ত থাকবেন আর এতটা কাজের চাপ পাছে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে আমার জিজ্ঞেস করায় বড় আপাজান (আম্মিজান) বলেন, হযরত সাহেব নিজ কামরায় গিয়ে চিরকুট পাঠিয়েছেন যেখানে লেখা আছে, ‘আমি তাহরীকে জাদীদের অধীনে আছি তাই খাবার টেবিলে কেবল এক তরকারি থাকা আবশ্যিক, অথচ আজ আমি সেখানে তিন পদের খাবার দেখেছি। তোমরা কেন এমনটি করলে? তাই আমি আজ খাবার খাবো না’।”

(আল-ফযল, ২৬ মার্চ ১৯৬৬)

নোট: হযরত সৈয়দা মেহের আপা সাহেবা আরও বলেন, “আমরা উক্ত তাহরীকের পর খাবারের টেবিলে এক তরকারিই রাখতাম। কিন্তু অনেক সময় সেই খাবার যদি পছন্দ না হতো অর্থাৎ রান্নার সময় খাবারে লবন-মরিচ যদি কমবেশি হতো সেক্ষেত্রে আমরা সাবধানতাবশত একটির পরিবর্তে দুটি খাবার হুযূর (রা.)-এর জন্য প্রস্তুত করে রাখতাম কেননা একটি খাবার যদি অপছন্দ করেন তাহলে অন্যটি যেন দেওয়া যায়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল- হুযূর সামান্য হলেও যেন খাবার খেতে পারেন।”

পোশাক-আশাকের বিষয়ে হুযূর (রা.) এতটাই কৃষ্ণতা অবলম্বন করেছেন যে, চার বছর ধরে তিনি জামার জন্য কোন কাপড় ক্রয় করেন নি আর তাহরীকে জাদীদের পূর্বে বানানো জামা-ই সাবধানে ব্যবহার করে কাজ চালিয়েছেন। উপটৌকন হিসেবে কোন কাপড় আসলে তা দিয়ে কয়েকটি জামা বানিয়ে দিনাতিপাত করেছেন।

(আল-ফযল, ০২ ডিসেম্বর ১৯৩৮, পৃ. ০৬)

কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং উপটোকনের বিষয়ে দিকনির্দেশনা

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) স্বয়ং বলেন: “অনেকে আমাদের ঘরে উপটোকন পাঠিয়ে থাকেন আর আমি উপটোকন ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে রেখেছি কিন্তু তা যখন আমার কাছে আনা হয় তখন আমি জিজ্ঞেস করি, একের অধিক কেন? বলা হয়, কেউ উপটোকন পাঠিয়েছে। তখন আমি বলি, আমাদের সম্পর্ক তো সমস্ত জামা’তের সাথে তাই আমাদের কাছে এমন জিনিস প্রতিদিনই আসতে থাকবে। অতএব এমন জিনিস যখন আসবে তখন কোন দরিদ্র ভাইয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। এর ফলে দরিদ্রদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হবে এবং পারস্পরিক আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে।”

(আল-ফযল, ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) সকল সন্তানকে স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ করে দেন এবং নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে তাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করেন, এরপর তাদেরকে জামা’তের সেবায় উপস্থাপন করেন। একদা হুযূর (রা.) বলেন:

“আমি আমার সকল সন্তানকে খোদা তা’লার ধর্মের খাতিরে ওয়াক্ফ করে রেখেছি। মিয়া নাসের আহমদ সাহেব ওয়াক্ফ এবং ধর্মের কাজ করছেন। ছোটজনও ওয়াক্ফ আর আমি ভাবছি যে, তাকেও যেন কোনভাবে ধর্মের কাজে লাগানো যায়। তার ছোটজন ডাক্তার। সে পরীক্ষায় পাস করে গেছে এবং এখন ট্রেনিং করছে যেন জামা’তের সেবা করতে পারে। অন্যসব সন্তান ছোট ছোট যারা পড়ালেখা করছে এবং ধর্ম সেবার উদ্দেশ্যে পড়ালেখা করছে। আমার তেরোজন পুত্রসন্তান এবং তেরোজনকেই ধর্মসেবার উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা হয়েছে।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৪৪, পৃ. ৭৫)

নিজ হাতে কাজ করার উদাহরণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হুযূর (রা.) ‘ওয়াকারে আমল’ ব্যবস্থাপনা চালু করেন এবং নিজ হাতে মাটির বুড়ি তুলে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। হুযূর (রা.) নিজে বলেন: “প্রথম যে-দিন আমি কোদাল ধরি এবং মাটির বুড়ি তুলি, তখন কয়েকজন নিষ্ঠাবান আহমদী

ভয়ে কাঁপছিল এবং দৌড়ে এসে বলল, হুযূর! অনুগ্রহকরে আপনি কষ্ট করবেন না, আমরা কাজ করছি। তারা আমার হাত থেকে বুড়ি-কোদাল নিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন কয়েক দিন আমি তাদের সাথে মিলে কাজ করেছি, তখন তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তারা বুঝে গেল— এ এক সম্মিলিত কাজ যা আমিও করছি এবং তারাও করছে।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৭, পৃ. ১৭৪)

মোটকথা আহমদীয়া জামা‘তের পবিত্র ইমাম তাহরীকে জাদীদের নির্দেশনার প্রত্যেকটি স্বয়ং পালন করে দেখিয়েছেন যা আহমদীয়া জামা‘তের সদস্যদের জন্য সদা এক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

প্রথম ওয়াকফে জিন্দেগী কর্মকর্তা

তাহরীকে জাদীদের সর্বপ্রথম ওয়াকফে জিন্দেগী কর্মকর্তা ছিলেন মির্যা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব।

নোট: তিনি ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে নভেম্বর মাসে তার পিতা মির্যা মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব (মোহাসেব, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া)-এর মাধ্যমে ওয়াকফে জিন্দেগীর আবেদন করেন, যা হুযূর (রা.) মঞ্জুর করেন। ১৯৩৪ সালের ১১ নভেম্বর থেকে তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিসে কাজ করা শুরু করেন এবং ১৯৩৪ সালের ২০ নভেম্বর থেকে স্থায়ীভাবে তাহরীকে জাদীদের কর্মকর্তা নিযুক্ত হন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তার স্বন্ধে ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে তাহরীকে জাদীদের বিভিন্ন আদেশের ওপর আমলকারী এবং জীবন উৎসর্গকারীগণের তালিকা প্রস্তুত করার কাজ অর্পণ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তার সম্পর্কে লেখেন, ‘তিনি সবচেয়ে পুরাতন কর্মী’।

নোট: হুযূর (রা.) ১৯৫২ সালের ২২ জুলাই হাফেজ আব্দুস সালাম সাহেব (বর্তমানে উকিলুল মাল সানী)-এর সমীপে লিখিত একটি পত্রে উক্ত বাক্যটি লেখেন। মূল পত্রটি ওকালাতে দিওয়ানের রেকর্ডে সংরক্ষিত আছে।

১৯৩৪ সালের ২৭ জানুয়ারি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) প্রাইভেট সেক্রেটারি শেখ ইউসুফ আলী সাহেবকে মঞ্জুরীকৃত ওয়াকফে জিন্দেগীদের সম্পর্কে বলেন, “ওয়াকফকারীদেরকে বলবেন, ওয়াকফের সঠিক অর্থ বুঝে তাদের অফিসে কাজ করা উচিত কেননা আজকাল কাজ অনেক বৃদ্ধি

পেয়েছে। মির্যা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব তো আগে থেকেই বুঝে কাজ করছেন তাই অন্যদেরও করা উচিত।”

তাহরীকে জাদীদের ঘোষণার ফলে জামা’তের মাঝে এক নব-জাগরণের সৃষ্টি হয় এবং সর্বসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি হবার ফলে বিদেশ থেকেও বহু চিঠিপত্র আসা শুরু করে। তাই ওয়াকফে জিন্দেগীরা সাহায্য করা সত্ত্বেও প্রাইভেট সেক্রেটারির সহকারীদেরকেও দীর্ঘরাত পর্যন্ত নিয়মিত কাজ করতে হতো।

শেখ ইউসুফ আলী সাহেব তার রিপোর্টে লেখেন, “তাহরীকে জাদীদের সমস্ত কাজ অফিসে করা হয় যার কারণে কাজ পূর্বের থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কিছু ওয়াকফে জিন্দেগী কাজ করা সত্ত্বেও অফিসের কর্মীদের দাপ্তরিক সময় ছাড়াও রাতে বসে কাজ করতে হয়। যথাসময়ে চিঠিপত্রের কাজ সম্পন্ন করার পূর্ণ চেষ্টা করা হয়।”

(অফিসসমূহের বার্ষিক রিপোর্ট: সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ০১ মে ১৯৩৪)

ফাইন্যান্স সেক্রেটারি নিয়োগ

১৯৩৪ সালের ২৪ নভেম্বর হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেবকে ফাইন্যান্স সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন এবং তার স্বন্ধে তাহরীকে জাদীদ স্কিমে আর্থিক কুরবানীর বিষয়টি দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেব প্রায় পঁচিশ বছর এই দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৫৮ সালের এপ্রিলের ০১ তারিখ তিনি অবসরগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এই পদের নামকরণ করা হয় ‘উকিলুল মাল’। চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেব (রা.) দায়িত্বপ্রাপ্ত হবার পর এতটাই শ্রম, নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধের সাথে কাজ করেছেন যার ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) স্বয়ং তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন—

“চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেবকে মাসের পর মাস রাত বারোটা পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদের কাজ করতে হয়েছে। অতএব তাহরীকে জাদীদ অফিসে বারো ঘণ্টা কাজ করতে হবে, এর চেয়ে অধিক করলে সমস্যা নেই তবে ন্যূনতম বারো ঘণ্টা করতেই হবে।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৫, পৃ. ৯০-৯১)

তিনি (রা.) আরও বলেন, “চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেব ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে একজন যারা পরিশ্রম, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন এবং যাদের ওপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হলে তা দ্বিতীয়বার তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন পড়ে না।”

তিনি (রা.) বলেন, “আমি চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেবের অর্থ জমা করার কাজে বেশ সন্তুষ্ট। তিনি তাহরীকে জাদীদে আশ্চর্যজনক উপায়ে অর্থ জমা করার কাজ করেছেন।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৪৫, পৃ. ৯৫-৯৬)

মোটকথা তাহরীকে জাদীদের ইতিহাসে উল্লিখিত চৌধুরী সাহেবের সেবা চীরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ফাইন্যান্স অফিসের প্রাথমিক বিভিন্ন তথ্য

চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেব বর্ণনা করেন: “১৯৩৪ সালের ২৩ নভেম্বর হুযূর (রা.) একটি খুতবায় তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন এবং তার পরের দিন সকালে হুযূর লাহোর যাচ্ছিলেন। আহমদীয়া চকে বহু আহমদী সদস্য হুযূরের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন। মোহাসেব অফিসের পাশে মসজিদে মোবারকের ছোট সিঁড়ি দিয়ে হুযূর নেমে আসেন। খাকসার মোহাসেব অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। খাকসার আসসালামু আলাইকুম বলে করমর্দন করি। তখন হুযূর (রা.) মুচকি হেসে বলেন, আপনি তাহরীকে জাদীদের কাজ শুরু করে দিন এবং এক হাজার মানুষ খুঁজে বের করুন। খাকসার মনে মনে ‘আমান্না ওয়া সাদ্দাকনা’ বলি। হুযূর লাহোর থেকে বৃহঃস্পতিবার ফিরে আসেন। তখন আমি এক হাজার মানুষের তালিকা হুযূরের সামনে উপস্থাপন করি...।”

“তাহরীকে জাদীদের ওয়াদার চিঠি আসছিল। হুযূর (রা.) প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিসকে আদেশ দেন যে, তারা যেন এগুলো হিসাব করে উপস্থাপন করে। কিন্তু অফিস যে হিসাব দিত তা হুযূরের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো না। একদিন বৃহঃস্পতিবার মাগরিবের পর আমাকে বলেন, আপনি ওয়াদার সমস্ত চিঠি অফিস থেকে নিয়ে হিসাব করে আগামীকাল দশটার সময় অর্থাৎ জুমু‘আর পূর্বে আমাকে দেবেন, আমি এটি এলান করতে

চাই। আমি ঐ সময় অফিসে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর চিঠিগুলো পড়ে আছে। অফিসের লোকজন বলেন, এখানে সমস্ত চিঠি আছে, আপনি নিয়ে যান। আমি গণনা করে পাঁচশত পত্র পেলাম। আমি তখনই প্রথমে দারুসসা‘তা মহল্লায় যাই। সেখানে আমি খাজা মঈন উদ্দিন সাহেব ও কারী মুহাম্মদ আমিন সাহেব— উভয়কে দেড়শ করে মোট তিন শত পত্র দিয়ে বলি, আজ সারা রাত কাজ করবেন যেন সকালেই সমস্ত হিসাব পাওয়া যায়। তারা সানন্দে বলেন, যতক্ষণ কাজ শেষ না করতে পারব, ততক্ষণ আমরা বিশ্রাম নেব না। বাকি দুইশ পত্রের কাজ আমি নিজের কাছে রাখি। আমি সকালে তাদের কাছে গিয়ে দেখি তারা হিসাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা সেগুলো আমাকে দিয়ে দিলেন...। আমি তা একত্রিত করে হিসাব করে দেখি ওয়াদার পরিমাণ সাড়ে ষোল হাজার রুপি। আমি সাড়ে নয়টার সময় আমার ঘর থেকে বের হয়ে দারুল ফয়ল এলাকা দিয়ে শহরের দিকে আসছিলাম। হুযূরের দেহরক্ষী মীর খান সাহেবের সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে বলেন, ‘হুযূর আপনাকে স্মরণ করেছেন।’ আমি উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, হুযূর! সাড়ে ষোলো হাজার রুপি ওয়াদা এসেছে। হুযূর বলেন, এখন সঠিক মনে হচ্ছে, আমার ধারণার সাথে এখন মিলে গেছে। আমি নিবেদন করি, হুযূর! আপনি তো সাড়ে সতেরো হাজার রুপি আহ্বান করেছিলেন। গতকাল এবং আজকের ডাক আপনার কাছে আছে এবং সেখানে এক হাজার রুপির অধিক ওয়াদা থেকে থাকবে, তাই জুমুআয় বলতে পারেন— ‘সাড়ে সতের হাজার রুপির ওয়াদা এসেছে।’ হুযূর (রা.) বলেন, আমি যা এখনও দেখি নি, তার ঘোষণা কীভাবে দিতে পারি! আমি যতটা দেখেছি, ততটাই বলতে পারি। আমি যা দেখি নি, তা বলা সম্ভব না। অতএব হুযূর খুতবাতে সাড়ে ষোল হাজার রুপি ওয়াদা এসেছে বলে ঘোষণা দেন।”

চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেব আরও বর্ণনা করেন: “আল্লাহ্ তা‘লা নিজ অনুগ্রহে আমাকে এক বিশেষ যোগ্যতা দিয়েছেন আর তা হল, এক সাথে চারটি কাজ করা। কাশ্মীর ফান্ড এবং দারুল আনোয়ারের কাজের জন্য আমি দুজন সাহায্যকারীও পেয়েছিলাম কিন্তু অডিট এবং তাহরীকে জাদীদের কাজ আমি একাই করছিলাম। আমি হুযূরের সমীপে প্রত্যহ রিপোর্ট উপস্থাপন করার জন্য হিসাব প্রস্তুত করা এবং চিঠিপত্রের মঞ্জুরির প্রাত্যহিক অবগত করা আর তাহরীকে জাদীদের রিপোর্ট পেশ করার পর অন্যান্য কাজ করার কারণে

আমার জন্য দাপ্তরিক অনুবর্তিতার বিষয়টি শিথিল হয় অর্থাৎ ১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত, এরপর ১৯০৯ সাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমার হৃদয়ে কখনও এই চিন্তা আসে নি যে, অফিসের সময় শেষ, এখন ঘরে যাই বরং এ বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, অর্থ অফিসের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অফিস যেন বন্ধ না হয়, প্রয়োজনে কাজ ঘরে নিয়ে গিয়ে দৈনন্দিন কাজ শেষ করব। অতএব আমি অফিসের সময়ের দিকে না দেখে দিনের কাজ দিনে শেষ করা নিজ অভ্যাসে পরিণত করেছিলাম...”

“ঘটনাচক্রে তাহরীকে জাদীদের অফিস ছিল হুযূরের কাসরে খেলাফতে। খাকসার কখনও রাত দশটা আবার কখনও রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করতাম। কিন্তু হুযূর সাধারণত রাত একটা-দুইটা পর্যন্ত কাজ করতেন আর কখনও সারা রাতও কাজ করেছেন এবং ফজরের সময় হলে নামায পড়াতে গেছেন। অতএব আমার মনিব যেখানে সারা রাত কাজ করেন সেখানে অধিক সময় ব্যয় করে আমি আমার কাজ সম্পন্ন করব না- তা কি হয়!”

“হুযূর (আই.) ওয়াদার প্রত্যেকটি পত্রে ‘পত্র নম্বর’ এবং ‘জাযাকুমুল্লাহ আহসানাল জাযা’ নিজ কলম দিয়ে লিখতেন। কোন পত্রে অন্য কোন বিষয় থাকলে আমাকে উদ্দেশ্য করে পত্রের মাঝে দিকনির্দেশনা লিখে দিতেন যেন আমি সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারি। এছাড়া সাধারণ চিঠিপত্রগুলোর মাঝে প্রত্যেকটিতে হুযূর প্রাইভেট সেক্রেটারির উদ্দেশ্য দিকনির্দেশনা দিয়ে নোট লিখে দিতেন। তাহরীকে জাদীদের চিঠিপত্রের নোট আমি খুব যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম আর পঞ্চম বছরে আমি সংকল্ল করেছিলাম যে, কোন না কোন সময় হুযূরের উক্ত নোটগুলো আমি অবশ্যই পত্রিকায় প্রকাশ করব কিন্তু ‘মারযিয়ে মাওলা আয হামে উলা’ অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছাই সবকিছুর উর্ধ্বে। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, তাহরীকে জাদীদের রেজিস্টার ছাড়া এ সকল চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ পাকিস্তান আসার সময় আনা সম্ভব হয় নি।”

(আসহাবে আহমদ, সপ্তম খণ্ড; পৃ. ২৩২-২৩৬)

“আমার এখনও মনে আছে প্রথম বছরের ওয়াদার সর্বশেষ মেয়াদ ছিল ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পুরো দেড় মাস ছিল এবং ওয়াদার চিঠিপত্র ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আসে যেখানে ওয়াদার পরিমাণ ছিল এক লক্ষ দশ হাজার রুপি এবং তা তাহরীকে জাদীদের সাড়ে সাতাশ হাজার রুপির

আহ্বানের তুলনায় চার গুণ বেশি ছিল। এটি জামা’তের নিষ্ঠা ও হুযূর (রা.)-এর দোয়ারই ফল ছিল। আমি প্রতিদিন বিস্তারিত যে রিপোর্ট দিতাম, ২৩ জানুয়ারির পর আমি তা বন্ধ করে দেই এবং আগামীতে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিয়মানুযায়ী সাপ্তাহিক রিপোর্ট পেশ করব বলে মনে করি। তিনদিন ধারাবাহিক রিপোর্ট না পাওয়ায় হুযূর আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তিনদিন ধরে রিপোর্ট দেন নি কেন? আমি নিবেদন করি, এখন ওয়াদা এসে গেছে তাই ভাবলাম সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিয়মানুযায়ী আপনার সামনে রিপোর্ট উপস্থাপন করব। তিনি (রা.) বলেন, আমার সাথে যারা কাজ করে তারা দিনের রিপোর্ট দিনে দিয়ে তবেই অফিস বন্ধ করবে।”

(আসহাবে আহমদ, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৩৫)

“অতএব ঐ দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি নিয়মিত বিস্তারিত রিপোর্ট হুযূর (রা.)-এর সমীপে উপস্থাপন আসছি, আলহামদুলিল্লাহ।

১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে জামা’তের এক সদস্যকে আমি একটি পত্র লিখেছিলাম। পত্রে অসাবধানতাবশত আমি এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছি যার ফলে সেই বন্ধু আমার পত্রের মাঝে প্রশাসকসুলভ আচরণ অনুভব করে এবং হুযূরের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে দেয়। সে-সময় তাহরীকের সকল চিঠিপত্র হুযূরের সমীপে দেওয়া হতো। হুযূর আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কাউকে এমন শব্দ লিখে চিঠি দিয়েছেন? আমি বললাম, জি হুযূর, লিখেছিলাম। তখন হুযূর যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার সারাংশ হল: ‘এ তো প্রশাসকের ন্যায় আচরণ। আমার সাথে যে কাজ করবে তাকে ইসলামী শিষ্টাচার জানতে হবে কেননা ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় করা আমাদের দায়িত্ব।’ অতএব সেদিনের পর থেকে হুযূরের উপদেশ আমি শিরোধার্য করে নিলাম।”

(আসহাবে আহমদ, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৩৪-২৩৫)

“আমি তিন মাস ধরে একা-ই কাজ করছিলাম। একদিন হুযূর বলেন, ‘আমি লক্ষ্য করছি, আপনি একাই কাজ করেন। আপনি একজন কেরানি রাখুন, তাহরীকে জাদীদ খাত থেকে আমি তার বেতনের ব্যবস্থা করব।’ অতএব আমি পাটিয়ালা থেকে একজন পোস্টাল কেরানিকে নিয়োগ দিলাম। তিনি অনেক পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়ে কাজ করতেন। আমার সাথে দীর্ঘ

রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। একদা তিনি পাটিয়ালা গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই অসুস্থতায় পরলোক গমন করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। এরপর আমি চৌধুরী আব্দুর রহিম সাহেব চিমাকে মাসিক পনেরো রুপি বেতন দিয়ে রাখি। আল্লাহ্ তা’লা তাকে এমন স্মরণ শক্তি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাহরীকে জাদীদ অফিসের অধিকাংশ বিষয় মুখস্থ করে ফেলতেন। অনেক সময় সদস্যরা অফিসে এসে চৌধুরী সাহেবের কাছে তাদের হিসাব ও ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি মুখস্থ বলে দিতেন। তবে কেউ যদি রেকর্ড দেখে বলার জন্য পিড়াপিড়ি করত, তবে তিনি তাদের মন রক্ষা করতে রেজিস্টার দেখে বলতেন।... তিনি স্বানন্দে ও খুব দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতেন। কাজ শেষ না করা পর্যন্ত অফিস বন্ধ করতেন না আর কাজ বেশি থাকলে ঘরে নিয়ে গিয়ে সম্পন্ন করতেন।”

(আসহাবে আহমদ, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৩৬)

আমানতে জায়েদাদ বিভাগ

এখানে এটি বলা প্রয়োজন যে, তাহরীকে জাদীদের আদেশ অনুযায়ী যে-সকল অর্থ দেশের বাইরে থেকে আসত তার হিসাব রাখা এবং কীভাবে খরচ করা হবে, এ দায়িত্ব ছিল ‘আমানতে জায়েদাদ বিভাগ’-এর অধীনে। এই বিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এবং অফিসের ইনচার্জ ছিলেন হযরত মৌলভী ফখরুদ্দীন সাহেব।

তাহরীকে জাদীদের প্রথম (ব্যয়ের) বাজেট

তাহরীকে জাদীদের প্রথম বাজেট ছিল ৬/২/৬১৭৮২ রুপি। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের ১৯৩৫ সালের ০৮ মে ১৭৮ নম্বর রেজুলেশনে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। রেজুলেশনে লেখা আছে যে, “হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) নাযেরে আলা-কে তাহরীকে জাদীদের নগদ ৬/২/৬১৭৮২ রুপি বাজেট প্রেরণ করেন। হযুরের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

“তাহরীকে জাদীদের বাজেট প্রেরণ করা হল। এই বাজেট সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বাজেটের সাথে शामिल করে নিন...। এই বাজেটের মেয়াদ ০১ মে ১৯৩৫ সাল থেকে ৩০ এপ্রিল ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। এর বিল

পাস হবার ক্ষেত্রে নীতিগত সিদ্ধান্ত হল, বিলের ওপর তাহরীকে জাদীদ ইনচার্জের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(রেকর্ড সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রেজুলেশন ১৭৮, ০৮ মে ১৯৩৫)

স্থায়ীভাবে অফিস প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রথম ইনচার্জ

১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে তাহরীকে জাদীদের স্থায়ী অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আনোয়ার বাটালভীকে তাহরীকে জাদীদের ইনচার্জ নিযুক্ত করেন এবং কাদিয়ানের কাসরে খেলাফতের কাঠের সিঁড়ির সংলগ্ন একটি কামরায় অফিস প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে কয়েক বছর পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিস ছিল। পরবর্তীতে যখন কাজের চাপ বেড়ে যায় তখন হযরত সৈয়দ নাছের শাহ সাহেব (রা.)-এর বাড়ির এক পাশে বৈদেশিক মিশন ও তেজারাভী বিভাগের অফিস বানানো হয়। এই জায়গাও যখন অপ্রতুল হয়ে পড়ে তখন হযরত শাহ সাহেব (রা.)-এর বাড়ি সংলগ্ন জমিতে তাহরীকে জাদীদের স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা হয়। যেখানে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সম্পাদন হতে থাকে।

(আল-হাকাম জুবিলি সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৩৯, পৃ. ৫৮)

জনাব মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আনোয়ার ১৯৩৫ সাল থেকে নিয়ে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদের ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মৌলভী সাহেব এগারো-বারো বছর ওকালাতে মাল ছাড়াই সমস্ত কাজ একা-ই করেন। নতুন ব্যবস্থাপনা, কাজের কোন আগামাথা নেই অথচ গুরুদায়িত্ব, তা সত্ত্বেও মৌলভী সাহেব নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অতি উত্তমরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। মজলিসে তাহরীকে জাদীদ ১৯৫১ সালের ১২ মার্চ এক বিশেষ রেজুলেশনে তার সেবার স্বীকৃতি দেয়। (রেজুলেশনে লেখা হয়, ‘মৌলভী সাহেবের দীর্ঘদিনের সেবাকে তাহরীকে জাদীদ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর জন্য মাসিক ৭৫ রুপি পেনশন নির্ধারণ করেছে যা তিনি আজীবন পেতে থাকবেন। এছাড়া তাহরীকে জাদীদ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য তার অনন্য সেবার স্বীকৃতি দিচ্ছে’)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর স্বর্ণালী দিকনির্দেশনা

মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আনোয়ার বর্ণনা করেন, “১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে যখন হুযূর আমাকে তাহরীকে জাদীদের ইনচার্জ নিযুক্ত করেন। হুযূরের সাথে কাজ করার সময় হুযূর কিছু স্বর্ণালী দিকনির্দেশনা প্রদান করেন যা আমার সারা জীবনের জন্য একটি আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। হুযূর (রা.) দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন:

১. আমি কোন বিষয়ে নির্দেশনা দিচ্ছি, এমন সময় আমার কথার মাঝে কোন কথা বলা যাবে না বরং কথা বলা শেষ হলে যদি কোন বিষয়ের ব্যখ্যা জানার প্রয়োজন হয়, তখন তা জিজ্ঞেস করা যাবে।

২. আমি যদি হাঁটতে থাকি তাহলে আমার সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যে আমাকে যেন থামানো না হয় বরং হাঁটতে হাঁটতে কথা বলবেন।

৩. সাক্ষাতের জন্য যে সময় নির্ধারণ করা আছে সেই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। যদি আরও সময়ের প্রয়োজন হয় তাহলে হয় তখন বিশেষভাবে অনুমতি নিতে হবে অথবা বাকি কাজ অনুমতি নিয়ে অন্য কোন সময় করতে হবে।

৪. যে কাজ আমি উপস্থাপন করার আদেশ দেব তা সুযোগ বুঝে দ্রুত উপস্থাপন করতে হবে। পুনরায় উপস্থাপনের জন্য যেন সপ্তাহ বা মাস বিলম্ব করা না হয়।

৫. আমি যদি কোন কাজ সম্পর্কে আদেশ করি যে, এই কাজ এই পদ্ধতিতে করতে হবে, তবে যেটুকু বুঝতে পারবেন সেই অনুযায়ী তার চিত্র আমার সামনে দ্রুত উপস্থাপন করবেন। কারণ আমি যেন বুঝতে পারি, কাজ কি সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে নাকি কোন ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। ভুল বোঝাবুঝি হলে তা দ্রুত সংশোধন করতে হবে।

৬. মোলাকাত দীর্ঘ হবার কারণে নামাযের সময় হয়ে গেলে আমাকে যেন তাৎক্ষণিক অবহিত করা হয় কেননা আমার বিলম্বের কারণে মুসল্লিরা মসজিদে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলে আমার ভীষণ মনখারাপ হয়।”

(‘আল-ফুরকান’, ‘হযরত ফযলে উমর’, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৬৫ ও
জানুয়ারি ১৯৬৬, পৃ. ৬১-৬২)

ব্যয়ের মূলনীতি

মৌলভী আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী তাহরীকে জাদীদের সূচনাতে কয়েক বছর পর্যন্ত যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা হল, কর্মকর্তারা কোন কাজ সম্পাদনের পর সেই কাজে যে অর্থ ব্যয় হতো তা উপস্থাপন করতেন যেন কুরবানীর স্পৃহা ও জামা’তের সেবার জন্য যথাসাধ্য স্বল্প ব্যয় করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়।

(মাসিক ‘খালেদ’, অক্টোবর ১৯৬২, পৃ. ৩৮)

“তাহরীকে জাদীদের সূচনাতে হুযূর (রা.) জনাব আনোয়ার সাহেবকে বলেন, রূপি কোথা থেকে আসবে এ নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। যত রূপি প্রয়োজন হবে, আল্লাহ তা’লার কৃপায় তার ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আপনি আমাকে বলুন, উক্ত অর্থ কী কী কাজে ব্যয় করা যায়? আপনার কাছে যে যে কাজ সংগত মনে হয়— তা আমার কাছে উপস্থাপন করবেন।”

(মাসিক ‘খালেদ’ রাবওয়াহ, জুলাই ১৭৬২, পৃ. ১৭ ১৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) একবার নিজেই বলেন— “তিন-চার বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি যে, বাজেট বাড়তে দেব না। কিন্তু এর জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল, আমরা বাজেটকে একটি নির্দিষ্ট গুণিতে নিয়ে আসব, এরপর নিয়মিত ব্যয় যেন সীমিত থাকে আর জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধৃত ব্যয়ের জন্য অধিক অর্থ যেন বরাদ্দ রাখা হয়। এ কারণে আমি তাহরীকে জাদীদের পৃথক ফান্ড রেখেছি যেখানে নিয়মিত ব্যয় কম রেখেছি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধৃত কাজের ব্যয়ের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ রেখেছি। এর ফলে যে লাভ হয়েছে তা হল, কয়েকটি দেশে নতুন মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৭, পৃ. ৬৮)

ওয়াকেফীনে তাহরীকে জাদীদের তিনটি ধরন

প্রথমদিকে তাহরীকে জাদীদ ব্যবস্থাপনার অধীনে তিন ধরনের ওয়াকেফীন ছিল।

১। তাহরীকে জাদীদ অফিসের কর্মী।

২। ওয়াকেফীনদের একটি অংশকে মুদাররেসীন (তথা শিক্ষক) বলা

হতো যাদের মধ্যে কয়েকজনকে কেন্দ্রে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং কয়েকজনকে ইসলামের তবলীগের উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্বে প্রেরণ করা হয়। প্রথমোক্তদের ‘হিন্দুস্তানের অভ্যন্তরীণ মোবাল্লেগ’ এবং শেষোক্তদের ‘হিন্দুস্তানের বাইরের মোবাল্লেগ’ বলে সম্বোধন করা হতো।

৩। সার্ভে (সমীক্ষা) স্কিমে দায়িত্বপালনকারী ওয়াকেফীন।

এরপর তাহরীকে জাদীদের ব্যবস্থাপনা যতই বিস্তৃত হতে থাকে, ওয়াকেফীনদেরকে ততই বিভিন্ন বিভাগে কাজে লাগানো হয়েছে।

সেক্রেটারি ফরেন মিশনারীজ

বাইরের দেশগুলোর নতুন নতুন মিশন হাউস থেকে রিপোর্ট আসা শুরু হয় এবং ইংরেজিতে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের আবশ্যিকতা দেখা দেয়, তখন হয়র (রা.) মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব মুনিরকে ‘সেক্রেটারি ফরেন মিশনারীজ’ হিসেবে মনোনীত করেন।

(মাসিক ‘তাহরীকে জাদীদ’, রাবওয়াহ, আগস্ট ১৯৬৮, পৃ. ০৭)

সেক্রেটারি সানা’ত ও তেজারাত

একইভাবে সানা’ত ও তেজারাতের রিপোর্ট আসায় হয়রত আকদাস-এর নির্দেশনা মোতাবেক হয়রত মৌলভী জুলফিকার আলী খান সাহেব গওহর সেক্রেটারি সানা’ত ও তেজারাত হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং বাইরের দেশ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র আসা শুরু হয়।

(মাসিক ‘তাহরীকে জাদীদ’, রাবওয়াহ, আগস্ট ১৯৬৮, পৃ. ০৭-০৮)

গুরুত্বপূর্ণ লিফলেট ও ইশতেহার প্রকাশ

সে-যুগে তাহরীকে জাদীদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর লিখিত লিফলেট বহুল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এই লিফলেট উর্দু ছাড়াও বাংলা, সিন্ধি, ইংরেজি, তামিল এবং মালাইয়ালাম ভাষায় প্রকাশ করা হয় এবং দেশের বাইরেও এটি বিতরণ করা হয়।

(আল-ফযল, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ০৫ এবং আল-ফযল, ২০ অক্টোবর ১৯৩৫)

লিফলেট প্রকাশের পূর্বে আল-ফযল পত্রিকায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়:

ভাইয়েরা আমার!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

একটি খুতবায় আমি ঘোষণা দিয়ে বলেছিলাম— বর্তমান অবস্থার নিরিখে কিছু বিজ্ঞাপন অচিরেই প্রকাশ করা হবে। বন্ধুরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন, পোস্টার যথাযথ স্থানে লাগাতে হবে এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে লিফলেট বিতরণ করতে হবে। অচিরেই যেহেতু এই কাজ শুরু হতে যাচ্ছে তাই এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আমি জামা’তের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, আপনারা দ্রুতই নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

* কী ধরনের পোস্টার এবং বিজ্ঞাপন প্রয়োজন— এ বিষয়ে সবাই তাহরীকে জাদীদ অফিসকে অবগত করবে।

* জামা’ত হোক বা ব্যক্তি পর্যায়ে— তারা কী পরিমাণ ইশতেহার মূল্য পরিশোধপূর্বক নিতে আগ্রহী? প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে কিছু অর্থ গ্রহণ করে বাকিটা বিনামূল্যে প্রেরণ করা হবে।

* বাঙ্গাল, সিন্ধ এবং সীমান্তবর্তী জামা’তগুলোর এখান থেকে ইশতেহার সংগ্রহ করে উক্ত ইশতেহার বাংলা, সিন্ধি এবং পোশতো ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করার চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়ে তাহরীকে জাদীদ অফিস তাদেরকে যথাসাধ্য অর্থ প্রদান করে সাহায্য করবে। তবে চিঠিপত্র মারফত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যিক।

* প্রত্যেক জামা’ত বা সদস্য এ বিজ্ঞাপনগুলো দেয়ালে সাঁটা বা বিলি করার দ্রুত ব্যবস্থা করবেন।

* প্রত্যেক ইশতেহার এমন ব্যক্তির হাতে দেওয়া উচিত, যে-ব্যক্তি এটি দ্বারা উপকৃত হবেন। এছাড়া উত্তম স্থান নির্বাচন করে সেখানে পোস্টার সাঁটা উচিত। প্রত্যেক জামা’ত বা জামা’তের সদস্য এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন। সকল পোস্টার একদিনে লাগাবেন না, কেননা কতিপয় অসাধুচক্র এগুলো ছিঁড়ে ফেলে। তাই দু-তিনদিন ধরে লাগাবেন, যেন সবাই পড়ার সুযোগ পায়।

* ইশতেহার ছাপানোর পর তা কতটা প্রভাব পড়েছে— এ বিষয়ে জামা’তের সদস্যরা খোঁজ-খবর নিতে থাকবেন এবং কেন্দ্রকে অবহিত করতে থাকবেন যেন ভবিষ্যতে ইশতেহার প্রকাশের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়।

* উক্ত বিষয়ে খবরাখবর আমার বরাবর অথবা সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ বরাবর প্রেরণ করবেন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা মাহমুদ আহমদ

খলীফাতুল মসীহ সানী

ইমাম, জামা’তে আহমদীয়া

ইশতেহারের বিষয়বস্তু বৃহস্পতিবার বাদ আসর থেকে আসা শুরু হয়। বিষয়বস্তু আসতেই তা তাহরীকে জাদীদ অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, পাশাপাশি এই দিকনির্দেশনা দেওয়া ছিল যে, সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও যেন তাতে চোখ বুলিয়ে দেবার পর লিপিকারকে দেওয়া হয়। এই কাজ শেষ হতে রাত ১২টা থেকে ০১টা বেজে যেত।

একটি কপি বিজ্ঞাপন আকারে হতো এবং অপরটি লিফলেট আকারে লেখা হতো। রাতের ভিতরে লিফলেট ছাপানোর কাজ শেষ হতো এবং সকালের প্রথম গাড়িতে কোন বিশ্বস্ত মানুষের মাধ্যমে জুমুআর নামাযের পূর্বেই বাটলা, অমৃতসর লাহোর এবং লায়েলপুর পৌঁছে দেওয়া হতো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী লিফলেট বিতরণ করা হতো। হযূর (রা.) স্বয়ং বলেন; তাহরীকে জাদীদের কাজ যেহেতু সরাসরি আমার সাথে সম্পৃক্ত তাই এ ক্ষেত্রে আমার কাজের ধরন হল, আমি নিজেই এর তদারকি করি এবং যেখানে দুর্বলতা দেখি সেখানেই অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করে তা দূর করার চেষ্টা করি। যেমন লিফলেট যদি পাঠাতে হয় তাহলে যে জামা’তে লিফলেটের কপি প্রয়োজন সেখানে অধিকহারে লিফলেট প্রেরণ করা হবে এবং যাদের অল্প প্রয়োজন তাদেরকে অল্পই পাঠানো হবে। সব জামা’তে একই পরিমাণ পাঠাতে হবে—

বিষয়টি এমন নয়। এছাড়া দেখা হয়— কোন্ কোন্ জামা’ত দুর্বল। অতএব যে-সব জামা’ত দুর্বল সে-সব জামা’তের দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করা হয়।

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৪১, পৃ. ১১৮)

বই-পুস্তক ছাপানো

তাহরীকে জাদীদের প্রথম তিন বছরে বিজ্ঞাপন ছাড়াও কিছু বই-পুস্তক ছাপানো হয় যেমন ১৯৩৬ সালের ‘মোনাযেরায়ে মুহিতপুর’ এবং ১৯৩৭ সালের হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর ৬টি খুতবা ‘আ’মালে সালাহা’ নামে ছাপানো হয়।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে আহমদীয়াতের প্রচার

তাহরীকে জাদীদের প্রারম্ভিক যুগে দুটি ইংরেজি, একটি উর্দু এবং একটি সিন্ধি পত্রিকার মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রচার করা হতো। ইংরেজি দুটি পত্রিকা হল ‘সানরাইজ’ এবং ‘মুসলিম টাইমস’ যে দুটির উল্লেখ করতে গিয়ে একদা হযূর (রা.) বলেন;

“দুটি ইংরেজি পত্রিকা যার মাঝে ‘সানরাইজ’ লাহোর থেকে এবং ‘মুসলিম টাইমস’ লন্ডন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এ দুটির মধ্যে বিশেষভাবে সানরাইজ-এর গুরুত্ব অত্যধিক বলে মনে হচ্ছে। যদিও এই পত্রিকাটি প্রায় বিনামূল্যে বিতরণ করতে হয় তবুও এটার চাহিদা বেশি।

আমেরিকা থেকে এক নও মুসলিম লিখেছেন, এই সংবাদপত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি পড়ে আমাদের মনে হয় যেন আমরাও জামা’তের একটি অংশ। বিশেষকরে এতে যে অনূদিত জুমুআর খুতবা ছাপা হয়, এটি আমাদের ঈমানে উন্নতির কারণ হয়। পূর্বে আমরা নিজেদেরকে আহমদীয়া জামা’তের থেকে পৃথক ভাবতাম, কিন্তু এখন আমরা খুতবা পাই ফলে আমাদের মনে হয়, আমরাও আহমদীয়া জামা’তের একটি অংশ।”

(আল-ফযল, ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৭)

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

তাহরীকে জাদীদ ব্যবস্থাপনার অধীনে ওয়াকেফীনদের মাধ্যমে দেশের

আটটি স্থানে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(আল-ফযল, ২৯ আগস্ট ১৯৩৫, পৃ. ০৮)

দেশে তবলীগী Survey (তথ্য জরিপ)

১৯৩৫ সালের জানুয়ারি থেকে নিয়ে নভেম্বর পর্যন্ত প্রদেশের পাঁচটি জেলায় পরিপূর্ণরূপে তবলীগী জরিপ করা হয় যা একেবারেই নতুন বিষয় ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর দিকনির্দেশনায় উপশহর ও গ্রামে জরিপের জন্য দুই ধরনের ফরম প্রস্তুত করা হয় যার একটি দুই পৃষ্ঠার এবং অন্যটি এক পৃষ্ঠার। উপশহরের অবস্থা জরিপ করার জন্য হলুদ রঙের দুই পৃষ্ঠার ফরম এবং সাধারণ গ্রামের জন্য এক পৃষ্ঠার ফরম বানানো হয়। জরিপের এই কাজ সাইকেলের মাধ্যমে করা হতো। প্রথমে চারজন সাইকেল আরোহী প্রেরণ করা হয়। একজনের কাছে তার নিজস্ব সাইকেল ছিল, দুটি সাইকেল উপটোকনস্বরূপ পাওয়া যায় এবং একটি সাইকেল অফিসে জমা করে। ১৯৩৫ সালের ১১ জানুয়ারি হুযূর (রা.) ঘোষণা দিয়ে বলেন, ‘এখনই ষোলোটি সাইকেলের প্রয়োজন’। এই ঘোষণা শুনে বিভিন্ন জামা’ত থেকে এত অধিক পরিমাণে সাইকেল পাঠাতে থাকে যার ফলে একসময় সাইকেল না পাঠানোর নির্দেশনাও দিতে হয়। এই পুণ্য কাজে দিল্লী প্রথম স্থান অধিকার করে।

(আল-ফযল, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫, পৃ. ০২)

এই তবলীগী জরিপের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী ছিল— এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নিজ ভাষায় শুনুন। তিনি (রা.) বলেন:

“আমি বিভিন্ন জেলায় জরিপ করিয়েছি আর আমার আকাজক্ষা হল, যে-সব জেলায় জরিপ করা হয়েছে সে-সব জেলায় যারা কামার, তাতী বা অন্যান্য পেশায় দক্ষ বেকার আহমদী আছে, তাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেব। সকল গ্রামের চিত্র আমাদের কাছে আছে, এমনকি প্রত্যেক বাড়ির তালিকাও আমাদের কাছে প্রস্তুত আছে যা দ্বারা ঐ সমস্ত গ্রামের কর্মজীবী ও ব্যবসায়ীদের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া গেছে। এর মাধ্যমে আমি চাই, আমার জামা’তের বিভিন্ন পেশার বেকার লোকদেরকে বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে

দেব। যেমন, যেখানে কামার নেই, সেখানে আহমদী কামারদের পাঠানো হবে। যেখানে রাজমিস্ত্রী নেই, সেখানে আহমদী রাজমিস্ত্রী পাঠানো হবে। যেখানে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নেই, সেখানে আহমদী চিকিৎসক প্রেরণ করা হবে। এই স্কিমের অধীনে আমাদের জামা'ত যদি বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাহলে ঐ সকল এলাকায় যেক্ষেত্রে আমাদের বহু তবলীগী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেক্ষেত্রে সেখানের লোকেরাও আহমদীদের দিয়ে কাজ করাতে বাধ্য হবে। এভাবে একদিকে আহমদীদের বেকারত্বও দূর হবে আর তবলীগী কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে বরং শিক্ষিত লোকেরা বিভিন্ন গ্রামে স্কুলও প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যেমন আমাদের তালিকায় এমন বহু জায়গার নাম আছে যেখানে স্কুলের প্রয়োজন অথবা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের প্রয়োজন অথবা ঔষধ প্রস্তুতকারকের প্রয়োজন আছে কিন্তু তারা এমন লোক পাচ্ছে না। এমনইভাবে হিন্দুস্তানের বাইরেও আমরা বিভিন্ন পেশাজীবীদেরকে প্রেরণ করতে চাই যেখানে উত্তমরূপে বিভিন্ন কাজ করা যেতে পারে...। মোটকথা পৃথিবীতে এমন এমন জায়গা আছে যেখানে উত্তমরূপে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যেতে পারে। আমরা জরিপ করে দেখেছি আর সব জায়গার চিত্র অঙ্কন করেছি। ঐ সকল এলাকায় একটু সাহস করলে আমরা বেকারদেরকে কাজে লাগাতে পারি আর বহু তবলীগী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এটি এমন উচ্চমানের কাজ যার গুরুত্ব জামা'ত এখনও উপলব্ধি করে নি। যদিও জরিপের ভাণ্ডার এখনও কেবল কয়েকটি খাতায় সীমাবদ্ধ কিন্তু এগুলোই যদি ইউরোপবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে এর বিনিময়ে তারা লক্ষ লক্ষ রুপি দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, আমাদের জামা'ত এখনও এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নি। একইভাবে আমি ব্যবসার জন্য বিভিন্ন স্থানের জরিপ নিচ্ছি। এছাড়া চীন, জাপান এবং অন্যান্য দেশের কোন্ কোন্ স্থানে কী ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়েছে- তা-ও জানার চেষ্টা করছি যাতে আমাদের জামা'তের ব্যবসায়ী বা ঐ সমস্ত লোকেরা যারা ব্যবসার সাথে জড়িত- তাদেরকে ঐ সকল এলাকায় পাঠানো যায়।”

(বক্তৃতা, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৫, আল-ফযল, ১৪ মার্চ ১৯৩৬, পৃ. ৪)

মুকেরিয়ান (হুশিয়ারপুর জেলার) মিশন

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তবলীগী জরিপের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তাহরীকে জাদীদের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৫ সালে চারটি তবলীগী কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠা করেন, যার মধ্যে (হুশিয়ারপুর জেলার) মুকেরিয়ান এবং (অমৃতসর জেলার) বেরুওয়াল-এর মিশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমীরুল মুজাহিদ্দীন মুখতার আহমদ আইয়াজ সাহেবের প্রচেষ্টায় প্রথমবারের মত মুকেরিয়ানে মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য একজন আহমদী অর্থাৎ হযরত মৌলভী মোহাম্মদ উযির উদ্দিন সাহেব (রা.)-এর পুত্র স্টেশন মাস্টার মৌলভী মুহাম্মদ আযীয উদ্দীন সাহেব নিজের বাড়ি দান করেন। বিভিন্ন জায়গায় এই মিশনের অঙ্গসংগঠনের শাখা খোলা হয় যেমন: ছিনইয়ান, বেহবদাল ও মুহিতপুর।

মুকেরিয়ান শহর ছিল বিরোধিতার ঘাঁটি। আবার এর আশপাশের এলাকাতেও বিরোধীদের উৎপাত খুব কষ্টদায়ক ছিল। ঘাসিটপুরের অধিবাসী মিয়া আলী মোহাম্মদ সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী একদা আহমদীদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করা হয়। ঘটনার বিবরণ হল, আইয়াজ সাহেব ডুগরিয়া মৌজায় ঈদের নামায আদায় করতে যান। তার সাথে হযরত বাবু ফকীর আলীও ছিলেন। হঠাৎ তারা জানতে পারলেন, যে বাড়িতে তারা একত্রিত হয়েছেন, বিরোধীরা সেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। তখন সব আহমদী লুকিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

আইয়াজ সাহেবের পর ক্যাপ্টেন ডাক্তার সৈয়্যদ মোহাম্মাদ হোসাইন সাহেব এবং হযরত চৌধুরী গোলাম আহমদ সাহেব (রা.) আমীরুল মুজাহিদ্দীন নির্বাচিত হন। [তাহরীকে জাদীদের পুরোনো রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, চৌধুরী গোলাম আহমদ সাহেব (রা.) ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমীরুল মুজাহিদ্দীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম ওকালাতে মাল (বর্তমান সুপারিনটেনডেন্ট) রাশেদ আহমদ সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী ডাক্তার সাহেবকে ভাঙ্গালা নামক একটি গ্রামে লাঠি দিয়ে প্রহার করা হয় (তিনি ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে আহমদী হন। ১৯৩৫ সালের মে মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাকে অ-আহমদী বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য মুকেরিয়ান প্রেরণ করেন। সে-সময় আমীরুল মুজাহিদ্দীন ছিলেন মুখতার আহমদ সাহেব আইয়াজ। কিছুদিন পর আইয়াজ সাহেব বিদায় নিলে ক্যাপ্টেন সৈয়্যদ মুহাম্মাদ হোসাইন সাহেব আমীরুল মুজাহিদ্দীন হিসেবে নিযুক্ত হয়ে সেখানে অবস্থান করেন)। বয়কট এত প্রকট ছিল যে, আহমদীদেরকে পানি সরবরাহ করতে দেওয়া হতো না, ফলে একটি গুরুদুয়ারা থেকে পানি নিতে হতো। মুকেরিয়ান সংলগ্ন ঘাসিটপুরের অধিবাসী মিয়া আলী মোহাম্মদ সাহেবের বর্ণনা

অনুযায়ী সেহতা গ্রামের মিয়া ফখল দীন সাহেব নামে একজন আহমদী ছিলেন যার নিজস্ব লোকেরা ক্ষেতের ফসল কাটতে অস্বীকৃতি জানায়। এ খবর মুকেরিয়ান পৌছলে উল্লিখিত ডাক্তার সাহেব এবং হযরত বাবু ফকীর আলী সাহেব, শেখ নূরুদ্দীন সাহেব, সৈয়দ লাল শাহ সাহেব এবং আরও কতিপয় মুজাহিদীন কাঁচি নিয়ে সেই গ্রামে পৌছান এবং ফসল কাটা শুরু করে দেন। আহমদী বন্ধুদের স্বেচ্ছাশ্রমের এই স্পৃহা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক ভালবাসা দেখে আশপাশের বহু লোক প্রভাবিত হয় এবং বয়কট তুলে নেয়।

কিছুকাল পর অ্যাডভোকেট চৌধুরী মুহাম্মদ শরিফ মোন্টগোমেরী সাহেব যখন আমীরুল মুজাহিদীন হন তখন মুকেরিয়ান শহরের ‘যিলদার’ (শিখ ও ইংরেজ আমলে গ্রাম্য সরকারি আমলা) খুশহাল মুহাম্মদ সাহেব চৌধুরী সাহেবের সাথে সুসম্পর্কের কারণে এলাকায় ঘোষণা করান যে, আহমদীদেরকে কেউ যেন আর কষ্ট না দেয়। এর ফলে সেখানে শান্তি ফিরে আসে এবং সাধারণ মুসলমান দোকানদারেরা আহমদীদেরকে মুদীসামগ্রী ইত্যাদি দেওয়া শুরু করে।*

* নোট: ওয়াকফে জিন্দেগী এবং রাবওয়ার খেলাফত লাইব্রেরির ইনচার্জ মোকাররম চৌধুরী মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব এম. এ. বর্ণনা করেন, ১৯৩৫ সালে মুকেরিয়ান মিশনে আমার তবলীগ করার সুযোগ হয়...। সাধারণত সাপ্তাহিক রিপোর্টের জন্য প্রতি শুক্রবার আমাকে মুকেরিয়ান আসতে হতো। প্রথমদিকে মুকেরিয়ানে অনেক বিরোধিতা ছিল এবং বিরোধীরা কূপ থেকে পানি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে মিশন হাউসের উঠানে কূপ খনন করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে পানি নেওয়া হতো। একদিন বাজামাত মাগরিবের নামায পড়া অবস্থায় শত্রুরা বাইরে থেকে গোবরের ঘুঁটে ইত্যাদি ছুঁড়ে মারা আরম্ভ করে, কিন্তু আল্লাহ তা’লার নিজ কৃপায় সকল নামাযীকে সুরক্ষা করেন। মুকেরিয়ানে ভয়াবহ বিরোধিতার সময় প্রতিবেশী মোসাম্মৎ করীম বিবি আহমদীদেরকে সব দিক থেকে সাহায্য করেন এবং বিরোধীদেরকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করেন। পরবর্তীতে তার সন্তানদের মাঝ থেকে দীন মুহাম্মদ নামে এক পুত্রের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয় এবং তিনি স্থায়ীভাবে কাদিয়ান চলে আসেন। মুকেরিয়ান মিশন হাউসটি ছিল হযরত মৌলভী মুহাম্মদ উযির উদ্দীন সাহেব (রা.)-এর সম্পত্তি। যিনি ছিলেন ৩১৩ জন সাহাবীদের মধ্যে একজন। স্টেশন মাস্টার মুহাম্মদ আযীয উদ্দীন সাহেব (রা.) [পিতা মৌলভী মুহাম্মদ উযির উদ্দীন সাহেব (রা.)] সেই বাড়িটি ওসিয়তস্বরূপ কাদিয়ানের সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়াকে উৎসর্গ করে দেন আর সেখানেই এই মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২৬, ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সালে মুহিতপুরে মাওলানা আবুল আতা সাহেব জলন্ধরি (রা.) শিয়া আলেম মির্যা ইউসুফ আলী সাহেবের সাথে ধর্মীয় তর্ক-বিতর্ক করেন যার ফলে আহমদীয়াত অনেক সুখ্যাতি পায় এবং কিছু মানুষ আহমদীত কবুল করেন।

এই মিশনে হযরত বাবু ফকির আলী সাহেব (রা.), অ্যাসিসটেন্ট জেলা নির্বাহী অফিসার, ক্যাম্পবেলপুর মালেক গোলাম নবী সাহেব আমীরুল মুজাহিদ্দের দায়িত্ব পালন করেন। তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদদের মধ্যে যে-সকল সাহাবী এখানে কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে মৌলভী রওশন উদ্দীন সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি দীর্ঘ বারো বছর পর্যন্ত সত্য প্রচার করে গেছেন। ১৯৪৬ সালের মে মাসে তিনি কুয়েতে যাওয়ার জন্য কাদিয়ান চলে আসেন এবং মিশনের ইনচার্জ হিসেবে মৌলভী হুসাম উদ্দীন সাহেব দায়িত্ব পালন করেন।

নোট: হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব সিয়ালকোটি (রা.), ডক্টর ভাই মাহমুদ আহমদ সাহেব (সারগোদা), খালেদে আহমদীয়াত হযরত মৌলভী জালাল উদ্দীন শামস (রা.)-এর পুত্র হযরত মৌলভী ইমাম উদ্দীন সাহেব (রা.)-এরও মুকেরিয়ান মিশনে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে।

বেরুয়াল মিশন

অমৃতসর জেলার বেরুয়ালেও তাহরীকে জাদীদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। খাসপুর, ফতেহবাদ, মিয়াবেন্ড, গোয়েন্দাল এবং জালালাবাদে এই কেন্দ্রের শাখা ছিল। মুকেরিয়ানের তুলনায় বেরুয়ালে অনেক বেশি বিরোধিতা ছিল। এ জন্য প্রথমদিকে অনেক সময় পনেরো-ষোলজন মুজাহিদকে (যারা তাদের ছুটির দিনগুলিতে নিজেদেরকে ওয়াকফ করতেন) সেখানে প্রেরণ করা হতো।*

* নোট: যেমন হযরত মুন্সি সেকেন্দার আলী সাহেব, হযরত হেকীম কুতুব উদ্দীন সাহেব, বাবু গোলাম মুহাম্মদ সাহেব, ড. মুহাম্মদ আনোয়ার সাহেব, চিফ মেডিকেল অফিসার রেলওয়ে ড. আব্দুল হামীদ সাহেব, ডাক্তার ওবাইদুল্লাহ সাহেব অফ লাহোর, চিফ কমিশনার পেশাওয়ার মির্খা গোলাম রসুল সাহেব, ড. মির্খা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব, মির্খা মুনির আহমদ সাহেব, চৌধুরী আনোয়ার হোসাইন সাহেব, মুলতানের এডিশনাল কমিশনার পীর সালাহ উদ্দীন সাহেব।

বেরুয়াল হালকায় যাদেরকে একের পর এক আমীরুল মুজাহিদ্দের মনোনীত করা হয় তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ:

(১) ড. আযম আলী সাহেব গুজরাট। (তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন এবং বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে বিরোধীদের মন জয় করতেন।)

(২) হযরত কাজী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেব। (অন্যদের ওপর তাঁর পুণ্যের প্রভাব পড়ত।)

(৩) হযরত মিয়া মুহাম্মদ ইউসুফ খান সাহেব। (তিনি সারাদিন কাজ করতেন এবং প্রতিদিন উপকেন্দ্রগুলোতে সফর করতেন।)

(৪) স্যার ডা. গোলাম মোস্তফা সাহেব।

(৫) আব্দুল মজিদ খান সাহেব অফ বেরুয়াল। [(১৯৪৭ সালে) দেশ বিভাগের আগ পর্যন্ত প্রায় ছয়-সাত বছর তিনি আমীরুল মুজাহিদ্দীন ছিলেন।]

বেরুয়ালে ভয়াবহ বিরোধিতা ছিল। অমৃতসর ইত্যাদি এলাকা থেকে অধিকহারে মন্দভাষী ও উগ্রস্বভাবের বক্তাদেরকে বক্তৃতা করানোর জন্য সেখানে নিয়ে আসা হতো যারা ভয়ানক উদ্বেজনা সৃষ্টি করত এবং বয়কট জারি রাখতে বলতো। কিন্তু আহমদী মোবাল্লেগদের ধারাবাহিক বক্তৃতা এবং তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদ্দীনের ধৈর্য ও দৃঢ়তা, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি এবং দোয়ার ফলে আল্লাহ তা’লার কৃপায় অনেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আহমদীয়ত গ্রহণ করেন যাদের মাঝে লায়লপুরের মেহের আল্লাহ দিত্তা সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই এলাকায় আরিয়া এবং খ্রিষ্টানরা সব জায়গায় গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়াতো এবং মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করতে থাকতো। সাধারণ মুসলমানরা এই আক্রমণে তটস্থ ছিল। আরিয়া এবং খ্রিষ্টানরা যখন আহমদী মোবাল্লেগদের কাছে পরাজিত হতে থাকে তখন মুসলমানরা সাহসী হয়ে ওঠে।



জামেয়া আহমদীয়া, ইউকে।



জামেয়া আহমদীয়া, ঘানা ।



জামেয়া আহমদীয়া, কাদিয়ান, ভারত ।



জামেয়া আহমদীয়া, জার্মানি।



জামেয়া আহমদীয়া, কানাডা।

দারুস্-সানা’আত

আহমদী যুবকদের মাঝে কারু-শিল্পের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে (কাদিয়ানের দারুল বরকত মহল্লায়) দারুস-সানা’আত প্রতিষ্ঠা করা হয়।*

০২ মার্চ ১৯৩৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর উদ্বোধন করেন।

* নোট: দারুল বারাকাতে অবস্থিত ঠিকাদার আব্দুর রহমান সাহেবের বাড়িতে এই কারখানাটি চালু করা হয় এবং কামারের কাজ শেখানোর জন্য মিস্ত্রী শের মোহাম্মদ সাহেবকে এবং ছুতোরের (কাঠ শিল্পের) কাজ শেখানোর জন্য মিস্ত্রী নযির আহমদ সাহেব লাহোরীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। কাজ শেখার জন্য সর্বপ্রথম ০৬জন ছাত্র ভর্তি হয়।

(আল-ফযল, ০৪ মার্চ ১৯৩৬, পৃ. ০২)

ঐ সময় হুযূর (রা.) রান্দা (কাঠ মিস্ত্রির অস্ত্রবিশেষ) নিয়ে নিজ পবিত্র হাতে কাঠ পরিষ্কার করেন এবং করাত দিয়ে কাঠ দুই টুকরা করে শেখালেন, নিজ হাতে কাজ করায় লজ্জার কিছু নেই বরং এটি সম্মানের কারণ হয়।

দারুস্-সানা’আতে ছাত্রদের তা’লীম-তরবিয়ত এবং তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল তাহরীকে জাদীদের অধীনে। প্রাথমিকভাবে সমস্যার সমাধান এবং নিয়ম-কানুন সম্পর্কে মুখে মুখেও শিক্ষা দেওয়া হতো। এর ০৩টি বিভাগ ছিল যথাক্রমে ১. কাঠ মিস্ত্রী, ২. কামার ও ৩. চামড়া শিল্প। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বাবু আকবর আলী সাহেবকে (যিনি বিভাগীয় রেলওয়ে ইন্সপেক্টর থেকে অবসরপ্রাপ্ত হন) অবৈতনিকভাবে এই কাজের নিগরান নিযুক্ত করেন। এই শিল্প বিভাগটি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত খুব সফলতার সাথে অগ্রসর হতে থাকে।

(মাসিক ‘তাহরীকে জাদীদ’, রাবওয়া, আগস্ট ১৯৬৫)

তাহরীকে জাদীদের বোর্ডিং

১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাহরীকে জাদীদের বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বোর্ডিংয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, “আহমদী সন্তানদেরকে ইসলামী চারিত্রিক গুণাবলি শেখাতে হবে। যেমন সত্য বলতে কী বুঝায়, সত্য বলার কারণে কী কী সমস্যার

সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে আর শরীয়ত এর জন্য কী ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি রেখেছে ইত্যাদি। এ কথাগুলো তাদেরকে শেখাতে হবে।

(আল-ফযল, ১৭ জুলাই ১৯৩৭, পৃ. ১০)

হুযূর (রা.) বোর্ডিং প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৯৩৫ সালের শুরায় এই বোর্ডিংয়ের নিয়মনীতিগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন— “কিছু বন্ধু ভুল বুঝেন। তারা মনে করেন, তাহরীকে জাদীদের অধীনে কোন পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্কুল নয় বরং বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেকে তাদের সন্তানদের বিষয়ে বলেন, ‘আমাদের সন্তানদেরকে কাদিয়ানে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হোক, তাই তা হাইস্কুলে হোক অথবা মাদ্রাসায় আহমদীয়াতে হোক’। কিন্তু তাহরীকে জাদীদের অধীনে যে পৃথক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেটি স্কুল নয় বরং বোর্ডিং। আপনাদের সন্তানরা চাইলে মাদ্রাসায় আহমদীয়াতে পড়তে পারে, চাইলে হাইস্কুলে পড়তে পারে, তবে এই মুহূর্তে হাইস্কুলের ছাত্রদের জন্য এই বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার অধীনে যারা নিজেদের সন্তানদেরকে দিতে চান তাদের জন্য প্রথমত আবশ্যিক হল, তারা যেন তাহরীকে জাদীদ অফিস বরাবর এ মর্মে অঙ্গকারনামা জমা দেন— ‘আমরা আমাদের সন্তানদেরকে তাহরীকে জাদীদের অধীনে আপনাদের হাতে সমর্পণ করলাম’।

দ্বিতীয়ত ছাত্রদের ওপর তাহরীকে জাদীদের কর্মকর্তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে। অর্থাৎ তরবিয়ত দেবার ব্যাপারে ছাত্রের পিতা বা অভিভাবকের কোনরূপ হস্তক্ষেপত করার সুযোগ নেই। এই সকল ছাত্রদের একই রকম খাবার দেওয়া হবে, তবে ঐ সমস্ত ছাত্ররা যারা নিজ এলাকায় রুটি নয় বরং ভাত খেয়ে অভ্যস্ত, তাদেরকে ভাত ও তরকারি দেওয়া হবে। কিন্তু বাকি সকলের জন্য একই রকম খাবার দেওয়া হবে এবং সকলকে একইভাবে রাখা হবে। তাদের মধ্যে কোন দৃশ্যমান পার্থক্য থাকতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ তারা ধনী-গরিব বা ছোট-বড়র মাঝে কোন পার্থক্য অনুভব করবে না। অতএব তাদের খাবারদাবার ও পোশাক-আশাক একই ধরনের হবে। অতঃপর তাদের ধর্মীয় শিক্ষার ওপর অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হবে। হ্যাঁ! স্কুল পাশ করার জন্য তাদেরকে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকও পড়ানো হবে, তবে এটি মূল উদ্দেশ্য নয় বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া। প্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রদেরকে তাহাজ্জুদ পড়ানো হবে এবং কোন পিতামাতার অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। প্রয়োজনে কোন ছাত্রকে বোর্ডিং থেকে বহিষ্কার করা হতে

পারে। কোন অভিভাবকের পক্ষ থেকে একথা শোনা হবে না যে, অমুক ছাত্রের এই এই সমস্যা এবং উক্ত সমস্যার এভাবে সমাধান করা উচিত অথবা তার জন্য এমন ব্যবস্থা করা হোক। এই বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেন্ড আমাদের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ যে, তিনি ঐ ছাত্রদের মাঝে পিতার ভূমিকা পালন করবেন আর ছাত্রদের মাঝ থেকে কেউ যদি অনৈতিক কাজ করে তবে এর শাস্তি কী হতে পারে তা ছাত্ররাই সিদ্ধান্ত নিবে। যেমন, অমুক মিথ্যা বলেছে তাই তার এই শাস্তি হওয়া উচিত ইত্যাদি।”

উক্ত বোর্ডিংয়ের জন্য এমনই নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এখনও আমি চিন্তা-ভাবনা করছি। অতএব যে-সকল বন্ধু এই তাহরীকের অধীনে নিজেদের সন্তানদেরকে ভর্তি করাতে চান, তারা যেন লিখিত আবেদন জমা দেন। কেবল এখানের কোন মাদ্রাসায় ভর্তি করানোই যথেষ্ট হবে না। এমনইভাবে তাদেরকে বোর্ডিং অথবা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কোনরূপ লিখিত অভিযোগ করার অধিকার থাকবে না। তারা যদি লিখতে চান তাহলে তাহরীকে জাদীদের ইনচার্জকে লিখবেন। ইনচার্জ যদি যৌক্তিক মনে করেন তাহলে উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৫, পৃ. ১৬-১৭)

বোর্ডিং প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র (রা.)-এর কিছু দিকনির্দেশনা

১। ছাত্রদের শরীর গঠন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের উন্নতি সাধন হয়- এমন খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। অপরাধী ছাত্রের শাস্তি কী হবে তা ছাত্ররাই নির্ধারণ করবে।

৩। খাবারের ব্যবস্থাপনা ছাত্রদের হাতেই দিতে হবে।

৪। ছাত্রদের চারিত্রিক মান উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন তাদেরকে শেখাতে হবে- ‘কুধারণা এবং নজরদারির মাঝে কী পার্থক্য? আর এগুলো না জানলে কী ক্ষতি হয় ইত্যাদি’।

৫। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে ছাত্রদের অবগত করতে হবে। একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেখাতে হবে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কোথায় কোথায় মুসলমানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল আর তৃতীয় শতাব্দীতে তা কী পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করেছিল আর আজ চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে

মুসলমানদের কী দশা- তা দেখাতে হবে। এর ফলে প্রত্যেক ছাত্রের হৃদয়ে এক ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হবে। ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমেই সেই ক্ষত নিরাময় হতে পারে।

৬। এই নির্দেশনাও দিয়েছি যে, প্রত্যেক ছাত্রের কক্ষে এমন চিত্র থাকবে যদ্বারা আমাদের ছেলেরা বুঝতে পারবে, পূর্বে মুসলমানের কেমন জয়জয়কার ছিল আর আজ কী অবস্থা! আমরা যতক্ষণ আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে এক ধরনের আগুন না জ্বালাতে পারব আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণকারী এমন ক্ষতের সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সফল হতে পারব না। ইসলামের উন্নতির জন্য এমন প্রভাব সৃষ্টি হওয়া আবশ্যিক যা পুরোনো স্মৃতি স্মরণ করাবে এবং এক মুহূর্তের জন্য শান্তি দিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা দুর্বল থাকবে এবং অধিক উত্তম ফলাফল সৃষ্টি হবে না। এসব বিষয় তাহরীকে জাদীদের কেন্দ্র এবং বোর্ডিংয়ের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

(আল-ফযল, ১৪ এপ্রিল ১৯৬১)

মৌলভী আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বোর্ডিংয়ের কর্মকর্তাদের প্রতি এই নির্দেশনা ছিল যে, ছেলেদের কোন্ বিষয়ের প্রতি সহজাত আকর্ষণ রয়েছে তা তারা রেকর্ড রাখবে, যাতে তারা যখন বোর্ডিং থেকে বের হবে তখন তাদের পিতামাতাকে বলা যেতে পারে যে, আপনার সন্তানের অমুক বিষয়ের প্রতি আগ্রহ রয়েছে, তাই তাকে উক্ত বিষয়ে পড়াশুনা করালে তার জন্য কল্যাণকর।

শুরুতে ৩৬-৩৭ জন ছাত্র বোর্ডিংয়ে ভর্তি হয় (আল-ফযল ১৩ এপ্রিল ১৯৬১)। ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একজন মৌলভী ফায়েল পাশ শিক্ষককে টিউটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় (আল-ফযল ১লা জুলাই ১৯৩৫)। ছাত্ররা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি নিয়মিত বাজামা’ত নামায তো পড়তো-ই, এমনকি তাহাজ্জুদ নামাযও পড়তো। ক্ষেত-খামারের কাজ শেখা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।

(আল-ফযল, ১৯ জুন ১৯৩৬)

১৯৩৫ সালে মজলিসে শূরার অনতিপরেই বোর্ডিংয়ের কার্যক্রম শুরু হয় এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) হযরত সুফি গোলাম আহমদ

সাহেবকে বোর্ডিংয়ের সুপারিনট্যান্ডেন্ট নিযুক্ত করেন। ১৯৩৫ সালের ২৮ জুন হযরত সুফি সাহেব বি.টি. সম্পন্ন করার জন্য আলীগড় চলে গেলে প্রায় দুই বছরের জন্য হযরত মালেক মওলা বখশ সাহেবের পুত্র মালেক সাঈদ আহমদ সাহেব (বি.এ.)-এর স্কন্ধে উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এরপর হযরত সুফি সাহেব ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন এবং বোর্ডিংয়ে ক্রমান্বয়ে মৌলভী আব্দুল খালেক সাহেব, মালেক সালাহ উদ্দীন সাহেব (এম.এ.), মৌলভী মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব, চৌধুরী ফজল আহমদ সাহেব, চৌধুরী ফজলুর রহমান সাহেব, চৌধুরী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব, মৌলভী ইমাম উদ্দীন সাহেব মুলতানী, মৌলভী মুহাম্মদ আহমদ সাহেব জলিল, চৌধুরী মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব খালেদ, মালেক মুহাম্মদ শরিফ সাহেব এবং চৌধুরী ইসমত আলী সাহেব টিউটরের দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময় চৌধুরী ফজল আহমদ সাহেব এবং মুন্সি ফজল ইলাহী সাহেব খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বছরে কয়েকবার বোর্ডিংয়ে যেতেন এবং সরাসরি ছাত্রদের খোঁজখবর নিতেন।

নোট: উদ্বোধনের পর হযূর (রা.) ১৯৩৫ সালের ২৮ জুলাই প্রথমবার বোর্ডিংয়ে আসেন। ছাত্ররা তাঁর হাতে হাত মেলানোর সৌভাগ্য লাভ করে। তিনি (রা.) সংক্ষিপ্তভাবে তাদের পরীক্ষাও নেন। এছাড়া তাদের শারীরিক ও জ্ঞানগত উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনাও প্রদান করেন।

(আল-ফযল, ৩০ জুলাই ১৯৩৫, পৃ. ০২)

একবার হযূর সাথে করে মিষ্টি নিয়ে যান। ছাত্ররা ভিড় করতে থাকে। কর্মকর্তারা তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাতে চাইলে হযূর (রা.) বলেন, তাদেরকে সেভাবেই আসতে দিন যেভাবে তারা নিজেদের ঘরে পিতামাতার কাছে যায়।

(মাসিক খালেদ, রাবওয়া, জানুয়ারি ১৯৬২, পৃ. ২২)

এই বোর্ডিং বছরের পর বছর তাহরীকে জাদীদের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে। ১৯৪৬ সাল থেকে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, কাদিয়ানের নাযারাতে তা’লীম ও তরবিয়তের ওপর। এই বোর্ডিংয়ের বিষয়ে হযূর অনেক আশাবাদী ছিলেন। হযূর (রা.) ১৯৩৮ সালের ০৩ আগস্ট এক বক্তৃতায় বলেন, “বদরের যুদ্ধের সময় কাফেররা যখন ইসলামি সৈন্যবাহিনীর অবস্থা নিরূপণের জন্য লোক পাঠায় তখন তারা

ফিরে গিয়ে বলে- বাহনের ওপর আমরা কোন মানুষ দেখতে পাই নি বরং মৃত্যুদূত দেখেছি। তাদের সাথে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না অন্যথায় আমাদের পরাজয় নিশ্চিত। যে-দিন আমরা যুবকদের মাঝে এই স্পৃহা দেখব যে, ইসলামের সেবায় তারা প্রাণ উৎসর্গ করতে এবং কুফুরী নামক বিহঙ্গ আসলেই বাঁপিয়ে পড়তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ, সে-দিনই আমরা বুঝব, তাহরীকে জাদীদের বোর্ডিং বানানোর যে উদ্দেশ্য ছিল, তা আজ সফল হয়েছে।

(আল-ফযল, ১৩ এপ্রিল ১৯৬১, পৃ. ০৫)

বৈদিক ইউনানি ঔষধালয় দিল্লী

তাহরীকে জাদীদের জাতীয় মূলধনের অর্থ দ্বারা ‘বৈদিক ইউনানি ঔষধালয়’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঔষধালয় চালু করার পূর্বে হযরত আমীরুল মু’মিনীন (রা.) কয়েকজন ওয়াকফে জিন্দেগীকে ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর পড়াশুনা করান এবং নিজেও বৈদিক এবং ইউনানি ঔষধের বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

(আল-ফযল, ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৭)

হাকীম আব্দুল মজীদ সাহেব হালালপুরী, হাকীম মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব ফায়েল উক্ত ঔষধালয়ে নিয়োজিত ছিলেন। ঔষধালয়ের প্রথম নায়েম ছিলেন কুরাইশী মুখতার আহমদ সাহেব অফ দিল্লী এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব মুনীর। এই ঔষধালয় ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।



আহমদীয়া হাসপাতাল, নাইজেরিয়া।



আহমদীয়া হাসপাতাল, ঘানা ।



আহমদীয়া হাসপাতাল, গাম্বিয়া ।



আহমদীয়া হাসপাতাল, গুয়াতেমালা ।



আহমদীয়া হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক, কুমাসি, ঘানা ।

ইংরেজি ভাষায় কুরআন অনুবাদ

তাহরীকে জাদীদের অধিনে ইংরেজিতে কুরআন অনুবাদের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখ হযরত মৌলভী শের আলী সাহেবকে ইংল্যান্ড প্রেরণ করা হয়। তিনি ১৯৩৮ সালের ০৯ নভেম্বর কাদিয়ানে ফিরে আসেন।

(আল-ফযল, ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৮, পৃ. ১১)

পঁচিশ লক্ষ রূপির রিজার্ভ ফান্ড

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন—

“আমি আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে রিজার্ভ ফান্ডের জন্য ২৫ লক্ষ রূপির তাহরীক করি, তবে তা একত্রিত হওয়া ছিল কল্পনাভীত। কিন্তু আল্লাহ তা’লা তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ রূপি একত্রিত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এর ফলে এমন সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে এবং হচ্ছে, যেগুলো থেকে বছরে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ রূপি আয় হতে পারে। উদ্দেশ্য হল, তবলীগের কাজ বাজেটের ঘাটতির কারণে যেন কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।”

(আল-ফযল, ২৪ নভেম্বর ১৯৩৮, পৃ. ১১)

তাহরীকে জাদীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য

তাহরীকে জাদীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল, আহমদীরা যেন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বল্প সময়ের মাঝে দূরদূরান্তের এলাকায় গিয়ে আহমদীয়াতের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। সে যুগে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন—

“এখন যেহেতু প্রচার-প্রচারণার যুগ আর আল্লাহ তা’লা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়াত ছড়িয়ে দেবেন। তাই আল্লাহ যদি বলে দিতেন যে, আহমদীয়াতের প্রচার-প্রসারের জন্য অমুক দেশ উপযুক্ত তাহলে আমরা সবাই সেখানে গিয়ে একত্রিত হতাম এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে অলসতা দেখাতাম। তাই আজ আল্লাহ তা’লার অভিপ্রায় হল, আমরা যেন পৃথিবীর সকল দেশে ছড়িয়ে পড়ি এবং জগতে ঘুরে ঘুরে সেই দেশ অন্বেষণ করি যেটি আহমদীয়াতের জন্য মদীনাসদৃশ। এই

উদ্দেশ্যে আমরা যখন জগতের সকল দেশে ঘুরে বেড়াবো তখন প্রত্যেক দেশেই আহমদীয়াতের বীজ বোপিত হতে থাকবে আর এভাবে খোদা তা’লার এই অভিপ্রায়ও পূর্ণ হবে অর্থাৎ আহমদীয়াত যেন পৃথিবীর সকল দেশে ছড়িয়ে পড়ে আর একসময় আমরা সেই স্থানও খুঁজে পাব, যে স্থানের খোঁজে আমরা বের হয়েছি।”

(খুতবা জুমুআ, ১৫ মার্চ ১৯৩৫)

তিনি (রা.) আরও বলেন, “আধ্যাত্মিক জামা’তের সদা বিভিন্ন দেশে নিজেদের তবলীগ ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। কারণ যদি এক স্থানে বিরোধিতা হয় তবে অন্য স্থানে যেন এর ঘাটতি পূরণ করা যায়। যেভাবে সেই ব্যক্তি অনেক লাভবান হয় যার বিভিন্ন দেশে ক্ষেত-খামার রয়েছে। এক দেশের একটি ক্ষেতে যদি লোকসান হয় তবে অন্য দেশের ক্ষেত থেকে সেই লোকসান পুষিয়ে যায় এবং তার ক্ষতি লাঘব করে। একইভাবে সেই ধর্মীয় জামা’ত উপকৃত হয় যার সদস্যরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, কেননা তাদেরকে কখনও ধ্বংস করা যায় না। অতএব আমাদের জামা’তের সদস্যরা যদি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তবে তারা নিজেরাই উন্নতি করবে এবং তাদের উন্নতিতে জামা’তের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আর যে-জামা’তের ধ্বনি সমস্ত পৃথিবী থেকে উচ্চারিত হয়, তাদের ধ্বনিতে মানুষ ভয় পায় আর যে-জামা’তের সহমর্মী সারা জগতে থাকে, সেই জামা’তের ওপর আক্রমণ করা সহজ নয়। তাই বর্তমান নীরবতার কারণে এ কথা মনে করো না যে, আমাদের জন্য আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই নীরবতার অর্থ হল, বহু আন্দোলন মাথা চাড়া দিতে যাচ্ছে। তাই বর্তমান নীরবতা দেখে তোমরা ভেবো না, তোমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সেই নৈরাজ্য তো তোমাদেরকে জাগ্রত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। এখন তোমরা যদি পুনরায় ঘুমিয়ে পড়, তাহলে স্মরণ রেখ! আগামী শাস্তি আরও অনেক বেশি কঠোর হবে। আল্লাহ তা’লা তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী। তোমরা যদি জগতে ছড়িয়ে না যাও এবং ঘুমিয়ে পড় তাহলে তিনি তোমাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে জাগাবেন আর প্রত্যেক পরবর্তী টানা-হেঁচড়া পূর্বের তুলনায় অধিক কষ্টদায়ক হবে। অতএব পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, ছড়িয়ে পড় পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, ইউরোপে, আমেরিকাতে, আফ্রিকাতে, চীনে, জাপানে, ছড়িয়ে পড় পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। পৃথিবীর কোন স্থান, পৃথিবীর কোন দেশ, পৃথিবীর

কোন একটি এলাকা এমন যেন না থাকে যেখানে তোমরা নেই। অতএব ছড়িয়ে পড় যেভাবে সাহাবা (রা.) ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ছড়িয়ে পড় যেভাবে প্রথম যুগের মুসলমানরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তোমরা যেখানে যাবে সেখানে নিজেদের সম্মানের পাশাপাশি জামা’তের সম্মানও প্রতিষ্ঠা করবে। যেখানে থাকবে সেখানে নিজেদের উন্নতির পাশাপাশি জামা’তের উন্নতিরও কারণ হবে। এভাবে নিকটে ও দূরদেশে গিয়ে আহমদীয়াতের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাও তাহরীকে জাদীদের একটি উদ্দেশ্য।”

(আল-ফযল, ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৬, পৃ. ১০-১১)

হযূর আনোয়ার (রা.) তাহরীকে জাদীদের এই উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে ওয়াকফের আবেদনকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু যুবককে বহির্বিশ্বে পাঠানোর জন্য মনোনীত করেন। যেমন- মৌলভী গোলাম হোসাইন সাহেব আইয়ায, সূফী আব্দুল গফুর সাহেব, চৌধুরী মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব সিয়ালকোটী, সূফী আব্দুল কাদের সাহেব নিয়ায, হাফেয মৌলভী আব্দুল গফুর সাহেব জলন্ধরী, চৌধুরী হাজী আহমদ খান সাহেব আইয়ায, মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব নাসের, মালেক মুহাম্মদ শরীফ সাহেব অফ গুজরাট, মৌলভী রমযান আলী সাহেব, মৌলভী মুহাম্মদ দীন সাহেব।

এই যুবকদের মনোনীত করার সময় হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এবং চৌধুরী ফাতেহ মুহাম্মদ সাহেব সাইয়্যাল (রা.)-এর সাথে হযূর হযরত আমীরুল মু’মিনীন (রা.) কয়েকদিন পরামর্শ করেন। এরপর ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণিতে, জাহাজের ডেকের টিকিট ক্রয় করে এবং তাদের জন্য ছয় মাসের ভাতা প্রদান করে তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেন যে, তারা যেন ছয় মাসের ভিতরে ব্যবসা বা অন্য কোন উপায়ে নিজেদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য নিজেরাই উপার্জন করার চেষ্টা করেন। এভাবে অত্যাৱশ্যক পাথেয় নিয়ে তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদগণ বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। [১] যারা সিংগাপুর, হংকং, চীন, জাপান, হাঙ্গেরী, পোলান্ড, ইতালি, দক্ষিণ আমেরিকা, আলবেনিয়া এবং যুগোস্লাভিয়াতে নতুন মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেকে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কিছু মিশন সুদৃঢ় করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। [২]

[১] নোট: এই মুজাহিদদেরকে যৎসামান্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। মসজিদ মোবারকে পড়ানো হতো (মৌলভী মুহাম্মদ আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী) ১৯৩৫ সালে

মুফতি ফয়লুর রহমান সাহেব চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াতেন। পরবর্তীতে খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯৩৫ সালের ২৬ মে দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন, তাদেরকে কুরআন এবং ধর্মীয় বিষয়ে পাঠদানের জন্য জলিল সাহেবকে নিয়োগ দেওয়া হোক।

[২] নোট: মাসিক ‘তাহরীকে জাদীদ’, আগস্ট ১৯৬৫, পৃ. ০৭।

এই সকল যুবকদের মনোনীত করার সময় যে বিষয়গুলো দৃষ্টিতে রাখা হয় সে-সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, “তাহরীকে জাদীদের প্রথম মোবাল্লোগদের মনোনীত করার সময় কেবল দেখা হতো, কার মাঝে সাহসের সাথে কাজ করার বৈশিষ্ট্য আছে। যোগ্যতার দিকে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় নি। সে-সময় এমন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, যে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করার সাহস রাখে। অতএব এমন লোকদেরকে মনোনীত করে আমরা পাঠিয়েছিলাম আর আমাদের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়েছে। তাদের মাঝে অনেকে ধর্মীয় জ্ঞানে এবং আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিল না বরং অনেকের তাকওয়ার মানও খুব বেশি উচ্চ মার্গের ছিল না। কিন্তু সে-সময় আমাদের প্রয়োজন ছিল কেবল বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং শত্রুকে এই বার্তা দেওয়া যে, আমাদের কাছে এমনসব যুবক আছে যারা নিজেদের আরাম-আয়েশ, নিজেদের দেশ, প্রিয় আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী-সন্তান মোটকথা কোন কিছুই প্রতি ক্ষেপ না করে বেরিয়ে পড়তে প্রস্তুত। ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকলেও ধর্মের সেবা করবে। যে জাতির মাঝে এমন যুবকশ্রেণী আছে, তাদেরকে ধ্বংস করা অসম্ভব। অতএব আমরা এ কাজ করে দেখিয়েছি। কতক যুবক নামমাত্র পাথেয় নিয়ে আবার অনেকে রিজ্জহন্তে দেশের বাইরে চলে গেছে। আর এভাবে একটি মিশনে ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে আমরা বারোটি মিশনের ব্যয় নির্বাহ করেছি।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৮, পৃ. ৭৬)

তিনি (রা.) আরও বলেন; “প্রাণ উৎসর্গকারী মোবাল্লোগদের একটি দল বিভিন্ন দেশে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তারা এমন এক দল ছিল যাদেরকে বিশেষভাবে তা’লীম ও তরবিয়ত করার সুযোগ হয় নি। যাহোক, তাদের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের বিষয়ে আমরা খুব ভাল অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সেই দলের সদস্যদের অনেকের মাঝে অনেক দুর্বলতাও দেখা গেছে কেননা তাদের অধিকাংশ ধর্মীয় জ্ঞানে পূর্ণরূপে সমৃদ্ধ ছিল না। আবার কেউ ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ থাকলেও জাগতিক পড়াশুনায় দুর্বল ছিল। যাহোক, এটি আমাদের

জামা’তের সদস্যদের কুরবানীর একটি ঝলক ছিল এবং আমাদের জামা’তের যুবকদের মাঝে আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় এ বৈশিষ্ট্য আছে যে, যখনই খোদা তা’লার আহ্বান তাদের কানে পৌঁছেছে, তখনই তারা সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে জগতের সামনে আমাদের জামা’তের যুবকেরা নিজেদের নিষ্ঠার এক সুমহান দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৯, পৃ. ০৩-০৪)

তাহরীকে জাদীদের দুই মুজাহিদের ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯৩৯ সালে মজলিসে শূরার বক্তৃতায় বলেন, সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যা থেকে অনুমেয়, আমাদের জামা’তের যুবকেরা নিজেদের নিষ্ঠার এক ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে আর তা হল, ঐ পঁচিশ-ত্রিশজন জীবন উৎসর্গকারী যুবকের মধ্য থেকে এক যুবক অতি সম্প্রতি প্রায় পনের-বিশ দিন বা বড়জোর এক মাস পূর্বে কেবল আহমদীয়াতের তবলীগের কারণে নিজ এলাকায় শাহাদত বরণ করেছেন। সেই যুবকের নাম ছিল ওলীদাদ খান। তিনি নিজ জীবন ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তবলীগের উদ্দেশ্যে আমরা তাকে আফগানিস্তানে পাঠিয়েছিলাম। তিনি কিছুটা চিকিৎসাবিদ্যাও জানতেন আর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিছু ঔষধ নিজের কাছে রাখতেন। কিছুদিন পর্যন্ত আমরা তাকে কিছুটা ভাতাও দিতে থাকি। এক সময় আমরা তাকে ভাতা দিতে অপারগ ছিলাম। তারও ইচ্ছা ছিল আর আমিও তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, ঐ এলাকায় ডাক্তারি শুরু করুন এবং মানুষ যখন ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে যাবে তখন তাদের মাঝে আহমদীয়াতের তবলীগ করবেন। অতএব আল্লাহ্ তা’লাও তাকে এ সুযোগ দেন, ফলে তিনি সেই এলাকায় মানুষকে তবলীগ করা শুরু করেন। প্রকাশ্যে তবলীগ করতে আমরা তাকে নিষেধ করেছিলাম কেননা সেখানে প্রকাশ্যে তবলীগ করা আইনত দণ্ডনীয় ছিল। তিনি গোপনে তবলীগ করতেন এবং মানুষকে উপদেশ দিয়ে বলতেন— যখনই পাঞ্জাবে যাবে, তখন কাদিয়ান ঘুরে এসো। মানুষ যখন ধীরে ধীরে তার আহমদীয়াতের বিষয়টি বুঝতে পারল তখন তারা পরিবারের সদস্যদের চাপ দেওয়া শুরু করল এবং বলল, এই ফিতনা দূরীকরণে তোমাদের কি কোন চিন্তা নেই! তোমাদের

ঘরে কুফর সৃষ্টি হয়েছে অথচ তোমরা তার বিষয়ে উদাসীন! অতএব তার পরিবারকে এতটাই উত্তেজিত করা হয় যে, তারা তাকে হত্যা করতে মনস্থ করে। মৌলভী ওলীদাদ খান সাহেব কিছুদিন পূর্বে ঔষধ ক্রয় করার জন্য হিন্দুস্থানে আসেন। ঔষধ ক্রয় করে যখন আফগানিস্তানে নিজ এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন তখন তার চাচাতো ভাই এবং শালা তার ওপর উপর্যুপরি তিন চার রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে তাকে শহীদ করে দেয়।

এমনইভাবে আরেক যুবক এই তাহরীকের অধীনে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু বলা হয়, স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। তবে এমনভাবে মারা গেছে, যে-মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু বলে পরিগণিত হয়। স্বল্পকাল পূর্বে আমি তার যে ঘটনা শুনেছি, তা দ্বারা অনুমেয়, সত্যিই তার মৃত্যু কোন স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বরং শাহাদাতের মৃত্যু ছিল। সেই যুবকও এমন নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছে যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

প্রথমে আমি যখন ১৯৩৪ সালে এই তাহরীক করি এবং ঘোষণা করি যে, যুবকদের বিভিন্ন দেশে বেরিয়ে পড়া উচিত, তখন এই যুবক সম্ভবত আন্তঃধর্ম বিষয়ে অধ্যয়নরত ছিল এবং তার নাম ছিল আদালত খান। সে ছিল খোশাব জেলার শাহ-পুরের বাসিন্দা। আমার এই তাহরীকে সে কাউকে কোন সংবাদ না দিয়ে চলে যায়। কাদিয়ানের লোকজন ধারণা করে যে, যেভাবে ছাত্ররা কখনও কখনও পড়াশোনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কোথাও চলে যায়, এভাবে সে-ও চলে গেছে। তবে সত্যিকার অর্থে সে আমার এই তাহরীক শুনে বিদেশে চলে যায়, কিন্তু সে এ বিষয়ে কাউকে জানায় নি। আমাদের এখানে যেহেতু প্রায়শ সাহেববাদী আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদ (রা.) এবং অন্যান্য শহীদদের কথা আলোচনা হয়। এজন্য তারও মনে হয়- আমিও আফগানিস্তান যাব এবং মানুষের মাঝে তবলীগ করব। তার এ ধারণাও ছিল না যে, অন্য দেশে যেতে হলে পাসপোর্টের প্রয়োজন হয় এবং পাসপোর্ট কীভাবে বানাতে হয়- তা-ও সে জানতো না। সে বিনা পাসপোর্টে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। [আল-ফযলে ১৯৩৫ সালের ০৩ ডিসেম্বর ০৮ থেকে ০৯ পৃষ্ঠাব্যাপি হুযূর (রা.) এই ঘটনার বর্ণনা করেন] যখন সে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে, তখন তার কাছে পাসপোর্ট না থাকায় প্রশাসন তাকে গ্রেফতার করে এবং জিজ্ঞেস করে- পাসপোর্ট কোথায়? সে বলে, আমার কাছে তো কোন পাসপোর্ট নেই। একথা শুনে তারা তাকে বন্দি করে রাখে। কিন্তু বন্দিশালায়ও সে বন্দিদেরকে

তবলীগ করা শুরু করে। সম্ভবত কয়েক মাস সে সেখানে ছিল। অফিসাররা রিপোর্ট করে যে, তাকে মুক্তি দেওয়া উচিত, অন্যথায় সে বন্দিদেরকে আহমদী বানিয়ে ফেলবে। পরিশেষে তারা তাকে হিন্দুস্থানের বর্ডারে এনে ছেড়ে দেয়। যখন সে ফিরে আসে তখন আমাকে জানায়, আমি আপনার তাহরীক অনুযায়ী আফগানিস্তানে যাই এবং সেখানে আমার সাথে এই ঘটনা ঘটেছে। আপনিই বলুন! আমি এখন কী করব? আমি তাকে বলি যে, তুমি চীনে চলে যাও। এরপর সে চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং যাত্রাকালে হুশিয়ারপুর জেলার বাসিন্দা মুহাম্মদ রফিক নামের আরেক যুবককে সে তার সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। ফলে মুহাম্মদ রফিক তার সাথে যায়। মুহাম্মদ রফিকের যেহেতু আত্মীয়স্বজনও ছিল এবং তার কিছু মাধ্যমও ছিল যার ফলে সে চেষ্টা-সাধনা করে পাসপোর্ট বানিয়ে ফেলে। তারা দু’জন কাশ্মীরে একসাথে পৌঁছায় কিন্তু সেখান থেকে কেবল মুহাম্মদ রফিক চীনে প্রবেশ করে, তবে আদালত খানের পাসপোর্ট না থাকায় তাকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে গ্রামবাসীর বিরোধিতা এবং পথ-প্রদর্শকের অভাবে সে কাশ্মীরেই অবস্থান করতে থাকে আর এই অপেক্ষায় থাকে— ‘যদি আমি সুযোগ পাই তাহলে লুকিয়ে চীনে ঢুকে পড়ব’। যেহেতু শীতকাল ছিল এবং তার কাছে পর্যাপ্ত কাপড় ছিল না তাই সে কাশ্মীরে নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয় এবং দু-দিন পরই পরলোক গমন করে।

সম্প্রতি কাশ্মীর থেকে কিছু বন্ধু এসেছিলেন। তারা আদালত খান সম্পর্কে আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনিয়েছেন যা শুনলে ঈর্ষা হয়। আহমদীয়াতের সত্যতার বিষয়ে তার হৃদয়ে অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা ছিল। সে এমন একটি গ্রামে অসুস্থ হয়ে পড়ে যেখানে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। যখন তার অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে তখন (সেখানের আহমদীরা বলেন,) সে আমাদের বলতে লাগল— ‘কোন অ-আহমদীকে প্রস্তুত করুন যে কিনা আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে আমার সাথে মোবাহালা করবে। যদি এমন কোন অ-আহমদী পাওয়া যায় তাহলে আমি বেঁচে যাব এবং তার সাথে তবলীগও হবে, অন্যথায় আমার বাঁচার কোন উপায় নেই।’ কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও এমন বিশ্বাস এবং আস্থা অনেক কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। নিরানব্বই ভাগ রোগীই এই রোগে মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেকে তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়।... এমন ভয়ানক অবস্থায় যাকে কিনা

নিরানব্বই ভাগ মৃত্যুই বলা চলে, ‘সে তার চিকিৎসা এটিই মনে করেছিল যে, কোন অ-আহমদীর সাথে মোবাহালা হোক এবং এতে নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে আরোগ্য দান করবেন, ফলে এই রোগে আমার মৃত্যু হবে না।’

মোটকথা এই ঘটনা থেকে তার নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একইভাবে তার দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়েছে। কেননা সে অপর এক যুবককে নিজেই আহ্বান করে যে, আমার সাথে চলো এবং সে যুবক যেতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এভাবে যদিও আদালত খানের মৃত্যু হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা তার বীজকে বিনষ্ট করেন নি বরং অপর একজন ব্যক্তি যাকে সে নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিল সে আহমদীয়াতের পতাকা হাতে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং পূর্বের শহর কাশগর পৌঁছে যায় আর সেখানে তবলীগ করা শুরু করে। এর ফলে সেখানের এক বন্ধুকে আল্লাহ্ তা’লা আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন। তার নাম হল হাজী জুন্দুল্লাহ্ সাহেব। তার তবলীগের ফলে জুন্দুল্লাহ্ সাহেব কাদিয়ানে আসেন এবং যাচাই-বাছাই করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর হাজী জুন্দুল্লাহ্ সাহেবের মা ও তার সহোদরও আহমদী হন। বর্তমানে তিনি স্থায়ীভাবে কাদিয়ানে বসবাস করছেন। অতএব আদালত খানের কুরবানী বৃথা যায় নি বরং তা সেই এলাকায় আহমদীয়াত বিস্তারের কারণ হয়েছে।

এটি এমন এক এলাকা যেখানে আহমদীয়াত প্রচারের কথা কল্পনাই করা যেত না। এমন ভয়ানক ও দুর্গম পথ রয়েছে যা অতিক্রম করা অনেক সাহসের ব্যাপার। হাজী জুন্দুল্লাহ্ সাহেবের মা বলেন যে, তিনি পশ্চিমধ্যে এক স্থানে তিনদিন পর্যন্ত বরফের ওপর হাঁটু গেঁড়ে চলতে থেকেছেন। এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করে আমাদের জামা’তের একজন যুবকের সেই এলাকায় পৌঁছানো এবং লোকদের তবলীগ করা অনেক বড় আনন্দের বিষয়।

তাহরীকে জাদীদের অধীনে আল্লাহ্ তা’লা আদালত খানকে এ সৌভাগ্য দেন যে, সে প্রথমে আফগানিস্তান যায়। অতঃপর সে কিছুদিন আফগানিস্তানে থাকে এবং যখন ফিরে আসে তখন আমার তাহরীকে সে চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আর নিজের সাথে আরেকজনকে নিয়ে নেয়। পশ্চিমধ্যে আল্লাহ্ তা’লা আদালত খানকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। কিন্তু তার অন্য সাথীকে সৌভাগ্য দিয়েছেন, ফলে সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠা করে।

এই দুটি ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে, “যদিও সে নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে নি কিন্তু তার এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা আল্লাহ তা’লার কাছে গৃহীত হয়েছে। অতএব এই দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজনকে আল্লাহ তা’লা সরাসরি শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন এবং অপরজনের মৃত্যু এমনভাবে হয়েছে যা শাহাদাতেরই নামান্তর।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৯, পৃ. ০৪-০৮)

তাহরীকে জাদীদের প্রথম তিন বছরের বর্ণাঢ্য সাফল্যের এক ঝলক

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, “তাহরীকে জাদীদের প্রথম যুগে বন্ধুরা যে অসাধারণ কাজ করেছেন তা আমরা গৌরবের সাথে বলতে পারি। ঐতিহাসিকরা এসে এ বিষয়গুলো বর্ণনা করবেন যে, জামা’ত এমন অভূতপূর্ব কুরবানী করেছে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।” হযরত আমীরুল মু’মিনীন উক্ত বিষয়ের সারাংশ নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ দ্বারা বর্ণনা করেন:

“১৯৩৪ সালের শেষের দিকে জামা’তের মাঝে যে জাগরণ সৃষ্টি হয় তার ফলস্বরূপ জামা’ত এমন অসাধারণ কুরবানী করেছে যার দৃষ্টান্ত উন্নত জাতির মাঝে খুঁজে পাওয়া ভার।... তাহরীকে জাদীদের প্রাথমিক যুগে জামা’তের সদস্যরা অসাধ্য সাধন করেছে আর আমরা তা গর্বের সাথে বলতে পারি। আগামীতে ঐতিহাসিকরা এ বিষয়গুলো উল্লেখ করবে যে, জামা’ত এমন অভূতপূর্ব কুরবানী করেছে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না আর এর ফলাফলও সবার সামনে আছে। যে-সব সরকারি কর্মকর্তা আমাদেরকে ধ্বংস করার প্রয়াস চালায়, তারা ধারাবাহিকভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়েছে... এবং আল্লাহ তা’লা আহরারীদের এমনভাবে লাঞ্চিত করেছেন যে, তারা এখন মুসলমানদের স্টেজে উঠে দাঁড়াতে সাহস পায় না...। অতএব আল্লাহ তা’লা আমাদের সমস্ত শত্রুদেরকে এমনভাবে পরাজিত করেছেন যা সরকার নিজেই স্বীকার করেছে...।

এছাড়া জামা’তের মাঝে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা সত্যিই চমৎকার। আমাদের জামা’তের সদস্য সংখ্যা এখন লক্ষ লক্ষ, যার মাঝে ধনী এবং দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত। তাদের মাঝে কতক এমন আছেন

যাদের সাত-আট রকমের খাবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল এবং যাদের খাবার টেবিলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শুধু খাবারই থাকত...। কিন্তু তাহরীকে জাদীদের অধীনে সবাই একটি মাত্র খাবার খাওয়া শুরু করেন। শুধু আহমদীরা নয় বরং অসংখ্য অ-আহমদীও এই রীতি অবলম্বন করেন। আমার এক ভাই শিমলা গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সেখানের অনেক ধনী লোকের স্ত্রীরা তাহরীকে জাদীদের আহ্বানসমূহের লিখিত কপি চেয়ে নেন এবং বলেন, খাবারের বিষয়ে খলীফার দিক-নির্দেশনা অতি উত্তম, আমরা আমাদের গৃহে এর প্রচলন করব। এক যুবক একটি মেসে কিছু অ-আহমদীদের সাথে থাকতো। সে জানায়, তাহরীকে জাদীদের ঘোষণার পর সে যখন একের অধিক খাবার খাওয়া পরিত্যাগ করে এবং অন্য বন্ধুরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে এর কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করে তখন তারা বলে, এটি তো অনেক উত্তম তাহরীক, আমরাও আগামীতে এই তাহরীকের নীতিগুলো মেনে চলব।

অতঃপর আমি সিনেমা দেখা নিষেধ করেছিলাম। এই বিষয়টি আমাদের গ্রামের ভাইয়েরা বুঝতে পারবে না যে, শহরের বাসিন্দাদের জন্য এই আদেশ পালন করা কতটা কঠিন ছিল। এটি শুধু শহরবাসীরাই বুঝতে পারে। শহরবাসীদের অনেকের জন্য সিনেমা দেখা পরিত্যাগ করা এতই কঠিন ছিল যেন তারা মৃত্যুকে বরণ করেছে। যারা সিনেমা দেখে অভ্যস্ত তারা এটিকে জীবনের একটি অংশ মনে করে। কিন্তু আমি যখন বলেছি, সিনেমা দেখা ছেড়ে দিন তখন নিরানব্বই শতাংশ মানুষ সিনেমা দেখা ছেড়ে দেয় এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে এই আদেশ পালন করে আর নারী-পুরুষ সকলে এই আদেশের ওপর এমনভাবে আমল করেছে যা জগদ্বাসীর জন্য ঈর্ষার কারণ হয়েছে। আমি মনে করি, এ আদেশ পালনের ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা বেঁচে গেছে...। এছাড়া এর মাধ্যমে যে সময় সাশ্রয় হয়েছে তার মূল্য চিন্তা করে দেখুন...। এই তাহরীকের ওপর আমল করা সহজ ছিল না। কিন্তু জামা'ত এই তাহরীক শোনা মাত্র তদনুযায়ী আমল করেছে এবং এর কল্যাণও লাভ করেছে। এছাড়া মহিলারা পোশাকের পাগল- এ বিষয়টি কারও অজানা নয়। কিন্তু সহস্র সহস্র মহিলা সততার সাথে অনাড়ম্বর পোশাক পরিধানের তাহরীকে সাড়া দিয়েছে। ব্যক্তিগত কুরবানী এবং জাতীয় বিজয়ের এমন দৃষ্টান্ত জগতে খুঁজে পাওয়া ভার। এ কোন সাধারণ কুরবানী নয় বরং জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের কুরবানী আর বিচক্ষণদের দৃষ্টিতে এর মাঝে সুদীর্ঘ বিজয় লক্ষণীয়।

এরপর তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে বহু নতুন দেশে আহমদীয়াত পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়া কমপক্ষে দশ-পনেরোটি দেশ এমন আছে যার বিভিন্ন এলাকায় পূর্বে আহমদীয়াত ছিল কিন্তু তাহরীকে জাদীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে আহমদীয়াতের প্রভাব পূর্বের তুলনায় আরও অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়াও এর ফলে জগৎ অনুভব করেছে যে, আহমদীয়া জামা’ত মুসলিম সেনাবাহিনীর কেবল একটি বাহু নয় বরং তারা এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ আর আল্লাহ তা’লার কৃপায় তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম। পূর্বে আমাদের এই যোগ্যতা সম্পর্কে জগদ্বাসী অবগত ছিল না। তাহরীকে জাদীদের ফলে তারা এ বিষয়ে অবগত হয়েছে। অতএব আল্লাহ তা’লার কৃপায় আমরা যতটা বিজয় অর্জন করেছি, আমাদের লক্ষ্য কেবল এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হতে চাই আর এতে সফলতার জন্য আরও অনেক কুরবানী আবশ্যিক।”

(আল-ফযল, ১৫ নভেম্বর ১৯৩৮)

প্রারম্ভিক কিছু তিজ্ঞ অভিজ্ঞতা

উত্তম ফলাফলের পাশাপাশি কিছু তিজ্ঞ অভিজ্ঞতাও লাভ হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, “আমাদের কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিছু নতুন মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে— এগুলো নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। আমি তাহরীক করেছিলাম যে, যুবকেরা তাদের জীবন উৎসর্গ করবে এবং বাইরে বেরিয়ে পড়বে— এটিও একটি নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। বন্ধুগণ যেন নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করেন— এটিও একটি নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। আর শিল্প প্রতিষ্ঠান খোলাও নতুন অভিজ্ঞতা ছিল এবং আল্লাহ তা’লার অনুগ্রহে এই সমস্ত বিষয় থেকে আমরা কমবেশি সফলতা পেয়েছি। শতসহস্র যুবক তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে এবং অসংখ্য যুবক বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই তিন বছর ধরে বোম্বে এবং করাচিতে অবস্থান করেছে। তারা বাইরের কোন দেশে যাওয়ার অভিপ্রায়ে ঘর থেকে বের হয়েছিল। কিন্তু এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নি তাই তারা চেষ্টারত আছে। তাদের পিতামাতা তাদেরকে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ করে চিঠি লিখেছে, আমার মাধ্যমেও সুপারিশ করিয়েছে। কিন্তু তাদের একটাই দাবি— একবার যে নিয়্যত করে ঘর থেকে বের হয়েছি, এখন তা পূর্ণ করার অনুমতি দিন। তাদের মধ্যে কিছু এমন কম বয়সের যুবক ছিল যাদের দাড়ি-মোচ পর্যন্ত গজায় নি কিন্তু এ পথে তারা ঝুড়ি পর্যন্ত মাথায় নিয়েছে।

আবার কিছু যুবক বাইরের দেশে পৌঁছে গেছে আর আমরা সেখানের কিছু নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আপনাদের স্মরণ থাকার কথা, আমি বলেছিলাম, আমাদেরকে নিজেদের জন্য মাদানী স্বভাবের লোক খুঁজে বের করতে হবে। অতএব এরই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে কমপক্ষে আমাদের পনেরোটি মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেমন: আমেরিকা, ইতালি, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, (এই মিশন আলবেনিয়াদের জন্য কিন্তু আলবেনিয়া সরকার আমাদের মোবাল্লেগকে বের করে দিয়েছিল), ফিলিস্তিন, জাভা, স্ট্রেট সেটেলমেন্ট, জাপান, চীন, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে।

এর মধ্যে কিছু মোবাল্লেগ এমন আছেন যারা আমাদের খরচে গেছেন। অনেকে নিজ খরচে গেছেন। অনেকেই ব্যবসা করে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছেন এবং তারা ভীষণ আনন্দিত। অনেকেই এখন সমস্যার মাঝে আছেন এবং বিভিন্ন দেশে আমাদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে জাভা, সামাটার এবং স্ট্রেট সেটেলমেন্ট ছাড়া বাকি দেশসমূহ থেকে আমরা সফলতা পাই নি। চীন এবং জাপানে আমরা এখনও একেবারেই সফল হতে পারি নি বরং সম্প্রতি আমি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, জাপান সরকার সুফি আব্দুল কাদের সাহেবকে বন্দি করেছে। যাহোক আমি তার জন্য দোয়ার তাহরীক করছি। তার সাথে কেন এমন আচরণ করা হয়েছে— এ বিষয়ে আমরা খোঁজ-খবর নেব। কিন্তু চতুর্থ বছরের শুরুতে এই ঘটনা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এক প্রকার সাবধানবাণী অর্থাৎ সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের বুঝা উচিত, এ ধরনের বিপদাবলি তবলীগের পথে অন্তরায় হতে পারে।

সুফি আব্দুল কাদের সাহেব তাহরীকে জাদীদের ব্যবসায়ী বিভাগের প্রতিনিধি ছিলেন। যদিও তিনি নিয়মিত মোবাল্লেগ ছিলেন না এবং ভাষা রপ্ত করছিলেন আর এখন তার বিরুদ্ধে দেশে ফিরে যাওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে। সেখানে অন্য মোবাল্লেগ অর্থাৎ মৌলভী আবুল আতা সাহেবের ভাই মৌলভী আব্দুল গফুর সাহেব পৌঁছে গেছেন। অতএব ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাওয়া ব্যক্তির যদি এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে যারা কেবল তবলীগের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, তাদেরকে তো আরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যতদূর জানা গেছে, তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যে, তিনি নাকি জাপান সরকারের বিরোধী। এটিও আমাদের জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা। ব্রিটিশ

সরকার আমাদেরকে বলে- তোমরা ব্রিটিশ বিরোধী এবং অন্য দেশের সরকার বলে- তোমরা ব্রিটিশদের হিতাকাজক্ষী।

অতএব আমরা যে-সব নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছি তা থেকে আমরা আগামীতে কী কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে চলেছি তা বুঝা যাচ্ছে। অতঃপর আরও একটি নতুন অভিজ্ঞতা হল, আমাদের মোবাল্লেগ মুহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেব নাসের সাহেবকে আমেরিকার ভিসা দেয় নি কারণ তিনি একাধিক বিবাহ বৈধ মনে করেন। এই মোবাল্লেগদের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন সমস্যা সম্বন্ধে জানতে পারছি। এছাড়া আরও কিছু বিষয় আছে যার ফলে জামা’তের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে আর তা হল, সহজসরল জীবনযাপন, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এবং নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টির আদেশ ইত্যাদি। এর মাধ্যমে জাতির মাঝে নব-জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।”

(খুতবা জুমু’আ, ১৫ নভেম্বর ১৯৩৭)

তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় সাত বছর

২৬ নভেম্বর ১৯৩৭ সাল থেকে তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় সাত বছর শুরু হয় যা ০১ এপ্রিল ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত জারি থাকে। এই ১০ বছরে [যা ১৯৩৪ থেকে শুরু হয় এবং দফতর আউয়াল (তথা প্রথম বিভাগ বা পর্যায় অথবা স্তর) নামে নামকরণ করা হয় যা অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে ভরপুর ছিল। উদাহরণস্বরূপ তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ঘাটতি, আরও কয়েকটি নতুন অধ্যাদেশ জারি, স্থায়ী ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক, ওয়াকফীনদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, স্থায়ীভাবে সিনেমা দেখায় নিষেধাজ্ঞা, দেহাতী মোবাল্লেগদের গুরুত্বপূর্ণ স্কিম, বিশ্বের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ভাষায় ইসলামী প্রবন্ধ প্রস্তুত, ওয়াকফে জিন্দেগীর সুদীর্ঘ তাহরীক, তাহরীকে ওয়াকফে জায়েদাদ ইত্যাদি।

দিব্যদর্শনের মাধ্যমে ১০ বছরের জন্য ওয়াকফে জাদীদের সময়কাল বৃদ্ধি

তাহরীকে জাদীদের তিন বছরকাল শেষ হলে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ঐশী দিব্যদর্শনের অধীনে এটিকে দশবছরকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন। এ বিষয়ে হযূরের বক্তব্য হল:

“বেশ কয়েকজন বন্ধুর পক্ষ থেকে আমি পত্র পেয়েছি যারা বলেছেন, আমি যেন তাহরীকে জাদীদের সময়কাল ০৩ বছরে সমাপ্ত না করে তা দশ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিই। নতুন বছরের শুরুতে আমিও ঐ একই ঘোষণা দিতে চেয়েছিলাম। তাদের প্রস্তাব ও আমার মনের কথা হুবহু মিলে যাওয়াতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হল, এটি ছিল ঐশী দিব্যদর্শন।”

(আল-ফযল, ০৪ ডিসেম্বর ১৯৩৭ সাল, পৃ. ১৩)

তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ঘাটতি

১৯৩৭ সালের ২৬ নভেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাহরীকে জাদীদের পরবর্তী সাত বছরের ঘোষণা করেন এবং এই যুগের জন্য মালী কুরবানীর নতুন পরিকল্পনার বিষয়ে বলেন, “এ বছরের জন্য আমার তাহরীক হল, যে-ব্যক্তি বিগত তিন বছরের প্রথম বছরে যে পরিমাণ চাঁদা দিয়েছিলেন, তিনি এ বছর সেই সমপরিমাণ চাঁদা দেবেন। এরপর আমার ক্ষিম হল, প্রত্যেক বছর এই চাঁদার মধ্য থেকে দশ শতাংশ কম করতে থাকবেন। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি এ বছর একশত রূপি চাঁদা দেবেন, তার কাছ থেকে আগামী বছর নব্বই রূপি নেওয়া হবে, এর পরের বছর আশি রূপি নেওয়া হবে, এরপর তৃতীয় বছরে সত্তর রূপি, এরপর চতুর্থ বছরে ষাট রূপি, পঞ্চম বছরে পঞ্চাশ রূপি নেওয়া হবে। এরপর বাকি দু’বছর এই পঞ্চাশ শতাংশ করে চাঁদা দেবেন।”

(আল-ফযল, ৪ ডিসেম্বর ১৯৩৭ পৃ. ১৩)

সহজসরল জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম

সে-যুগে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সহজসরল জীবনযাপন সংক্রান্ত আরও কিছু ব্যতিক্রমী বিষয়ের উল্লেখ করেন। যেমন, হুযূর (রা.) ঈদের ন্যায় জুম্মাতেও দু’ধরনের খাবার খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এমনইভাবে যদি কোন আহমদী বন্ধু অতিথি হয় তবে খাবার টেবিলে মেযবানকে কেবল এক তরকারি খেতে হবে। তবে অতিথি যদি অ-আহমদী হয়, সেক্ষেত্রে অ-আহমদী অতিথির জন্য একাধিক খাবার রান্না করা হলে মেযবানও একাধিক খাবার খেতে পারবেন। আহমদী আত্মীয়স্বজন কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া একত্রিত

হলে সাধারণ দিনগুলোতে (জুমুআ ছাড়া) একাধিক খাবার রান্না করা হলে মেযবান এক খাবারের বেশি খাবে না। এর পূর্বে বিগত বছর হুযূর (রা.) একটি ব্যতিক্রম অনুমতি দিয়েছিলেন আর তা হল, সরকারি দাওয়াতে একাধিক খাবার খাওয়া বা খাওয়ানোর রীতি থেকে থাকলে এক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(আল-ফযল, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, পৃ. ০২-০৩)

স্থায়ী ওয়াকফের তাহরীক

যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুযূর (রা.) প্রথমদিকে জামা’তের সদস্যদেরকে কেবল তিন বছরের জন্য ওয়াকফ করার তাহরীক করেছিলেন। কিন্তু কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৩৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর স্থায়ী ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক করেন এবং স্পষ্ট করে বলেন যে—

“ভবিষ্যতে যারা নিজেদেরকে ওয়াকফ করবেন তারা নিজেদেরকে উৎসর্গিত মনে করবেন আর যে কাজেই তাদেরকে নিয়োজিত করা হবে সেই কাজ তারা পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে করবেন। জ্ঞানের বিষয়টি আমরা দেখব কিন্তু পরিশ্রম, আনুগত্য এবং নিষ্ঠার নিয়ত আপনাদের পক্ষ থেকে হতে হবে। দ্বিতীয়ত ওয়াকফের অর্থ এমনটি মনে করবেন না যে, ‘কেউ কাজের যোগ্য হোক বা না হোক, তাকে আমরা বাদ দেব না অথবা শাস্তি দেব না’। কেবল তারাই নিজেদেরকে উপস্থাপন করুন যারা শাস্তি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত। যে জাতির সদস্যদের মাঝে শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা নেই তারা সব সময় ধ্বংস হয়ে যায়। সাহাবাদেরকে দেখুন, তারা অনেক সময় প্রয়োজনের তুলনায় অধিক শাস্তি সহ্য করতেন এবং নিজ থেকেই করতেন।... অতএব ওয়াকফকারীদের জন্য উক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এটিও আবশ্যিক যে, তারা শাস্তি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। পরে কেউ যেন এ কথা না বলে যে, তখন তো আমরা বাইরে চাকুরি করতে পারতাম। অতএব তারাই যেন এক্ষেত্রে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে যারা এই নিয়ত করবে যে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব কিন্তু অকর্মণ্য সাব্যস্ত হলে সানন্দে শাস্তি মাথা পেতে নেব।

আমি আশা করি, আমাদের যুবকগণ উক্ত শর্তসমূহের অধীনে দ্রুতই নিজেদের নাম উপস্থাপন করবে যেন তারা আমার প্রস্তাবিত স্কিমের অধীনে কাজ করতে পারে। আমরা স্বল্পসংখ্যক লোকই নেব কিন্তু শতসহস্রের মাঝে

যে কয়েকজনকে বেছে নেওয়া হবে তারা মূলত পাঁচ-সাতজনের মাঝ থেকে বাছাই করা লোকদের তুলনায় উত্তম হবে। বিগতবার প্রায় ২০০জন যুবক নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছিলেন আর আমি আশা রাখি, এখন তার চেয়ে অধিক যুবক নিজেদেরকে উপস্থাপন করবেন। এছাড়া বিগতবার যারা নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছিল, তারা এবারও করতে পারেলেন অথবা যারা কাজে নিয়োজিত আছেন, তারা চাইলে নিজেদের নাম উপস্থাপন করতে পারেন কেননা তাদের তিন বছর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাদের মাঝে এমনও লোক আছেন যারা মনে করেন, তিন বছর আবার কী? আমরা একবার যেহেতু নিজেদেরকে উপস্থাপন করে দিয়েছি সেহেতু আর ফিরে যাব না— তাদেরকেও যথারীতি নিজেদের নাম উপস্থাপন করতে হবে কেননা আমাদের প্রথমবারের আহ্বান ছিল তিন বছরের জন্য। যিনি-ই নিজেকে উপস্থাপন করবেন তিনি যেন দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হন।”

(আল-ফযল, ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৭, পৃ. ৭)

স্থায়ী ওয়াকফীনদের প্রশিক্ষণ

উল্লিখিত তাহরীকের ফলে তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় যুগে কতিপয় নিষ্ঠাবান যুবক নিজেদের জীবনকে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করে এবং হুযূরের বিশেষ সুদৃষ্টি, তা’লীম-তরবিয়ত এবং দোয়ার কল্যাণে অত্যন্ত স্বল্প জীবনোপকরণ লাভকারী, স্থায়ী আত্মত্যাগী, নিষ্ঠাবান এবং জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদদের এমন একটি দল তৈরি হয়েছে যারা পরবর্তীতে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের মহান ও অবিস্মরণীয় সেবা প্রদান করেছেন এবং কেবলমাত্র বহির্বিশ্বে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন নি বরং কেন্দ্রে নতুন মোবাল্লেগ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন, যা হুযূরের পবিত্রকরণ শক্তি এবং মহৎ কর্মযজ্ঞের প্রমাণ বহন করে। আর এর যতই প্রশংসা করা হোক না কেন তা অপ্রতুলই হবে। এই ওয়াকফীনরা মিতব্যয়িতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেবার বাস্তব প্রমাণ দেখিয়েছেন। হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এ-সকল প্রাণ উৎসর্গকারী ওয়াকফীনদের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

“আমি তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় যুগে দীর্ঘস্থায়ী কাজের সূচনা করার জন্য আর্থিক কুরবানীর স্থায়ী তাহরীক ছাড়াও ওয়াকফীনদের স্থায়ী একটি দল

তৈরি করছি। প্রথম যুগে আমি বলেছিলাম যে, যুবকগণ তিন বছরের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করবে, কিন্তু দ্বিতীয় যুগের ওয়াকফ বা জীবন উৎসর্গ হবে আজীবনের জন্য। এখন কোন ওয়াকফীনের স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার থাকবে না। তবে হ্যাঁ, তাদেরকে যদি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে অযোগ্য মনে হয় তাহলে আমরা তাদেরকে বিদায় করে দেবার অধিকার রাখি। অতএব এরা তিন বছরের জন্য ওয়াকফীন নয় বরং যেভাবে এ-যুগ স্থায়ী যুগ, একইভাবে এই ওয়াকফও স্থায়ী। আর এ-যুগের কাজের গুরুত্বকে দৃষ্টিতে রেখে আমি এই শর্তারোপ করছি যে, কেবল সেই যুবকদের নেওয়া হবে যারা হয় গ্র্যাজুয়েট অথবা মৌলভী ফায়েল পাস করেছেন। আবার যারা গ্র্যাজুয়েট নন বা মৌলভী ফায়েল পাস করেন নি, তাদেরকে নেওয়া হবে না কেননা এই সমস্ত লোকদের সাহিত্যের কাজ করতে হবে এবং এর জন্য হয় ধর্মীয় জ্ঞান আবশ্যিক অথবা জাগতিক জ্ঞান। বর্তমানে তিন-চারজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে কেননা তারা গ্র্যাজুয়েট নন এবং তারা ছিলেন বিগত যুগের অবশিষ্ট ওয়াকফীনদের অন্তর্ভুক্ত। বাকী সকলে হয় গ্র্যাজুয়েট অথবা মৌলভী ফায়েল পাস। মোটকথা এ মুহূর্তে চারজন গ্র্যাজুয়েট এবং চারজন মৌলভী ফায়েল পাশ ওয়াকফেকীন আছেন। সর্বমোট প্রায় বারোজন যুবক আছেন, যাদের মধ্যে ০৪জন গ্র্যাজুয়েট নন কিন্তু তারা সকলে আল্লাহ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে কাজ করেন এবং জামা'তকে ভীষণ ভালবাসেন...। তাদের কয়েকজনকে আমি উন্নত পড়ালেখার জন্য বহির্বিশ্বে প্রেরণ করতে চাই এবং জ্ঞান ও কাজের দিক থেকে তারা এমন যুবক হবেন যারা তবলীগ, তা'লীম এবং তরবিয়তের কাজে পৃথিবীর উত্তম যুবকদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবেন, বরং তারা তাদের থেকে আরও অগ্রগামী হবেন। তাদেরকে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় বরং আমার উদ্দেশ্য হল, তারা জাগতিক সকল জ্ঞানেও সমৃদ্ধ হবেন এবং পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান তাদের শেখানো হবে যেন তাদের মাঝে জগতের সকল কাজ করার দক্ষতা সৃষ্টি হয়। এ-সকল যুবকের বিষয়ে আমার অভিপ্রায় আমি বিগত মজলিসে শূরায় বলেছি আর তা হল, তাদেরকে ইউরোপে পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা হবে। তারা যখন সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে যাবেন তখন তাদেরকে বেতন দেওয়া হবে না বরং কেবল তাদের জীবনযাপনের জন্য ভাতা প্রদান করা হবে আর এই ভাতা তাদের জ্ঞানের যোগ্যতা অনুযায়ী নয় বরং ঘরের সদস্য সংখ্যা বিবেচনা করে ঠিক সেভাবে দেওয়া হবে, যেভাবে সাহাবীদের যুগে দেওয়া

হতো। অর্থাৎ যার স্ত্রী-সন্তান আছে তাকে বেশি দেওয়া হবে এবং যার স্ত্রী-সন্তান নেই তাকে কম দেওয়া হবে বা কোন যুবকের বিবাহের সময় তাকে কিছুটা অর্থসাহায্য প্রদান করা হবে।”

(আল-ফযল, ২৪ নভেম্বর ১৯৩৮, পৃ. ০৮)

তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদদের ঐ সময় সামান্য কিছু ভাতা প্রদান করা হতো। হুযূরের নিজের ভাষায় তা উল্লেখ করা হচ্ছে। হুযূর (রা.) বলেন:

“আমি চাই, এ-যুগে একশত এমন ওয়াকেফে জিন্দেগী প্রস্তুত হবেন যারা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষাতেও দক্ষতা অর্জন করবেন এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে দায়িত্বসহকারে জামা’তের সকল কাজ করবেন আর কুরবানী ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী হবেন। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষার ব্যয়ভার নির্বাহ ছাড়াও তাদেরকে কিছুটা ভাতাও প্রদান করা হবে আর তা হল, প্রত্যেককে পনেরো রুপি দেওয়া হবে। কেউ যদি গ্র্যাজুয়েটও হন, তবুও তাকে আমরা পনেরো রুপিই দিয়ে থাকি- এর অধিক নয়। আর তা এতই সামান্য যে, এটি কতক এতিম ও মিসকিনের ওষিফার প্রায় সমপরিমাণ। অথচ তারা জামা’তের সেবাও করছেন আবার জীবন উৎসর্গও করে রেখেছেন। তবে এই ওয়াকেফে জিন্দেগীদের কেউ বিবাহ করলে তাকে ২০ রুপি ভাতা প্রদান করা হয়। আবার যদি সন্তান হয় তবে প্রত্যেক সন্তানের জন্য ০৩ রুপি অতিরিক্ত প্রদান করা হয়। ০৪জন সন্তান পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। তবে যতজন সন্তানই হোক, ৩২ রুপির বেশি দেওয়া হয় না। আমি জানি, এই ভাতা নিতান্তই কম। আবার সন্তানের হিসেবে ৩২ রুপি সর্বোচ্চ ভাতা নির্ধারণ করাও ঠিক না এবং এ বিষয়ে দ্রুত ভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। বর্তমানে আমাদের আর্থিক অবস্থার নিরিখে এর অধিক ভাতা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। তারাও সানন্দে এই ভাতা গ্রহণ করছেন।”

(আল-ফযল, ২৪ নভেম্বর ১৯৩৮, পৃ. ১০)

মনোনীত ওয়াকেফীনদের জন্য দিকনির্দেশনা

মনোনীত ওয়াকেফীনদের ধারাবাহিক তা’লীম-তরবিয়তের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এবং তাহরীকে জাদীদ অফিসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় যে-সব দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয় তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. কেবল স্বাস্থ্য ভাল থাকলেই পরিশ্রম করা যায় না বরং প্রফুল্লতাও আবশ্যিক।

২. নিজেদের দায়িত্বজ্ঞান থাকা উচিত। যখন নিজে নিজে বুঝবেন যে, আমি আমার অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করতে পারছি না, সেক্ষেত্রে তাত্ক্ষণিক ইস্তফা দেওয়া উচিত।

৩. উন্নত জাতি কেবল দৈনন্দিন কাজ করেই উন্নতি করে না কেননা দৈনন্দিন কাজের ফলে কেবল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় থাকে এবং এটি নিম্নপর্যায়ের কাজ। আমাদেরকে ভবিষ্যতের কাজ নিয়ে ভাবতে হবে, শত্রুর গতিবিধি জানতে হবে। দেখতে হবে; জগৎ কীভাবে উন্নতি করেছে, আমরা কীভাবে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি!

৪. যুবকদের মাঝে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার স্পৃহা থাকতে হবে।

৫. যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফলাফলের দায়ভার গ্রহণ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারব না। ‘মানুষ কাজ করে এবং আল্লাহ ফলাফল দেন’- মানুষ এই বাক্যের ভুল ব্যাখ্যা করে। একইভাবে মানুষ তাওয়াঙ্কুলের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে।

৬. ব্যক্তিগত কুরবানীও আবশ্যিক যেন জাতি অলস হয়ে না পড়ে। পরাজিত সেনাপ্রধান নিজের মাথায় গুলি করে কেননা সে মনে করে- বিজয়ই আমার একমাত্র লক্ষ্য। শরীয়তেও পশ্চাৎপদ হবার শাস্তি বলা হয়েছে জাহান্নাম। সংখ্যাস্বল্পতা বা কোন অজুহাতের সুযোগ নেই। অতএব অসফল ব্যক্তির শাস্তি ভোগ করা উচিত। তাই শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকার নীতি নির্ধারণ করা আছে। আমরা সঠিকভাবে আমাদের দায়িত্ব অনুধাবন করি না, যার ফলে আমাদের মাথা কাজ করে না বরং পলায়নের পথ অন্বেষণ করি। প্রত্যেক ওয়াক্কেফে জিন্দেগীর ভাবতে হবে- পরিস্থিতি যতই বিরূপ হোক, বিফলতার জন্য আমিই দায়ী।

৭. কেবল বিশেষ ধরনের কুরবানী নয় বরং যে-ব্যক্তি সবধরনের কুরবানী করতে সক্ষম- সে-ই প্রকৃত বীর।

৮. সময়ের কুরবানী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এর থেকে বড় কুরবানী সেটি যাকে পৃথিবী waste of time বা সময়ের অপচয় বলে থাকে। জগৎ এটিকে পাপ মনে করে, কিন্তু আমি মনে করি, এটি যখন কুরবানীর উদ্দেশ্যে করা হয় তখন এটি উচ্চমার্গের কুরবানী। যেভাবে নামাযের জন্য অপেক্ষারত ব্যক্তিও নামাযীই হয়ে থাকে। বাহ্যত এটি সময়ের

অপচয়, কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হল, নামাযের মাহত্ব্যকে প্রকাশ করা। তাই উদ্দেশ্যের জন্য অপেক্ষা করা বড় কুরবানী। অতএব অপেক্ষার নাম ‘সময়ের অপচয়’ রাখা উচিত নয়, কেননা এটি তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধকারী এবং কোন কিছুকে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হয়।

৯. ওয়াকফের আরও একটি উদ্দেশ্য হল, মিথ্যাকে নির্মূল করা, তা যত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হোক না কেন। কোন প্রকার মিথ্যা যদি প্রমাণিত হয় তবে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেওয়া হবে। ওয়াকফ বাতিলও করা হতে পারে এবং জামা’তে এলানও হতে পারে। এমনকি ধর্মের খাতিরেও মিথ্যা বলা যাবে না। সত্য বলতে অস্বীকৃতি জানানো যেতে পারে কিন্তু মিথ্যা বলার অনুমতি নেই। ইসলামী আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা যাবে না। সরকারি আদালতে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকারি শাস্তি ভোগ করার জন্যও তার প্রস্তুত থাকা উচিত।

ওয়াকফীদের জামা’তের মাঝেও এমন চরিত্র সৃষ্টি করা উচিত, কেননা জামা’তের কল্যাণ মিথ্যার সাথে সম্পর্কিত নয়। ‘কুলু কাওলান সাদীদা’-এর ওপর ইসলামের ভিত্তি নিহিত। সততার এমন মানে উপনীত হওয়া উচিত যে, কেউ কখনও মিথ্যা বলে ফেললে এখানে এসে বলা উচিত- ‘আমি মিথ্যা বলে ফেলেছি, আমার ওয়াকফ রহিত করা হোক।’ এরপর শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

১০. মানুষ যদি বিপদের সময় তার মস্তিষ্কে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার না করে তাহলে তার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে যায় এবং অজুহাত অব্বেষণ করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। অন্যথায় সমস্যার সময় বিবেক খাটিয়ে কাজ করলে এবং মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করলে দ্রুতই সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব।

(তাহরীকে জাদীদের আদেশ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৮৩-৮৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সম্ভৃষ্টি প্রকাশ

জীবন উৎসর্গকারীরা আল্লাহ তা’লা প্রদত্ত অনুগ্রহে হযরত আমীরুল মু’মিনের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজকর্ম করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ফলে হযরত (রা.) জীবন উৎসর্গকারীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ও পরিশ্রমে সম্ভৃষ্টি হয়ে বলেন: “যে-সকল যুবক বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে আগ্রহী, কেবল তারা-

ই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করুন। আল্লাহ তা’লার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে এমন কিছু যুবক দিয়েছেন যারা উক্ত প্রেরণার হৃদয়ে লালন করেন। যেমন এমন উৎসর্গকারীদের মধ্যে একজন উকিল রয়েছেন (অর্থাৎ চৌধুরী মুশতাক আহমদ সাহেব বাজওয়া)। তার পিতা কয়েক একর জমির মালিক, আবার নিজ এলাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এমনকি কেন্দ্রীয় সংসদের ভোটারও বটে। সেই যুবক বিবাহিত কিন্তু আমরা তাকে কেবল ২০ রূপি ভাতা প্রদান করে থাকি আর তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। অথচ জমিদার হবার কারণে এবং নিজ এলাকায় প্রভাব থাকার কারণে তিনি ওকালতি করলে মাসে কমপক্ষে এক-দেড়শ রূপি নির্দিধায় আয় করতে পারতেন। বরং বর্তমান অধঃপতিত যুগে একজন চৌকস ব্যক্তি তো দু’শ-আড়াইশ রূপি আয় করছে। কিন্তু তিনি নিজেকে ওয়াকফ করেছেন এবং যৎসামান্য ওয়িফা গ্রহণ করবেন মর্মে ওয়াকফ করেছেন আর আমি তো এ ধরনের ওয়াকফকে বিনা পয়সায় ওয়াকফ আখ্যা দিয়ে থাকি কেননা আমাদের পক্ষ থেকে যে যৎসামান্য ভাতা দেওয়া হয় তা প্রায় না দেবার মত। এমনইভাবে আরও কয়েকজন গ্র্যাঞ্জুয়েটে আছেন যারা নিজেদের মেধার কারণে বাইরে কোথাও কাজ করলে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারতেন কিন্তু তারা সকলে সানন্দে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। অতএব এ সকল তাহরীকে জাদীদের ওয়াকফীনরা যে যৎসামান্য ভাতা নিচ্ছেন, তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকের কর্মী মনে করা উচিত কেননা এই যৎসামান্য অর্থ তাদের যোগ্যতা ও চাহিদার তুলনা নিতান্তই অপ্রতুল।”

(আল-ফযল, ২৪ নভেম্বর ১৯৩৮, পৃ. ১০-১১)

সিলেবাস প্রণয়ন

তাহরীকে জাদীদের দওরে সানী (তথা দ্বিতীয় ধাপে) ওয়াকফীনদের তা’লীম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তাদের যোগ্যতা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন দৃষ্টিতে রেখে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। প্রথমদিকে হুয়ূর (রা.) অনেক বেশি পড়ালেখা করাতে চান নি বরং যত দ্রুত সম্ভব, তাদেরকে দেশের বাইরে প্রেরণ করতে মনস্থ করেছিলেন। তদনুযায়ী বেশ কয়েকজনের পাসপোর্ট তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তখন হুয়ূর এ সকল ওয়াকফীনদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ালেখা করাতে মনস্থ করলেন।

হুযর হযরত মৌলভী সৈয়দ সরোয়ার শাহ সাহেব (রা.)-এর সাথে পরামর্শের পর বিভিন্ন বিষয় যেমন হাদীস, ফিকাহ, তফসীর, যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শন আর সুফীবাদী পড়াবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বললেন, “ছাত্রদের জানিয়ে দিন, তারা যেন নিজ নিজ পছন্দনীয় বিষয় বেছে নেয়।” (আসহাবে আহমদ, পঞ্চম খণ্ড, তৃতীয় অংশ, পৃ. ১৪৭) আবার আরবী বই-পুস্তক পাঠের জন্য মৌলিক গ্রামার জানা আবশ্যিক। তাই হুযর সকল ওয়াকফীনের জন্য গ্রামার শেখা আবশ্যিক করে দিলেন। অতএব সকল ওয়াকফীনকে সারফ ও নাহুর প্রারম্ভিক পুস্তক থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পড়তে হয়েছে। তবে এর জন্য রীতিমতো ক্লাস হয় নি বরং সিলেবাস নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এবং বলে দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক ওয়াকফে জিন্দেগী শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিজ নিজ মেধা অনুযায়ী দ্রুতই যেন সিলেবাস সম্পন্ন করেন। তবে অন্যান্য বিষয়ের জন্য নিয়মিত ক্লাস হতে থাকে।

সারফ-এর মাঝে মৌলভী খান মালেক সাহেব প্রণীত ‘কানুনচাহ খিওয়ালী’* মুখস্থ করা আবশ্যিক ছিল।

* (নোট: কানুনচাহ পাঞ্চাবী ভাষায় প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং এর নিয়মকানুন সংক্ষেপে উর্দুতে লেখা হয়েছিল। মৌলভী আব্দুল লতিফ ভাওয়ালপুরী পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তিকা কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।)

অনুরূপভাবে শেষ পুস্তক ফুসুলে আকবরীর পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক ছিল। নাহ্ অংশে নাহ্মীর থেকে কাফিয়া তাহযিবুত তাওয়াযিহ এবং শারাহ মুল্লা জামি পর্যন্ত সকল পুস্তক ক্লাসে পড়ানো হয়েছে। এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিকীয় শর্ত রাখা হয় যেন জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

জীবন উৎসর্গকারীদের জন্য নিয়োজিত শিক্ষকগণ

দওরে সানী (তথা দ্বিতীয় ধাপে) জীবন উৎসর্গকারীদেরকে বিভিন্ন সময় নিম্নে উল্লিখিত শিক্ষকগণ পাঠদান করেছেন।

১. হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সরোয়ার শাহ সাহেব। (জালালাইন, বাইযাবী এবং নাহ্)

২. মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব দিল্লী। [১৯৪০ থেকে হাদীস, ফিকাহ, নাহ্ এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহ]

৩. মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেব ভাওয়ালপুরী। (সারফ-নাহ, কানুনচাহ, ফুসুলে আকবরী ইত্যাদি)

৪. হযরত মাওলানা গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী। (তাসাওউফ)

৫. মাওলানা আবুল আতা সাহেব জলন্ধরী। (ইলমে মায়ানী)

৬. সাহেবজাদা সৈয়দ আবুল হাসান সাহেব কুদসী। (মুকাদ্দামা ইবনে খলদুন)

৭. মাওলানা কাজী মোহাম্মদ নাযির সাহেব লায়েলপুরী। (ফাসী)

৮. মৌলভী আরজুমান্দ খান সাহেব। (ফিকাহ)

৯. শেখ আব্দুল খালেক সাহেব নও মুসলিম ফায়েল। (১৮৪২ সাল থেকে রদে ঈসাইয়্যাত)

(নোট: ১৯৪২ সন থেকে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন)।

১০. কুরাইশি মুহাম্মদ নাযির সাহেব মুলতানী। (কুরআন শরীফ, আরবী গ্রামার)

১১. মৌলভী সেকেন্দার আলী সাহেব [তিনি একজন অ-আহমদী আলেম ছিলেন যাকে নিয়মিত বেতন দিয়ে রাখা হয়]। (ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ)

১২. *পীর আব্দুল আজিজ শাহ সাহেব খেয়ালী [সারগোদা জেলার অধিবাসী যিনি ১৯৪০ সালে বয়আত করেন এবং প্রায় আড়াই বছর পাঠদান করেন। (যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, আরবী গ্রামার এবং তিরমিযি শরীফ)]

১৩. মৌলভী মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেব কাদিয়ানী। (আরবী গ্রামার)

১৪. *মৌলভী মোহাম্মদ আহমদ সাহেব জালিল [তিনি ছাত্র ছিলেন এবং শিক্ষকও ছিলেন]। (হাদীস, আরবী আদাব)

১৫. মালেক সাইফুর রহমান সাহেব [তিনি ছাত্র ছিলেন এবং শিক্ষকও ছিলেন]। (কুরআন অনুবাদসহ, ফুসুলে আকবরী)

১৬. খান সাহেব ডাক্তার আব্দুল্লাহ সাহেব মরহুম [পিতা মিয়া বশীর আহমদ সাহেব সাবেক আমীর কোয়েটা জামা'ত]। (চিকিৎসা শাস্ত্র)*

* নোট: হুযূরের নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়াকেফীনদের জন্য ড. গোলাম জিলানির সাহেবের পুস্তক ‘মাখজানে হিকমত’-এর যেকোন দুটি খণ্ড পড়া আবশ্যিক করে দেন।

১৭. প্রফেসর মাহবুব আলম সাহেব খালিদ। (ইংরেজি)

১৮. মোহাম্মদ সারোয়ার সাহেব এম.এ. [ইবনে মোকাররম সৈয়দ বেলায়েত শাহ সাহেব অফ আফ্রিকা]। (ইংরেজি)

১৯. মৌলভী মোহাম্মদ ইসরাঈল সাহেব বালাকোট। (অ-আহমদী আলেম)

দারুল মুজাহিদ্দীন

জীবন উৎসর্গকারীদের বিশেষ তা’লীম ও তরবিয়ত এবং শিক্ষার জন্য ১৯৩৮ সালে দারুল মুজাহিদ্দীন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে কিছুকাল জীবন উৎসর্গকারীরা অবস্থান করেন। পরবর্তীতে মাস্টার শেখ মোবারক ইসমাঈল সাহেবের (হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানীর ভাগিনা ছিলেন) বাড়িতে এবং পরবর্তীতে ১৯৪০ সালে ডাক্তার হাজী খান সাহেবের বাড়িতে অবস্থিত দারুল আনোয়ারে স্থানান্তরিত হয় যেখানে ওয়াক্কেফীদের থাকা-খাওয়া এবং শিক্ষাদীক্ষা দুটোরই ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত দারুল মুজাহিদ্দীন ১৯৪৭ সালে হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জীবন উৎসর্গকারীদের মাঝে নিরলস চেষ্টা-সাধনার প্রেরণা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর দৃষ্টিতে প্রত্যেকে ওয়াক্কেফই ছিলেন একেকজন মুজাহিদ। এজন্য হুযূর জীবন উৎসর্গকারীদের ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখেন যে, মুজাহিদ্দীনে তাহরীকে জাদীদ নিজেদের সুউচ্চ মর্যাদা অনুধাবন করবেন আর তাহরীকে জাদীদকে চেষ্টা-সাধনার অঙ্গীকার মনে করে জেহাদের স্পৃহা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করবেন। এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হুযূর (রা.) বলেন:

“প্রত্যেক জীবন উৎসর্গকারী একজন মুজাহিদ হয়ে থাকেন এবং মুজাহিদের ওপর আল্লাহ তা’লা অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সেগুলো পূর্ণকারীরাই মুজাহিদ আখ্যায়িত হবার যোগ্য হয়ে থাকেন...। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো সেই জাতির সাথে যাদের যুবকেরা চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিবাহ করেন নি আর নিজেদের জীবন ল্যাবরেটরিতে কাটিয়ে দিয়েছেন এবং কাজ করতে করতে টেবিলের ওপরে পড়েই মারা গেছেন আর মৃত্যুর পূর্বে বহু

উপকারী আবিষ্কার নিজ জাতির হাতে দিয়ে গেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো এমন লোকদের সাথে যাদের কাছে গোলা-বারুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। ফলে তারা আমেরিকার কাছ থেকে নিষ্ক্রিয় বন্দুক চেয়ে নেয় আর তা দিয়েই নিজেদের শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা বলেছিল, যদি জার্মানরাও এসে পড়ে তাহলে আমরা তাদের সাথে সমুদ্রে লড়াই করব। যদি সমুদ্রে লড়াই করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাদের সাথে সমুদ্রের কিনারায় অর্থাৎ সমুদ্রতীরে লড়াই করব আর যদি সমুদ্রের তীরে যুদ্ধ করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে আমরা শহরের অলিগলিতে গিয়ে লড়াই করব আর যদি শহরের অলিগলিতে যুদ্ধ করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে আমরা ঘরের দরজা পর্যন্ত মোকাবেলা করব আর যদি এরপরেও মোকাবেলা করতে না পারি তাহলে নৌকায় চড়ে আমেরিকা চলে যাব কিন্তু এদের সাথে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করব না। অতএব এমন লোকদের সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে...। আমাদের তো এমন মানুষের প্রয়োজন, যেখানেই তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, তারা সেখান থেকে এক পা-ও পিছপা হবে না। তবে হ্যাঁ, তাদের লাশ পড়লে এক ফুট আমাদের দিকে আসতে পারে কিন্তু তারা জীবিত থাকলে কমপক্ষে এক ফুট সম্মুখে অগ্রসর হবে। আমাদের এমন লোকই প্রয়োজন আর এমন লোকেরাই জাতির ভিত্তি রাখার কাজ করে। আল্লাহ্ তা’লা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের বিষয়ে বলেন, তারা সবাই কাফন পরে আছে, ‘মিনহুম মান কাযা নাহবাহ্ ওয়া মিনহুম মাইয়ানতায়ের’ অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ ইসলামের পথে নিজেদের জীবন দিয়ে দিয়েছে আর কতক এর অপেক্ষায় রয়েছে। এভাবে জীবন উৎসর্গ করলেই পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করা সম্ভব।”

(আল-ফযল, ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৬, পৃ. ০৭-০৮)

ওয়াকফে জিন্দেগীদের মাঝে মুজাহিদসুলভ স্পৃহা এবং সিপাহীসুলভ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার জন্য হুযূর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রথমত: জীবন উৎসর্গকারীদের জন্য দারুল ওয়াকফীনে অবস্থান করা বাধ্যতামূলক ছিল। বিবাহিত ওয়াকফে জিন্দেগীদেরকে সপ্তাহে কেবল একদিন অর্থাৎ বৃহস্পতি ও জুমুআর মধ্যবর্তী রাতে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি ছিল আর অবিবাহিত ওয়াকফে জিন্দেগীদের সপ্তাহে দু’বার সামান্য সময়ের জন্য এবং মাসে একবার ছুটি নিয়ে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি ছিল।

দ্বিতীয়ত: ডায়েরী লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। কত ওয়াজ্ত বাজামা’ত নামায পড়েছেন এবং কোন মসজিদে পড়েছেন তা ডায়েরীতে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হতো। এছাড়া কতদিন কুরআন তেলাওয়াত করেছেন- তা-ও ডায়েরীতে উল্লেখ করতে হতো।*

* নোট: বাজামা’ত নামাজ আদায় করা ওয়াকেফীনদের জন্য এতই আবশ্যিক ছিল যে, একবার হুযূর জামেয়া আহমদীয়ার কয়েকজন ছাত্রকে নামাযে অলসতার কারণে বের করে দেন এবং কয়েকজনের ওয়াকফ কবুল করেন নি কেননা তাদেরকে বাজামা’ত নামাযের ক্ষেত্রে উদাসীন দেখা যায়।

(রেকর্ড ওকালাতে দিওয়ান, তাহরীকে জাদীদ, রাবওয়া)

তৃতীয়ত: জীবন উৎসর্গকারীরা সাধারণত প্রত্যেক পনেরো দিন পর একবার হযরত আকদাস (রা.)-এর নিকটে সম্মিলিতভাবে উপস্থিত হতেন। এভাবে হুযূর সরাসরি ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করতেন এবং ছাত্রাও হুযূরের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য পেত। হুযূর বিভিন্ন সময় তাদেরকে বিভিন্ন জ্ঞানগত দক্ষতা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা নিতেন।

চতুর্থত: সেই সময়টি যেহেতু ওয়াকেফীনদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সময় ছিল এ জন্য তাঁদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হতো। কোন দোষ-ত্রুটিই গ্রাহ্য করা হতো না বরং এর জন্য শাস্তি দেওয়া হতো। শাস্তির ধরন ছিল-নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইতেকাফে বসা, একাকী অথবা বিনা ব্যয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটা অথবা সকলের সামনে ক্ষমা চাওয়া।*

* নোট: হুযূর (রা.) ওয়াকেফীনদের বিশেষ সম্মান করতেন। প্রকৃত বিষয় হল, ওয়াকেফীনদের প্রতি হুযূর অতুলনীয় আন্তরিকতা ও ভালবাসা রাখতেন। হুযূরের পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদ অফিসের প্রতি দিকনির্দেশনা ছিল যে, ওয়াকেফে জিন্দেগীকে যেন সম্মানের সাথে সম্বোধন করা হয়। হুযূর ওয়াকেফীনদের যে সম্মান করতেন তা একটি ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় আর তা হল, ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে হুযূর ঘোষণা করেন, ‘আগামীতে আমি কেবল আমার পরিবারের লোকদের বিবাহের এলান করবো, কিন্তু এই এলানের ক্ষেত্রে ওয়াকেফীনদের বিষয়টি পৃথক রাখেন। তদনুযায়ী হুযূর (রা.) ১৯৪৪ সালের ১০ এপ্রিল ওয়াকফে জিন্দেগী মৌলভী নুরুল হক সাহেব (আবুল মুনির)-এর বিবাহের এলান করতে গিয়ে বলেন, আমি আমার পরিবারের বাইরে আর কারও বিবাহ পড়াবো না বলে ঘোষণা দিয়েছিলাম। কিন্তু এই ব্যক্তি ওয়াকফে জিন্দেগী হবার কারণে আমার পরিবারভুক্ত, তাই আমি তার বিবাহের এলান করছি।

(আল-ফযল, ২২ জুন ১৯৪৪, পৃ. ০৫)

পঞ্চমত: হুযূর (রা.) ওয়াকেফীনদেরকে বার বার বুঝিয়েছেন— ‘আপনাদেরকে যে কাজই দেওয়া হোক, তা সানন্দে পালন করবেন এবং সেটিকেই ধর্মের কাজ মনে করবেন।’

ষষ্ঠত: মজলিস খোদামুল আহমদীয়া সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই সংগঠনের কাজে ওয়াকেফীনদের অংশগ্রহণ আবশ্যিক করে দেওয়া হয়েছিল।

সপ্তম: ইসলামী রীতিনীতি বিশেষভাবে অনুসরণের প্রতি হুযূর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি (রা.) সম্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেছিলেন, “ওয়াকেফীন নিজেদের মাথার চুল এমনভাবে রাখবেন যেন মাথার কোন অংশের চুল অন্য অংশের চুলের সাথে অসামঞ্জস্য না থাকে, তাই সব চুল ছোট হোক বা বড়, একই রকম যেন হয়।”

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, ‘মু’মিনসুলভ দাড়ি থাকা আবশ্যিক’। অন্যত্র এ বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, দাড়ি এমন হতে হবে যেন কেউ দেখেই বুঝতে পারে- ‘এ ব্যক্তির মুখে দাড়ি আছে’। তবে দাড়ি কতটা ছোট-বড় হবে- এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই...। মহানবী (সা.)-এর আদেশ পালন করাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং এমনভাবে আনুগত্য করতে হবে যেন তা মানুষের দৃষ্টিতে পড়ে।’

অষ্টম: হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ওয়াকেফীনদের মাঝে সহনশীলতা, উদ্যম ও পরিশ্রম করার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য ১৯৩৯ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে কাদিয়ান থেকে কুল্লু পর্যন্ত পদব্রজে সফর করান। ওয়াকেফীনদের নিজের জিনিসপত্র (বিছানা, কাপড় ইত্যাদি) নিজে বহন করা এবং পথিমধ্যে খাবার ইত্যাদি রান্না করাসহ সকল কাজ নিজ হাতে করার নির্দেশ ছিল। কেবল চাল-ডাল এবং হাড়ি-পাতিল বহনের জন্য কুলির সহায়তা নেবার অনুমতি ছিল। এই সফরে চৌধুরী মুশতাক আহমদ সাহেব বাজওয়া ছিলেন আমীরে কাফেলা।*

* [মুজাহিদীনের এই দল ১৯৩৯ সালের ০৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কাদিয়ান ফেরত আসে।]

এরপর ওয়াকেফীনরা মুকাররম মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৯৪০ সালে ডালহৌজী এবং ১৯৪১ সালে চুমা (ঝাড়খন্ড) পর্যন্ত পদব্রজে সফর করেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৪২ সালে গোলাম আহমদ

সাহেব ফাজেল দেহলভীর তত্ত্বাবধানে মুজাহিদ্দীনদের কাফেলা কাদিয়ান থেকে জম্মু পর্যন্ত ট্রেনে চড়ে পৌঁছায় আর সেখান থেকে পদব্রজে ২০ আগস্ট শ্রীনগর পৌঁছায়। শ্রীনগর থেকে ফেরত আসার সময় তীব্র বৃষ্টি এবং পথ-ঘাট খারাপ হওয়া সত্ত্বেও ওয়াক্কেফীনরা শ্রীনগর থেকে জম্মু পর্যন্ত দুই রাত এবং দেড় দিনে পায়ে হেঁটে সফর সম্পন্ন করেন। অনুরূপভাবে ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে ওয়াক্কেফীনগণ মোকাররম মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে পুনরায় ডালহৌজী পর্যন্ত পদব্রজে সফর করেন। শিক্ষকেরাও পূর্ব থেকেই সেখানে গিয়ে অবস্থান করছিলেন। তারা সেখানে কিছু দিন অবস্থান করেন এবং শিক্ষকেরা তাদেরকে সেখানেই পাঠদান করতে থাকেন।

নবম: সে-যুগ যেহেতু ওয়াক্কেফীনদের প্রশিক্ষণ এবং তরবিয়তের যুগ ছিল তাই হুযূর জামা’তের সদস্যদের এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন: “এ-যুগ যুবকদের প্রশিক্ষণ এবং তরবিয়তের যুগ আর প্রশিক্ষণের যুগ নীরবতার যুগ হয়ে থাকে। মানুষ মনে করে যেন কোন কাজই হচ্ছে না। কিন্তু জাতি যখন তরবিয়ত লাভ করে কার্যক্ষেত্রে নেমে পড়ে তখন জগৎ এর ফলাফল প্রত্যক্ষ করতে থাকে। মোটকথা এমন জীবন্ত জাতি যারা একহাতের ইশারায় ওঠে-বসে, তারা জগতে মহান বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়। এ বিষয়টি আমাদের জামা’তে এখনও সৃষ্টি হয় নি। আমাদের জামা’তে কুরবানীর বৈশিষ্ট্য অনেক আছে কিন্তু এখনও এই স্পৃহা তাদের মাঝে চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয় নি। তাদের কানে যখনই যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে কোন আহ্বান আসে, তখন এটিকে কোন সাধারণ মানুষের আহ্বান বলে মনে করা উচিত নয় বরং জামা’তসমূহের মনে করা উচিত, ফেরেশতা তাদেরকে তুলে নিয়েছে এবং সিংগায় ফুঁ দেওয়া হয়েছে। যখন বলা হবে, ‘বসো’, তখন তাদের মনে করা উচিত না যে, কোন মানুষ বলছে বরং মনে করা উচিত, তাদের ওপর ফেরেশতা প্রভাব বিস্তার করছে আর তারা হবে এমন বাহন যাদের ওপর ফেরেশতা আরোহন করে আছে। যখন ফেরেশতা বলবে, বসো! তখন সবাই বসে পড়বে। যখন বলবে, দাঁড়াও! তখন সবাই দাঁড়িয়ে যাবে। যে-দিন আমাদের জামা’তের মাঝে এই প্রেরণা সৃষ্টি হবে, সে-দিন যেভাবে বাজপাখি অন্য ছোট পাখির ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, ঠিক সেভাবেই আহমদীয়াত নিজেদের শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং পৃথিবীর সকল দেশ ছোট পাখির ন্যায় তাদের করতলগত হবে আর

পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা পুনরায় নতুনভাবে পতপত করে উড়তে থাকবে।”

(আল-ফযল, ০৭ এপ্রিল ১৯৩৯, পৃ. ০৭)

স্থায়ীভাবে সিনেমা দেখায় নিষেধাজ্ঞা

গুরুত্ব দিকে হুযূর (রা.) তিন বছরের জন্য সিনেমা দেখায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরবর্তীতে এই নিষেধাজ্ঞা ১০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। এরপর স্থায়ীভাবে সিনেমা দেখায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ বিষয়ে তিনি (রা.) বলেন:

“অনেকের মুখ থেকে এমনও কথা শোনা গেছে যে, সিনেমা দেখায় তো কেবল ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, মন্দের সম্পর্ক দশ বা বিশ বছরের সাথে নয় বরং যে জিনিস পাশে নিমজ্জিত করে তা কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সম্পর্ক রাখে না। মেয়াদ নির্ধারণ করে আমি গুরুত্ব আপনাদের মাঝ থেকে এই মন্দ অভ্যাস দূর করেছি। আমি গুরুত্বই যদি বলতাম যে, স্থায়ীভাবে সিনেমা দেখা নিষেধ, তাহলে কতিপয় যুবক, যাদের ঈমানে দুর্বলতা আছে তারা উক্ত আদেশ পালনে গড়িমসি করতো। কিন্তু আমি প্রথমে তিন বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলাম। আর যখন অভ্যাস দূর হয়ে গেল, তখন আরও সাত বছরের জন্য বৃদ্ধি করে দিলাম। এর ফলে সিনেমা দেখার অভ্যাস একেবারেই দূর হয়ে গেল। এখন তো বন্ধুরা নিজেরাই বলতে বাধ্য হবেন- ‘সিনেমা জাহান্নামে যাক, এতে পয়সা নষ্ট করার কী প্রয়োজন’?”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৩৯, পৃ. ৮৫)

অতঃপর বলেন, “আমার মতে এ যুগের নিকৃষ্টতম বাজে জিনিস হল সিনেমা। এটি শতসহস্র ভদ্রঘরের মানুষকে গায়ক শতসহস্র ভদ্রবংশের মহিলাদেরকে নর্তকী বানিয়ে দিয়েছে। আমি বিভিন্ন সাহিত্য বিচিত্রা পড়ে থাকি। আমি দেখেছি, সিনেমায় আগ্রহী এবং সিনেমার সাথে সম্পৃক্ত যুবকদের গল্পে এমন ঠাট্টাতামাশা থাকে আর তাদের চরিত্র এবং তাদের ঠাট্টাতামাশা এত নোংরা হয়ে থাকে, যা সত্যিই আশ্চর্যজনক। সিনেমা প্রস্তুতকারকদের উদ্দেশ্য থাকে অর্থ উপার্জন করা, চারিত্রিক সংশোধন তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই তারা অর্থ উপার্জনের জন্য এমন বাজে কল্লকাহিনি এবং গান-বাজনা

পরিবেশন করে যা মূলত চরিত্র বিধ্বংসী। ভদ্র লোকেরা যখন সেখানে যায় তখন তাদের রুচি বিগড়ে যায় আর তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরও একই অবস্থা হয়। সিনেমা দেশের চরিত্রের ওপর এমন ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে যে, আমি মনে করি, আমার নিষেধ করা দূরে থাক, আমি নিষেধ না করলেও মু’মিনের আত্মার নিজে নিজে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত।”

(আল-ফযল, ১২ ডিসেম্বর ১৯৪৪, পৃ. ০৫)

১৯৪৩ সালের এপ্রিলে একটি বিষয় ছয়ূরের দৃষ্টিগোচর করা হয় যে, কতক যুবক মনে করেন, হযরত আমীরুল মু’মিনীন ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র দেখার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। এ বিষয়ে ছয়ূর (রা.) বলেন:

“যে ব্যক্তি বলে যে, আমি ইতিহাস নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র দেখার অনুমতি দিয়েছি- সে মিথ্যাবাদী। আমি আদৌ এমন কথা বলি নি...। আমি যে অনুমতি দিয়েছি তা হল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা মিলিটারি অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে যে সত্যিকার তথ্যচিত্র দেখানো হয় যেমন জিওগ্রাফি, নদ-নদীর চিত্র অথবা কলকারখানার চিত্র অথবা সত্যিকারের যুদ্ধচিত্র ইত্যাদি। এগুলো দেখার অনুমতি আছে কেননা এগুলোতে জ্ঞান লাভ হয়।”

(আল-ফযল, ২৫ এপ্রিল ১৯৪৩, পৃ. ০২)

তিনি (রা.) আরও বলেন, “ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রের অর্থ হল সত্যিকার তথ্যচিত্র। কাল্পনিক মিথ্যা কখনও দেখার অনুমতি দেওয়া হয় নি। ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র এমন যেমন সান ফ্রান্সিসকোর জাপানের সাথে সন্ধিচুক্তির দৃশ্য। ভৌগোলিক অর্থ পাহাড়ে গিয়ে অথবা জাভা গিয়ে সেখানের জঙ্গল অথবা নদ-নদীর দৃশ্য ইত্যাদি। কাল্পনিক মিথ্যা চলচ্চিত্র- তা ভৌগোলিক হোক বা জিওগ্রাফিক অথবা ঐতিহাসিক- এ সবকিছু দেখা অবৈধ। যেমন কোন ব্যক্তি যদি নেপোলিয়ানের যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তবে তা মিথ্যা হবে। ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র হওয়া সত্ত্বেও তা দেখা অবৈধ।”

(আল-ফযল ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫১; পৃ. ০২)

দেহাতী (তথা গ্রাম্য) ওয়াকফে জিন্দেগী মোবাল্লেগ স্কিম

“সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় হযরত আমীরুল মু’মিনীন (রা.) যখন দেখলেন যে, এ মুহূর্তে এত অধিক সংখ্যায় মোবাল্লেগ প্রস্তুত করা সম্ভব নয়

যতজন হলে সমস্ত পৃথিবীর প্রয়োজন পূর্ণ করা যেতে পারে। তখন আল্লাহ তা’লা হুযূর (আই.)-এর হৃদয়ে নতুন এক বিষয়ের উদয় ঘটালেন আর তা হল, গ্রাম্য ওয়াকফে জিন্দেগী মোবাল্লেগ স্কিম। ১৯৪৩ সালের ২৯ জানুয়ারি তৃতীয় পর্যায়ের মোবাল্লেগ (গ্রাম্য মোবাল্লেগ) স্কিম চালু করতে গিয়ে তিনি (রা.) ঘোষণা দেন:

“আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, দুই ধরনের মোবাল্লেগ হওয়া উচিত। প্রথমত যারা বড় বড় শহর এবং প্রদেশে গিয়ে তাবলীগ করতে পারবে। বজুতা এবং মোনাজেরা ইত্যাদি করতে পারবে। নিজেদের অধীন মোবাল্লেগদের কাজের তত্ত্বাবধায়ন করতে পারবে। দ্বিতীয়ত তাদের চেয়ে এক ধাপ নিচের এমন মোবাল্লেগ হবেন যারা গ্রামগঞ্জে তাবলীগ করবেন যেমনটি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হয়ে থাকেন। গ্রাম থেকেই এমন মোবাল্লেগ বাছাই করা হবে। তাদেরকে এক বছরের কোর্সে মৌলিক বিষয়গুলো শেখানো হবে। এরপর তাদেরকে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। যেভাবে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ তাদের নিজস্ব গ্রামের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নিয়ে থাকে, ঠিক সেভাবে তারা নিজ এলাকার তাবলীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে...। তাদেরকে এক বছরে মৌলিক ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে যেমন, বিবাহ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জানাযা ইত্যাদি বিষয়ের বিধিবিধান শেখানো হবে। পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়ানো হবে। তা’লীম ও তরবিয়তের বিষয়ে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে এবং শিশু-কিশোরদেরকে কীভাবে চারিত্রিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ করা যায়— এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই সময়ে তাদের এক-দুই মাস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাঝে কাজ করার সুযোগ থাকবে আর এই সম্পূর্ণ কোর্স এক বছর বা সোয়া বছরে সম্পন্ন করিয়ে তাদেরকে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হবে...। অতএব আমি এ বিষয়ে জামা’তের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এই স্কিম সফল করার জন্য জোর-প্রচেষ্টা চালান আর নিজেদের আশপাশের এমন যুবকদেরকে দ্রুত প্রেরণ করুন যারা প্রাইমারী অথবা হাইস্কুল পাশ করেছেন আর লোয়ার প্রাইমারীর শিক্ষকদের সমপরিমাণ ভাতা গ্রহণপূর্বক তাবলীগ করতে সম্মত আছেন, যেন তাদের জন্য তা’লীমী কোর্স নির্ধারণ করে তাদেরকে তাবলীগের জন্য প্রস্তুত করা যায়।”

(আল-ফযল, ০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, পৃ. ০৩)

যুদ্ধকালীন সময় হবার কারণে স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র ফেল করে তাই

প্রথমদিকে কেবল ১৫জন ওয়াকফীন বাছাই করে নেওয়া হয় যাদের ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস হতে থাকে। জামা’তের আলেমরা ছাড়াও স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (সা.) তাদের ক্লাস নেন। হুযূর (রা.) (৭-৯ এপ্রিল ১৯৪৪ সালের) মজলিসে শূরায় বলেন: “আমি আজকাল দেহাতী মোবাল্লেগদের তা’লীম দিচ্ছি। এরা শিক্ষকও হবেন আবার মোবাল্লেগও হবেন। ছয় মাসের মধ্যে এরা পাশ করে বের হবেন। সংখ্যায় তারা ১৫ থেকে ২০জন।

ট্রেনিং শেষ হলে তাদের মধ্য থেকে ১৪জনকে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাবের বিভিন্ন গ্রামে প্রেরণ করা হয়।*

* নোট: প্রথম দেহাতী মোবাল্লেগদের নামের তালিকা:

১. মৌলভী আব্দুল মজিদ সাহেব মুনিব (ধারিওয়াল)
২. মৌলভী গোলাম রসুল সাহেব (গাজীকোর্ট)
৩. হেকিম আহমদ দীন সাহেব (ভিনি মেলুয়াঁ)
৪. মাস্টার মাহদী শাহ সাহেব (আজনালাহ)
৫. মৌলভী শের মুহাম্মদ সাহেব (মিয়াদি নানু)
৬. মৌলভী আতাউল্লাহ সাহেব (আইনুয়ালি)
৭. খাজা খুরশিদ আহমদ সাহেব (মোগলপুরা)
৮. মৌলভী রহিম বখশ সাহেব (লাহোর)
৯. সৈয়দ মুহাম্মদ আমিন শাহ সাহেব (কাথুওয়ালি)
১০. সৈয়দ আলী আসগর শাহ সাহেব (গুজরাট)
১১. হাফেজ আবজার সাহেব (সারগোদা)
১২. মৌলভী জামাল উদ্দীন সাহেব (সারগোদা)
১৩. হাফেজ বশীর উদ্দীন সাহেব (ইয়ামিনাবাদ)
১৪. মৌলভী শেখ মুহাম্মদ সাহেব (মুলতান)

দেহাতী মোবাল্লেগদের এই স্কিম অনেক সফল হয় এবং হুযূর দেহাতী মোবাল্লেগদের সম্পর্কে সম্ভ্রুতি প্রকাশ করে বলেন:

“খোদা তা’লার ফযলে আমাদের এই অভিজ্ঞতা অনেক সফল হয়েছে। অনেক জামা’ত এমন ছিল যারা চাঁদার বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিল। এখন তাদের

মারো প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম বছর কেবল ১৫জন এই ক্লাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল অথচ গত বছর ৫০জন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।”

(খুতবা জুমুআ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৭)

দেহাতী মোবাল্লেগদের তৃতীয় ব্যাচের ক্লাস ১৯৪৭ সালে চালু হয় যেখানে ৫২জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্লাস শুরু হতেই দেশে নৈরাজ্য শুরু হয়, ফলে অধিকাংশ ছাত্র কাদিয়ানে জ্ঞানার্জনের জন্য থেকে যায় আর কেবল ছয়জন পাকিস্তানে যায় যাদের পরিপূর্ণ তা’লীম দেবার পর তাবলীগের কাজে লাগানো হয়।

(বাৎসরিক রিপোর্ট: সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান ১৯৪৭-১৯৪৮, পৃ. ০৬)

এরপর ভবিষ্যতের জন্য এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, কেবলমাত্র অবিবাহিতদের নেওয়া হবে আর কেবলমাত্র অধ্যয়নের সময় ওযিফা দেওয়া হবে, অধ্যয়নের পর দুই বছর পর্যন্ত কোন ধরনের ভাতা ব্যতীত কাজ করতে হবে। অতএব এ সকল শর্ত অনুযায়ী চতুর্থ ব্যাচের ক্লাস জুন ১৯৪৮ সালে লাহোরে চালু করা হয়। ওয়াক্ফীনরা যখন অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন তখন তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দেহাতী মোবাল্লেগদের চারটি গ্রুপ হয়ে যায় যাদের সংখ্যা ১৯৫২ সালে ৫৯ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ১৯৫৪ সালের ২৮ মার্চ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নির্দেশে মাওলানা আবুল আতা সাহেব (জলন্ধরী) এবং মিয়া গোলাম মোহাম্মদ সাহেবের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হয় যারা দেহাতী মোবাল্লেগদের পরীক্ষা নিয়ে যোগ্য মোবাল্লেগদের নির্বাচিত করে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাজারাতে ইসলাহ ও ইরশাদ দপ্তরে মোয়াল্লেম হিসেবে রেখে দেন আর অন্যান্যদের ফিল্ডে পাঠিয়ে দেন।

সহায়সম্পদ উৎসর্গীকরণ এবং উৎসর্গীকৃত সম্পদ থেকে প্রাপ্ত উপার্জন থেকে অর্থ প্রদান করার বিশেষ তাহরীক

এ বিষয়ে হুযূর (রা.) স্পষ্ট করে বলেন: “এই ওয়াক্ফ... এভাবে হবে যে, তাদের সহায়সম্পদ তাদের কাছেই থাকবে আর এর তত্ত্বাবধান তারাই করবেন। তবে জামা’তের যখন প্রয়োজন হবে, এমন প্রয়োজন যা সাধারণ

চাঁদার মাধ্যমে পূর্ণ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে এসব সম্পত্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত উপার্জন থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ আনুপাতিকহারে গ্রহণ করা হবে।”

(আল-ফযল, ৩১ মার্চ ১৯৪৪, পৃ. ০৫)

উক্ত তাহরীকের পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) নিজ সহায়সম্পদ ওয়াকফ করে দেন, কেবল তাই নয়, হুযূরের অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে পেরে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব এবং নবাব মাসউদ আহমদ খান সাহেব নিজ নিজ সহায়সম্পদ প্রিয় হুযূর (রা.)-কে সোপর্দ করেন। এ বিষয়টি হুযূর (রা.) নিজেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি (রা.) বলেন:

“উক্ত উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আমি নিজেই নিজের সহায়সম্পদ উৎসর্গ করছি। দ্বিতীয়ত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব, যিনি নিজের সহায়সম্পদ আমার তাহরীকের কারণে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন আর তিনি আমাকে বলেছেন যে, হুযূর! আপনার স্মরণ থাকবে, পূর্বেও আপনার এই বাসনা ছিল এবং একদা আপনি আমার কাছে আপনার উক্ত বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন যে, আমার সহায়সম্পদ উক্ত উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে। এখন পুনরায় আমি উক্ত উদ্দেশ্যে আমার সহায়সম্পদ উপস্থাপন করছি। এছাড়া আমার ভতিজা মাসউদ আহমদ খান সাহেব যিনি গতকাল শুনেছেন যে, আমি এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি, একথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে লিখেছেন যে, আমার যত সহায়সম্পদ আছে, আমি তা ইসলামের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি।”

(আল-ফযল, ১৪ মার্চ ১৯৪৪, পৃ. ১২-১৩)

হুযূর উক্ত উদ্দেশ্যে একটি কমিটি বানায়েন যাদের দায়িত্ব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া যে, এ মুহূর্তে ওয়াকফকৃত জায়েদাদ থেকে কতটা অর্থ গ্রহণ করতে হবে। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় এক কোটি রুপির সমপরিমাণ সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়।

ব্যাপক পরিসরে ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর দূরদর্শিতা প্রয়োজনের পূর্বেই এটি অনুভব করে যে, যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই আমাদের তাত্ক্ষণিকভাবে

ইসলাম প্রচারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এজন্য হুয়ূর ১৯৪৪ সালের ২৪ মার্চ জীবন উৎসর্গ করার জোরালো ঘোষণা প্রদান করেন।

(আল-ফযল, ৩১ মার্চ ১৯৪৪ পৃ. ০৫)

তিনি (রা.) বলেন: “আমার ধারণামতে বর্তমানে আমাদের ২০০ আলেমের প্রয়োজন রয়েছে। তাহলেই বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী জামা’তের কাজ ব্যবস্থাপনার অধীনে চালানো যেতে পারে কিন্তু এ মুহূর্তে ওয়াক্কেফীনদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫জন।... এছাড়া গ্রাজুয়েট এবং এম.এ. পাশ যুবকদেরও কলেজের জন্য প্রয়োজন যেন তাদেরকে প্রফেসর বানানো যায়। অনুরূপভাবে উৎসর্গকারীদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতে যেন নাযেরদের স্থলাভিষিক্ত বানানো যায়। ভবিষ্যতে এমন মানুষ দেখা যাচ্ছে না যাদেরকে নাযেরদের স্থলাভিষিক্ত বানানো যেতে পারে। তাই আমার পরামর্শ হল, উৎসর্গকারী যুবকদের এমন কাজে লাগাতে হবে আর তাদের এমনভাবে তরবীয়ত করতে হবে যেন তারা ভবিষ্যতে বর্তমান নাযেরদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। অতএব আমাদের এখন এম.এ. সম্পন্ন করা যুবকদের প্রয়োজন।*

(আল-ফযল, ৩১ মার্চ ১৯৪৪, পৃ. ০৩-০৭)

* নোট: এই তাহরীক অনুযায়ী ১৯৪৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) নিম্নোক্ত ওয়াক্কেফীনদের বিভিন্ন অফিসে পদায়ন করেন:

১. মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব মুনির বি.এ. (প্রাইভেট সেক্রেটারি অফিস)
 ২. মির্যা বশীর আহমদ বেগ সাহেব বি.এ. (দাওয়াত ও তবলীগ অফিস)
 ৩. চৌধুরী আযীয আহমদ সাহেব বি.এ. (মুহাসেব অফিস)
 ৪. চৌধুরী আব্দুল বারি সাহেব বি.এ. (অফিস বায়তুল মাল)
 ৫. মৌলভী বরকত আহমদ সাহেব বি.এ. (উমরে আ’মা অফিস)
 ৬. চৌধুরী আব্দুস সালাম সাহেব আখতার বি.এ. (তা’লীম-তরবীয়ত অফিস)
- (স্কুল ও কলেজের কাজের জন্য)

আহমদী যুবকদের উল্লেখযোগ্য নিষ্ঠা

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর উক্ত তাহরীকে আহমদী যুবকেরা ধর্মসেবার উদ্দেশ্যে উন্মাদের ন্যায় ছুটে আসে আর নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। নিষ্ঠা এবং ভালবাসার এ এমন এক উল্লেখযোগ্য দৃশ্য ছিল

যা অমুসলিমদেরকেও প্রভাবিত করে। জলন্ধর থেকে প্রকাশিত ‘প্রকাশ’ পত্রিকা লেখে:

“আপনারা আহমদীয়া জামা’তের তাহরীকে কাদিয়ানের প্রতি গভীরভাবে অভিনিবেশ করুন আর চোখ খুলুন। কাদিয়ানে বড় বড় আহমদীরা নিজেদের কলিজার টুকরোকে আহমদীয়াতের তবলীগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছেন আর এই পেশাকে অতি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। এই তাহরীক দিনে দ্বিগুন এবং রাতে চতুর্গুন উন্নতি করে চলেছে কেননা তাদের নেতারা ‘আলেম বা-আমল’ এবং নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের অধিকারী।”

(পত্রিকা ‘প্রকাশ’, জলন্ধর, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭)

গায়ের আহমদী যুবকদের ওপর ওয়াকফের ঘোষণার প্রভাব

এই তাহরীক গায়ের আহমদী যুবকদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলে— এর ধারণা লাভের জন্য কেবল একটি চিঠি উল্লেখ করা হচ্ছে। একজন গায়ের আহমদী বন্ধু ইকবাল আহমদ সাহেব জুবাইরি বি.এ.বি.টি. হুয়ুরের সমীপে লেখেন:

“হযরত আমীরুল মু’মিনীন! আসসালামু আলাইকুম। মোবারক আহমদ সাহেব নামী আপনার জামা’তের এক সদস্য আমার সহকর্মী বন্ধু। আমরা উভয়ে প্রায় দুই-আড়াই বছর একত্রে কাজ করছি আর আমাদের উভয়ের মাঝে অত্যন্ত গভীর এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক রয়েছে...। আমি তার সাথে দুটি জুমুআর নামায আদায় করেছি আর বিভিন্ন সময় আল-ফযল পাঠ করা এবং আপনার খুতবা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। সেগুলোর মাঝে দুটি খুতবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি খুতবা যেটি হিন্দুস্তান এবং ইংল্যান্ডের মধ্যকার আপোষবিষয়ক ছিল আর দ্বিতীয় খুতবা যার মাঝে আপনি জামা’তের সদস্যদের কাছে খোদা ও তাঁর রসূলের পথে জীবন উৎসর্গ করার জরগরি আহ্বান জানিয়েছেন। মোবারক আহমদ সাহেব তো আপনার আহ্বানে তাত্ক্ষণিক লাক্ষ্যক বলছে আর তার পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্র এবং আবেদন সম্ভবত আপনার সামনে আছে। আমি এ মুহূর্তে যদিও আপনার জামা’তের সদস্য না কিন্তু যে-কোন ব্যবস্থাপনার অধীনে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সেবা করতে আমার কোন দ্বিধা নেই।”

তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদ্দীনদের জন্য সনদ

তাহরীকে জাদীদ-এর প্রাথমিক দশ বছর শেষ হলে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) দফতর আউয়াল তথা প্রথম ধাপ বা প্রথম পর্যায়ের মুজাহিদ্দের স্বহস্তে স্বাক্ষরিত সনদ প্রদান করেন।

বই-পুস্তক প্রকাশ

দ্বিতীয় ধাপে তাহরীকে জাদীদের পক্ষ থেকে যে-সব পুস্তক প্রকাশ করা হয়:

১. আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম
২. The Truth About The Split
৩. ইনকিলাব-এ-হাকীকী
৪. Album Showing Progress of Ahmadiyy Community Outside India (1939)
৫. তফসীরে কবীর, তৃতীয় খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৪০
৬. স্যায়রে রুহানী (১৯৪১)
৭. নেযামে নও (১৮৪৩)

তাহরীকে জাদীদের ১০ বছরের এক ঝলক

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাহরীকে জাদীদের প্রথম ১০ বছরের সেবার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

“তাহরীকে জাদীদের প্রথম ধাপ ছিল ১০ বছরের জন্য।... এ সময়ে আল্লাহ তা’লা জামা’তকে যে কুরবানী করার তৌফিক দিয়েছেন, এর ধারণা এ থেকেও লাভ হয় যে, তিনি এ সময়ে যে চাঁদা এই তাহরীকের জন্য দিয়েছেন তা সর্বমোট প্রায় ১৩-১৪ লক্ষ রূপি। উক্ত অর্থ থেকে একদিকে দশ বছরে প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করেছি, অন্যদিকে আল্লাহ তা’লার কৃপায় একটি রিজার্ভ ফান্ডও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আর সেই রিজার্ভ ফান্ডের আনুমানিক ২৮০ মুরাব্বা (২৫ একর সমান ০১ মুরাব্বা) জমিন রয়েছে। এছাড়া এখনও ১০০ মুরাব্বা জমি এমন আছে যা থেকে কিছু অংশ ক্রয় করার এখনও সময় আসে

নি। কিছুটা তো ক্রয় করা হয়েছে, তবে তা ধারে নেওয়া হয়েছে। সেটি যদি এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮০ মুরাব্বা।

এখন পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদের অধীনে আমাদের মোবাল্লেগ জাপানে গেছেন, তাহরীকে জাদীদের অধীনে চীনে মোবাল্লেগ গেছেন, সিঙ্গাপুরে গেছেন আর এই তাহরীকের অধীনে আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় স্পেন, ইতালি, হাংগেরি, পোল্যান্ড, আলবানিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং আমেরিকাতেও গেছেন আর এ-সকল মোবাল্লেগদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় শতসহস্র লোক আহমদীয়া মুসলিম জামা’তে দীক্ষা নিয়েছেন এবং লক্ষ লক্ষ লোক জামা’তের পরিচয় লাভ করেছেন।”

(আল-ফযল, ২৮ নভেম্বর ১৯৪৪, পৃ. ০১-০২)

দ্বিতীয় স্তরের সূচনা

১৯৪৪ সালের মে মাসে দ্বিতীয় স্তরের সূচনা করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) দ্বিতীয় স্তরের মুজাহিদদের জন্য তিনটি শর্ত নির্ধারণ করেন।

১. চাঁদা এক মাসের আয়ের সমপরিমাণ হতে হবে।
২. তারা উনিশ বছর পর্যন্ত চাঁদা দিয়ে যাবে এবং আয় অনুযায়ী প্রতি বছর চাঁদা বৃদ্ধি করতে থাকবে।
৩. আয় বন্ধ হলে বা চাকুরি থেকে অবসর নিলে দ্রুত তাহরীকে জাদীদ অফিসকে অবহিত করতে হবে। অফিস তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবে।

(আল-ফযল, ২৮ নভেম্বর ১৯৪৪, পৃ. ০১-০২)

ফযলে উমর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

১১ মে ১৯৪৪ সালে তাহরীকে জাদীদের ফান্ড থেকে কাদিয়ানে ফযলে উমর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি রাখা হয় এবং ১৯৪৬ সালের ১৯ এপ্রিল মাসে হিন্দুস্থানের বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার শান্তিসরূপ ভাটনাগর এর শুভ উদ্বোধন করেন। ইনস্টিটিউটটি তিন বছরের কম সময়ের মধ্যে বিদেশ থেকে ল্যাবরেটরীর মূল্যবান জিনিসপত্র সংগ্রহ করার পাশাপাশি বিজ্ঞানের সব গ্রহণযোগ্য ও নতুন সাহিত্যসম্বলিত একটি আদর্শ গ্রন্থাগার তৈরি করে দেখায়।

লাহোরের “ইনকিলাব” পত্রিকায় ১৯৪৬ সালের ২০ এপ্রিল তারিখে দিল্লী-কলকাতার দৈনিক “স্টেইসমিন” (১৯৪৬ সালের মে মাসে) এবং লন্ডনের বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা NATURE-এ ১৯৪৬ সালের ০৮ জুন সংখ্যায় ফযলে উমর রিসার্চ ইনিষ্টিটিউটের শুভ সূচনার সংবাদ অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রকাশ করে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের ঐক্যের জন্য আহমদীয়া জামা’তের এই মহান প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে।

হিলফুল ফুযূল সংঘ পুনরুজ্জীবিতকরণ

১৯৪৪ সালের ১২ জুলাই হযূর (রা) ঐশী এলহামের ভিত্তিতে হিলফুল ফুযূল সংঘ পুনরুজ্জীবিত করেন। এ বিষয়ে তিনি (রা.) বলেন:

“এটি একটি সংঘ ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর জন্মের পূর্বে এই সংঘের উদয় ঘটে। এই সংঘে অংশগ্রহণকারী এমন তিনজন উদ্ভীষ্ট ব্যক্তি ছিলেন যাদের নামের মাঝে ফযল শব্দ ছিল। তাই এই সংঘকে হিলফুল ফুযূল নামে অভিহিত করা হয়। এই সংঘের অঙ্গীকার ছিল— আমরা বঞ্চিতের অধিকার উদ্ধার করার ক্ষেত্রে সহায়তা করব আর কেউ অত্যাচার করলে আমরা তাকে বাধা প্রদান করব।”

তাহরীকে জাদীদের ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

১৯৩৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় যা ১৯৪৫ সালের ১০ আগস্ট পর্যন্ত চলমান থাকে। এ সময় ছয় বছর পর্যন্ত বিদেশে কোন মিশন খোলা সম্ভব হয় নি। আবার যে-সব মিশন যুদ্ধের পূর্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তারাও নিজেদের কর্মকাণ্ডের গণ্ডি সীমিত করতে বাধ্য হয়।

প্রসিদ্ধ ভাষায় প্রবন্ধ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) যুদ্ধের সময় নিজের পরিপূর্ণ শক্তি তাহরীকে জাদীদের ভিত্তি এবং তবলীগী প্রবন্ধ প্রস্তুত করতে ব্যয় করেন। উদাহরণস্বরূপ সে-সময় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি ছাড়াও হযূর (রা.) পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ভাষা যেমন, ইংরেজী, রুশ, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, ডাচ, পর্তুগিজ ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ করান। ইংরেজি তফসীরুল কুরআনের কাজ তো কাদিয়ানেই করা হয়েছিল। বাকী ভাষায় অনুবাদ মাওলানা জালাল

উদ্দীন সাহেব শামস মোবাল্লেগ লন্ডন-এর তত্ত্বাবধানে লন্ডনে আশ্রিত সাহিত্যিকরা সম্পন্ন করেছিলেন।

হুযূর (রা.) ১৯৪৪ সালের ২০ অক্টোবর কুরআনের অনুবাদের পাশাপাশি অন্যান্য তবলীগী সাহিত্যের প্রচার ও প্রকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিম জারি করেন এবং এই উদ্দেশ্যের জন্য বারোটি বইয়ের সেট প্রস্তাব করেন যা পৃথিবীর প্রসিদ্ধ আটটি ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। এই বারোটি বইয়ের মধ্যে নয়টি হল: (১) ইসলামি নীতি-দর্শন (২) মসীহ হিন্দুস্থান মে (৩) আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম (৪) মহানবী (সা.)-এর জীবনী (৫) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী (৬) হাদীসের অনুবাদ (৭) বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্য থেকে মহানবী (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী (৮) বাইবেলের নতুন নিয়ম এবং পুরাতন নিয়মের আলোকে তওহীদ (৯) নেযামে নও। এই সেট ছিল ইউরোপের দেশসমূহের জন্য। আরবের বিষয়ে হুযূর বলেন, ‘আরও কিছু সেট প্রস্তাব করা প্রয়োজন’।

এছাড়াও হুযূর (রা.) নয়টি ভাষায় ছোট ছোট লিফলেট এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রোগ্রাম এই ক্ষিমে অন্তর্ভুক্ত করেন।

(আল-ফযল, ২৭ অক্টোবর ১৯৪৪, পৃ. ০১)

এই মহান প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যখনই ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন তবলীগী এবং আধ্যাত্মিক যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া হবে। হুযূর (রা.) বলেন:

“যুদ্ধের বিউগল তো আল্লাহ্ যখন চাইবেন তখন বাজবে। প্যারেডের বিউগল বাজানো হয়ে গেছে আর যারা ইসলামের জন্য দরদ রাখেন, তাদের মাঝে এই বিউগল অসাধারণ উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হওয়া উচিত। সময় এসে গেছে যে, যে-সব যুবক নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তারা অতি দ্রুত জ্ঞানার্জন করে এমন যোগ্য হয়ে যান, তাদেরকে যেন ইসলামের যুদ্ধে এমনভাবে নামিয়ে দেওয়া যেভাবে চুলায় কাঠ দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে সেই সেনাপতিই সফল হতে পারে যে সেনাপতি যুদ্ধের আগুনে যুবকদেরকে নামিয়ে দিতে সামান্যও দয়া অনুভব করবে না। যেভাবে একটি তরকারি রান্না করার সময় আমগাছ এবং অন্যান্য গাছের শুকনা পাতা চুলায় দিতে কারও হৃদয়ে যেভাবে সামান্য পরিমাণও দয়ার সৃষ্টি করে না, এভাবেই যুবকদের এই

যুদ্ধে নামিয়ে দিতে হবে। চুলায় যদি পাতা না দিয়ে চানা সিদ্ধ করা সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরনের কুরবানী ছাড়া ইসলামের বিজয় কীভাবে সম্ভব হবে?”

অতএব এই যুদ্ধে সেই সেনাপতি বিজয়ের মুখ দেখবে যে একথা চিন্তা করবে না যে, মায়েদের বুকে ছুরি চালানো হচ্ছে বরং যুবকদেরকে সে কুরবানীর উদ্দেশ্যে অগ্নে প্রেরণ করবে। মৃত্যু তার হৃদয়ে কোন দয়ামায়া সৃষ্টি করবে না। তার সামনে একটিই উদ্দেশ্য থাকবে আর তা হল, সে দুনিয়াতে ইসলামের পতাকা গাড়বে এবং পাষণ্ড হৃদয় হয়ে নিজ কাজ সম্পাদন করতে থাকবে। যে-দিন মায়েরা এটি বুঝবে যে, আমাদের সন্তান যদি ধর্মের পথে নিহত হয় তাহলে আমাদের বংশ জীবিত হয়ে যাবে। যে-দিন আপনারা একথা বুঝতে পারবেন যে, আমাদের সন্তান যদি শহীদ হয়ে যায় তাহলে সে প্রকৃত জীবন লাভ করবে আর আমরাও সত্যিকার জীবন লাভ করব, তবে সেই দিনই মহানবী (সা.)-এর ধর্ম নবজীবন লাভ করবে।

(খুতবা জুমুআ, ০৫ মে ১৯৪৪)

বহির্বিশ্বে তবলীগ এবং বিশেষ শিক্ষার জন্য ওয়াকেফীনদের গুরুত্বপূর্ণ বাছাইকরণ

১৯৪৫ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি তাহরীকে জাদীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। সে-দিন হুযূর ২২জন ওয়াওকফীনকে বহির্বিশ্বে প্রেরণ এবং ০৯জন ওয়াকেফীনকে তফসীর, হাদীস, ফিকাহ, এবং দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষার জন্য মনোনীত করেছিলেন যেন তারা জামা’তে আহমদীয়ার বুয়ুর্গ ওলামাদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। হুযূর (রা.) যে-সকল ওয়াকেফীনদের বহির্বিশ্বে প্রেরণের জন্য মনোনীত করেছিলেন তাদের নাম নিম্নরূপ:

(আরব দেশসমূহে) মৌলভী রশীদ উদ্দীন সাহেব চুগতায়ী, চৌধুরী শরিফ আহমদ সাহেব।

(ইরানে) মৌলভী সদর উদ্দীন সাহেব, শেখ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব।

(স্পেনে) মৌলভী করম এলাহী সাহেব জাফর, চৌধুরী মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব সাকী।

(দক্ষিণ আমেরিকায়) মৌলভী মুনাওয়ার আহমদ সাহেব, চৌধুরী গোলাম রসুল সাহেব।

(ইতালিতে) মৌলভী মুহাম্মাদ উসমান সাহেব, মুহাম্মাদ ইব্রাহীম সাহেব খলিল ।

(জার্মানিতে) মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেব, শেখ নাছের আহমদ সাহেব, মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব বশীর ।

(ইংল্যান্ডে) চৌধুরী মুশতাক আহমদ সাহেব বাজওয়াহ, চৌধুরী যহর আহমদ সাহেব বাজওয়াহ, হাফেজ কুদরত উল্লাহ সাহেব ।

(উত্তর আমেরিকায়) চৌধুরী খলিল আহমদ সাহেব নাসের, চৌধুরী গোলাম ইয়াসিন সাহেব, মির্যা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব ।

(ফ্রান্সে) মালেক আতাউর রহমান সাহেব, মৌলভী আব্বাহ্ দিত্তা সাহেব ।

এছাড়া বিশেষ শিক্ষা অর্জনের জন্য নিম্নে বর্ণিত ওয়াকেফীনদের নির্বাচন করা হয়

- * মৌলভী নুরুল হক সাহেব (তফসীর)
- * জনাব মালেক সাইফুর রহমান সাহেব (ফিকাহ)
- * মৌলভী মোহাম্মদ আহমদ ছিদ্দীক সাহেব (হাদীস)
- * মৌলভী মোহাম্মদ আহমদ সাহেব খলিল (হাদীস)
- * মৌলভী মোহাম্মদ আহমদ সাহেব সাকের (ফিকাহ)
- * মৌলভী গোলাম বারী সাহেব (হাদীস)
- * হেকীম মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (যুক্তি ও দর্শন বিদ্যা)
- * হাফেজ বশীর উদ্দিন আব্দুল্লাহ সাহেব (তফসীর)
- * মালেক মোবারক আহমদ সাহেব (যুক্তি ও দর্শন বিদ্যা)

পরবর্তীতে মৌলভী খুরশিদ আহমদ সাহেব শাদকেও এই দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাকে হাদীস শিক্ষার বিশেষ নির্দেশ দেন ।

উল্লিখিত ওয়াকেফীন ১৯৪৭ সালের মে মাসে পাস করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) স্বয়ং ১৯৪৭ সালের ০৬ জুনের খুতবায় তাদের বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন:

“আমি কয়েক বছর যাবৎ ভাবছি, জামা’তের পুরানো আলেমগন মারা যাচ্ছেন। এর ফলে জামা’ত যেন কোন সমস্যার সম্মুখীন না হয় এবং জামা’তের কাজের মান যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব এ উদ্দেশ্যে আমি আজ থেকে তিন চার বছর পূর্বে আলেম বানানোর কাজ শুরু করি। কিছু যুবককে আমি মৌলভী সাহেব [হযরত মওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মাদ সারোয়ার শাহ সাহেব (রা.)]-এর কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করার জন্য পাঠিয়েছি এবং কিছু বাইরে প্রেরণ করেছি যেন তারা দেওবন্দ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ওলামাদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে আসে।”*

* নোট: এই সকল ওয়াকেফীনরা যে-সকল শিক্ষকদের থেকে শিক্ষা অর্জন করেন তাদের নাম হল:

১. মৌলভী শরীফুল্লাহ সাহেব, শিক্ষক মাদ্রাসা ফতেহপুরী। (মুসলিম শরীফ)

২. শাইখুল হাদীস মৌলভী মোহাম্মাদ ইব্রাহিম সাহেব, বালিয়ানবি মাদ্রাসা ফতেহপুরী দিল্লী। (বুখারী আদাবিয়া, উসুলে শাশি মুসলিম আল রুয়ুত)

৩. মৌলভী মুফতি মোহাম্মাদ মুসলিম সাহেব দেওবন্দি, শাইখুল হাদীস জামেয়া ডাভিল।

৪. মৌলভী হাফেজ মেহের মোহাম্মদ সাহেব, আল-মাদ্রাসাতুল হানাফিয়া আসরা লাহোর। (মুসলিম শরীফ)

৫. মৌলভী শিহাবুদ্দীন সাহেব, খতীব মসজিদ চোবরজি, লাহোর।

৬. মৌলভী রসুল খান সাহেব, প্রিন্সিপাল ওরিয়েন্টাল কলেজ শাইখুল তফসীরুল ফিকাহ জামেয়া আশরাফীয়া, লাহোর। (হাদীস ও উসুলে ফিকাহ)

৭. মৌলভী মোহাম্মদ বকস সাহেব, দেওবন্দি লাহোর। (হাদীস)

সেই সমস্ত ওয়াকেফীনদের ফিরে আসার পর হযরত আকদাস (রা.) অন্য ওয়াকেফীনদের পড়ানোর জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করেন। তিনি (রা.) বলেন; যারা ফিকাহ পড়েছেন তারা ফিকাহ পড়াবেন আর যারা হাদীস পড়েছেন তারা হাদীস পড়াবেন। অতএব পহেলা রমজান ১৩৬৬ হিজরি অনুযায়ী ১৯ জুলাই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পড়াশুনার ধারা চলমান ছিল। এরপর ওয়াকেফীনদের একমাসের ছুটি দেওয়া হয় আর সেই সময় দেশ বিভক্ত হয় এবং তাদেরকে হিজরত করে পাকিস্তানে আসতে হয়।



ডান থেকে বামে চেয়ারে উপবিষ্ট: মৌলভী আহমদ সাকেব, মৌলভী আবুল মুনির নূরুল হক, মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেব ভাওয়ালপুরী, মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব, মৌলভী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব। ডান থেকে বামে দাঁড়ানো অবস্থায়: মোবারক আহম সাহেব, মৌলভী খুরশিদ আহমদ সাহেব শাদ, গোলাম বারী সাহেব, হাকীম মোহাম্মদ ইসমাজিল সাহেব, হাফেজ বশীরুদ্দীন আব্দুল্লাহ সাহেব প্রমুখ।

পারিবারিক ওয়াকফের তাহরীক

১৯৪৫ সালের ০৫ জানুয়ারি হযরত আমীরুল মু‘মিনীন বলেন: “তাহরীকে জাদীদের প্রথম ধাপে আমি শর্ত আরোপ করেছিলাম। এখন দ্বিতীয় ধাপে আমি স্থায়ীভাবে আহ্বান জানাচ্ছি যে, যেভাবে প্রত্যেক আহমদীর জন্য চাঁদা দেওয়া আবশ্যিক, ঠিক সেভাবে প্রত্যেক পরিবার নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিন যে, আপনারা আপনাদের পরিবারের কোন একজনকে অবশ্যই ধর্মসেবার লক্ষ্যে ওয়াকফ করবেন।”

(আল-ফযল, ১০ জানুয়ারি ১৯৪৫ সাল)

তাহরীকে ‘ওয়াকফে তেজারাত’

১৯৪৫ সালের ০৫ অক্টোবর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ওয়াকফে তেজারাতের তাহরীক করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসার মাধ্যমে

তবলীগী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রেক্ষিতে হুযূর (রা.) বলেন, “ঐ সকল যুবক যারা সেনাবাহিনী থেকে অবসরে যাবেন এবং ঐ সকল যুবক যারা নতুন যুবক হয়েছেন এবং এখনও পর্যন্ত কোন কাজ শুরু করেন নি, আমি তাদেরকে বলব, তারা যেন তাদের জীবন ওয়াকফ করে। এরূপে নয় যে, আমাদেরকে ধর্মের জন্য যেখানে ইচ্ছা প্রেরণ করুন আমরা চলে যাব বরং এরূপে যে, আমাদেরকে যেখানে প্রেরণ করা হবে আমরা সেখানে চলে যাব এবং সেখানের জামাতের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবসা করব। আর এভাবে আমাদের মোবাল্লেগগণ সমস্ত হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়বেন। তারা ব্যবসার পাশাপাশি তবলীগ করবে।”

(আল-ফযল, ১১ অক্টোবর ১৯৪৫, পৃ. ০৬)

যুদ্ধের সমাপ্তি এবং তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদদের যাত্রা

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, “তাহরীকে জাদীদের সূচনা যে-সকল উদ্দেশ্য নিয়ে খোদার অলৌকিক শক্তিতে হয়েছিল যে-কারণে আমি মনে করতাম, তাহরীকে জাদীদের প্রথম যুগ শেষ হবার পর খোদা তা’লা এমন উপকরণ সরবরাহ করবেন যে, তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যগুলো পূর্ণ করতে যে-সকল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে খোদা তা’লা তা দূর করে দেবেন এবং তবলীগের জন্য উপকরণ সরবরাহ করবেন।”

(আল-ফযল, ২৯ আগস্ট ১৯৪৪, পৃ. ০২)

অতঃপর ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান অস্ত্রসমর্পণ করে এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তখন যেহেতু তবলীগের পথ উন্মুক্ত হতে শুরু করে তাই তাহরীকে জাদীদের মুজাহিদগণকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো আরম্ভ হয়। সেই বছর ১৬জন মোবাল্লেগকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়, যার মধ্য থেকে নয় জন মুজাহিদদের একটি দলকে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লন্ডনে প্রেরণ করা হয়। তারা লন্ডনে কিছুদিন প্রশিক্ষণ নেবার পর ইউরোপে দুটি মিশন খোলেন। এই কাফেলাতে ছিলেন নিম্নলিখিত মোবাল্লেগ প্রমুখ:

- (১) চৌধুরী জহুর আহমদ সাহেব বাজওয়া।
- (২) হাফেজ কুদরত উল্লাহ সাহেব।
- (৩) মালেক আতাউর রহমান সাহেব।

- (৪) চৌধুরী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব।
- (৫) চৌধুরী করম এলাহী সাহেব জাফর।
- (৬) চৌধুরী মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব সাকী।
- (৭) মৌলভী মুহাম্মাদ উসমান সাহেব।
- (৮) মাস্টার মুহাম্মাদ ইব্রাহীম সাহেব খলীল।
- (৯) মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব বশীর।

(আল-ফযল, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৫, পৃ. ০১-০২)

তাহরীকে জাদীদের রেজিস্ট্রেশন

১৯৪৬ সালের ১৮ অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয় এবং এই তারিখ থেকে এর পুরো নাম রাখা হয় “তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া”। তাহরীকে জাদীদের আরটিকেল্‌স এন্ড মেমোরেণ্ডাম জনাব শেখ বশীর আহমদ সাহেব অ্যাডভোকেট লিখেছেন। বোর্ড অফ ডাইরেক্টর-এর প্রাথমিক মেম্বর হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনীত করা হয়:

(১) মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আনোয়ার, ইনচার্জ, অফিস তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান।

(২) মৌলভী বাহা-উল হক সাহেব এম.এ., উকিলুস সানা’আত ওয়াল হিরফাত, তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান।

(৩) খাজা আব্দুল কাদের সাহেব বি.এল.এ.সি., উকিলুত তেজারাত, তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান।

(৪) হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ সাহেব, প্রিন্সিপাল, তা’লীমুল ইসলাম কলেজ কাদিয়ান।

(৫) মৌলভী আব্দুল গণী সাহেব, উকিলুত তবশীর (এশিয়া ও আফ্রিকা), তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান।

(৬) খান বাহদুর নওয়াব চৌধুরী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার।

(৭) শেখ বশীর আহমদ সাহেব বি.এ., এল.এল.বি, উকিল লাহোর।

(৮) মাওলানা জালাল উদ্দীন সাহেব শামস, উকিলুত তবশীর (ইউরোপ, আমেরিকা), তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান।

(৯) চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেব, উকিলুল মাল তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান।

(১০) হযরত মৌলভী জুলফিকার আলী খান সাহেব, উকিলুত তাবা’আ, তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান।

(রেজুলেশন তাহরীকে জাদীদ, ১৬ মার্চ ১৯৪৭)

‘মজলিসে তাহরীকে জাদীদ’ প্রতিষ্ঠা

১৯৪৭ সালের ১৭ মে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নির্দেশে ‘মজলিসে তাহরীকে জাদীদ’ প্রতিষ্ঠা করা হয় যার কাজ ছিল তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কিত বিষয়ে একে-অপরের পরামর্শে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং তা হুযূর (রা.)-এর কাছে অনুমতির জন্য প্রেরণ করা। ১৯৪৭ সালের ১৬ মার্চ হুযূর আকদাস (রা.)-এর আদেশে এই মজলিসে তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত হন মৌলভী জালালুদ্দীন সাহেব শামস সাহেব এবং সেক্রেটারি হন মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আনোয়ার।

বিশেষ ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ

১৯৪৭ সালের ৩০ আগস্ট হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাহরীকে জাদীদের বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তিকে মনোনীত করে দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন: “আমি ১৯৪৮ সালের পহেলা মার্চ পর্যন্ত মৌলভী নুরুল হক সাহেব, চৌধুরী মুহাম্মদ ফায়েল সাহেব কাদিয়ান এবং স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবকে তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানের সদস্য নিযুক্ত করছি।”

ভারত বিভক্ত হওয়া এবং তাহরীকে জাদীদ

১৯৪৭ সালে জামা’তের অধিকাংশ সদস্যকে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে হিজরত করে পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে হয়। এ সময়টি তাহরীকে জাদীদের জন্য অনেক ধৈর্যের পরীক্ষার কারণ ছিল কেননা দেশ বিভাগের কারণে ব্যবস্থাপনা ওলট-পালট হয়ে যায়। এই অবস্থায় লাহোরে তাহরীকে জাদীদের অফিসগুলোকে স্থানান্তর করা হয়। তাহরীকে জাদীদের আয়েও অনেক ঘাটতি দেখা দেয় এবং খরচ অনেক বেড়ে যায় আর বিদেশের মিশনগুলোতে সাহায্য পাঠানোর কার্যক্রম কিছুকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু এ সময় তাহরীকে জাদীদের

মুজাহিদগণ অসাধারণ অবিচলতা এবং বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন ফলে বিদেশের মিশনগুলো নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে যায়।

পাকিস্তানে তাহরীকে জাদীদের রেজিস্ট্রেশন

মজলিস তাহরীকে জাদীদের পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেজিস্টার সাহেব জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানী পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের নামে ১৯৪৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয় যার অনুমতি আসে ১৯৪৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মজলিসে তাহরীকে জাদীদ পাকিস্তানেও রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায়। শেখ বশীর আহমদ সাহেব (উকিল লাহোর) এবং মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আনোয়ার-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে রেজিস্ট্রেশনের কাজ আলোর মুখ দেখে।

জামেয়াতুল মোবাম্বেরীন প্রতিষ্ঠা

দেশ বিভাগের পূর্বে কাদিয়ানে জামেয়া আহমদীয়াই একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল যেখান থেকে মোবাম্বেলগণ পাশ করে বিভিন্ন মিশনে যেতেন। পাকিস্তান হবার পর ১৯৪৯ সালের পহেলা ডিসেম্বর জামেয়া আহমদীয়ার পাশাপাশি রাবওয়াতে জামেয়াতুল মোবাম্বেরীন প্রতিষ্ঠা করা হয় যার অধিকাংশ স্টাফ ছিল ওয়াকফীনদের সমন্বয়ে গঠিত, যারা ১৯৪৭ সালে ‘উলূমে ইসলামিয়া’-এর বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, যারা জামেয়া আহমদীয়া থেকে পাশ করে বের হবেন এমনসব যুবক এবং অন্যান্য ওয়াকফে জিন্দেগীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা আর তাদের তবলীগী প্রশিক্ষণ দেওয়া। জামেয়াতুল মোবাম্বেরীন দীর্ঘ কয়েক বছর স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৫৭ সালের ০৭ জুলাই থেকে এটিকে জামেয়া আহমদীয়ার সাথে একীভূত করে দেওয়া হয়।

তাহরীকে জাদীদের স্থায়ী বিভাগসমূহের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর কর্মপন্থা

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) নিজ হাতে তাহরীকে জাদীদের বিভিন্ন বিভাগসমূহের জন্য বিস্তারিত কর্মপন্থা

পরিকল্পনা করেন। যার বর্ণনা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নিজের ভাষায় নিম্নে বর্ণনা করা হল:

ওকালাতে মাল (অর্থ বিভাগ): ১. উকিলুল মাল আউয়াল (প্রথম অর্থবিষয়ক কার্যনির্বাহক), ২. উকিলুল মাল সানী (দ্বিতীয় অর্থবিষয়ক কার্যনির্বাহক), ৩. ওকালাতে জায়েদাদ (সম্পত্তি বিষয়ক কার্যনির্বাহক)।

উকিলুল মাল আউয়াল হবেন চৌধুরী বরকত আলী সাহেব, উকিলুল মাল সানী হবেন কুরাইশি আব্দুর রশীদ সাহেব। উকিলুল মাল সালেস (তৃতীয় অর্থবিষয়ক কার্যনির্বাহক) নির্বাচিত করা হবে। তার কাজ হবে বাজেট তৈরি করা, এর দেখাশুনা করা, অর্থ জমা করা ইত্যাদি।

ওকালাতে দিওয়ান (প্রাতিষ্ঠানিক নথি ও রেকর্ড সংরক্ষণ বিষয়ক বিভাগ): এই বিভাগের মূল কাজ করবেন এ বিভাগের সেক্রেটারি। তার কাজ হল, মিটিং আহ্বান করা, মিটিংয়ের কার্য রেকর্ড রাখা, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায়ে রাখা এবং দাপ্তরিক মিটিং আহ্বান করা। অর্থাৎ মজলিসে ওকালত ছাড়া যখনই প্রয়োজন হবে, যখনই কাজের মাঝে ত্রুটি দেখা দিবে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাঝে ত্রুটি দেখা দিবে অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনা করার প্রয়োজন পড়বে তখন একের অধিক বিভাগের সদস্যদের ডেকে এমন ক্ষিম তৈরি করাতে হবে যার মাঝে একের অধিক উকিল (কার্যনির্বাহক) একত্র হবার প্রয়োজন হবে। ওকালাতগুলোর জন্য কর্মী নেবার সিদ্ধান্ত নিবে যে, এতজন প্রয়োজন হবে, এই সময়ের পর তাদের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং প্রয়োজন হলে নতুন লোক নেওয়া এবং তাদের তা’লীম-তরবিয়ত করা। এই ওকালাতের একজন নায়েব উকিলুদ দিওয়ান হবে যার ওপর কাজের একটি অংশ ন্যস্ত করা হবে। এই বিভাগের অধীনে দুইজন অফিসার থাকবেন, (১) মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আনোয়ার (পুরোনো অভিজ্ঞতার কারণে, অন্যথায় এর জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তা তার মাঝে নেই।) দ্বিতীয় উকিল (কার্যনির্বাহক) আমি নির্ধারণ করব। নায়েব উকিল হবেন মুহাম্মদ শরীফ খালেদ সাহেব।

ওকালাতে তা’লীম (শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ): এই বিভাগের কাজ শিক্ষার জন্য পাঠ্যসূচি তৈরি করা। কলেজের নিগরানী করা। সময় উপযোগী শিক্ষার কোর্স তৈরি করা, যেন মোবাল্লেগদের শিক্ষার উন্নতি অব্যাহত থাকে। এই বিভাগের কাজ হল, অতি দ্রুত ওলামাদের সাথে পরামর্শ করা।

প্রথমত: কলেজে শিক্ষার কোর্স এবং ক্লাস গুরুত্ব ব্যবস্থা করবেন।

দ্বিতীয়ত: দেহাতী (গ্রাম্য) মোবাল্লেগদের প্রশিক্ষণের জন্য কোর্সের ব্যবস্থা করবেন।

তৃতীয়ত: মোবাল্লেগদের ইংরেজিতে পারদর্শী করতে প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করবেন।

চতুর্থত: এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, মোবাল্লেগদের সারা জীবনে কতটি কোর্স পাশ করানো প্রয়োজন এবং তা কী কী ধরনের অর্থাৎ মূল শিক্ষার বাইরে ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, তবলীগী, রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এবং পরবর্তীতে তাদের কোর্স নির্ধারণ করবেন এবং কোর্সের ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য পূর্ব থেকেই কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পঞ্চম: দেহাতী (গ্রাম্য) মোবাল্লেগদের জন্য সিলেবাস প্রস্তুত করবেন আর সিলেবাস প্রস্তুত করাবেন। তাদের সারা জীবনের উন্নতির জন্য কোর্সের পরিকল্পনা করবেন। এই কাজের জন্য মিয়া আব্দুর রহিম আহমদ সাহেবকে নির্ধারণ করা হল।

ওকালাতে তেজারাত (ব্যবসা-বানিজ্য বিষয়ক বিভাগ): এই বিভাগের কাজ হল: (১) ব্যবসার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করা। (২) মুদ্রা বিনিময়ের নিয়মাবলি একত্র করা। (৩) আমদানিরগুণি এবং ব্যবসার নিয়মকানুন সরবরাহ করা এবং জামা’তের জন্য কল্যাণকর তথ্য একত্রিত করা। (৪) জামা’তের ব্যবসার উন্নতির জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা। (৫) জামা’তের ব্যবসার নিগরানী এবং উন্নতি। (৬) ব্যবসার মাধ্যমে জামা’তের আয় বৃদ্ধি করা। (৭) পৃথিবীর সকল জামা’তের সদস্যদের ব্যবসায়িক শৃঙ্খলে ঐক্যবদ্ধ করা। মোটকথা ব্যবসায়িকভাবে সারা পৃথিবীর আহমদীদেরকে এক করা তার কাজ হবে। বিস্তারিত স্কিম এই বিভাগের নায়েম প্রণয়ন করবে আর মজলিসে ওকালাতের পরামর্শের পর আমার পরামর্শ নিবে। এ কাজে আব্বাস আহমদ খানকে নিয়োগ দেওয়া হল।

ওকালাতে সানা’আত (শিল্প বিষয়ক বিভাগ): এই ওকালাতের কাজ হল, জামা’তের শিল্প ও উপার্জনের উন্নতি, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, দক্ষ কারিগর প্রস্তুত করা, পৃথিবীর সকল জামা’তের মাঝে শৈল্পিক সম্পর্ক

তৈরি করা। রিসার্চ ইনিষ্টিটিউটের নিগরানী করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ওকালাতের জন্য মির্যা মোবারক আহমদ সাহেবকে নিয়োগ দেওয়া হল।

ওকালাতে কানুন (নীতিনির্ধারণী বিষয়ক বিভাগ): এই বিভাগের কাজ ইনকাম ট্যাক্সেও নিগরানী, বাহিরের জামা’তসমূহের জন্য কাজের সঠিক নিয়ম তৈরি করা যেন সকল জামা’ত একটি নির্ধারিত ব্যবস্থাপনার অধীনে চলতে পারে। আইনানুগ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া, মজলিসের সকল কর্মকাণ্ড সঠিক নিয়মে চালানো, নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুনের শব্দাবলি ঠিক করা, এই বিভাগের কাজ চৌধুরী গোলাম মুর্তজা সাহেব এবং চৌধুরী বাহাউল হক সাহেবের ওপর ন্যস্ত করা হল। যদিও চৌধুরী গোলাম মুর্তজা সাহেব এখন বাইরে আছেন, কিন্তু তিনি এখানে আসা-যাওয়া করেন। তাকে এখন থেকে এই বিভাগের জন্য নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মজলিসে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এর দুজন উকিল (তথা কার্যনির্বাহক) হবেন: (১) চৌধুরী বাহাউল হক সাহেব। (২) চৌধুরী গোলাম মুর্তজা সাহেব।

ওকালাতে তবশীর (বহির্বিশ্বে তবলীগ বিষয়ক বিভাগ): এই বিভাগ বৈদেশিক মিশনগুলো নিয়ে কাজ করবে। তাদের জন্য কাজের পরিকল্পনা করা, তাদের অফিসসমূহের নিয়মকানুন প্রস্তুত, পরিবর্তন এবং বাস্তবায়ন করা। প্রবন্ধ সরবরাহ করা, লাইব্রেরির ব্যবস্থা করা, তাদের কাজের নিগরানী করা, কাজের প্রসার বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা, নতুন মিশনের পরিকল্পনা, বিভিন্ন দেশে মসজিদ নির্মাণ, স্কুল নির্মাণ ইত্যাদি। এর প্রধান হবেন দুজন অর্থাৎ মৌলভী আব্দুল গণী খান সাহেব এবং অপর একজন। মূলত এর একজন উকিল (তথা কার্যনির্বাহক) এবং চারজন নায়েব উকিল হবেন। যাদের অধীনে পাকিস্তানের মোবাল্লেগদের, আফ্রিকা এবং ইসলামি বিশ্বের মিশন, ইউরোপ ও আমেরিকার মিশন, এশিয়ার দেশসমূহের মিশনগুলোর দায়িত্ব থাকবে। উকিলুত তবশীর এর তদারকি করবেন।

এই বিভাগের দায়িত্ব হল, চিঠি এবং লেখালেখির মাধ্যমে তবলীগের কাজ করানো। প্রবন্ধের উপযুক্ত বস্টনের মাধ্যমে তবলীগের কাজও হবে যার দায়িত্ব প্রত্যেক এলাকার নায়েবের ওপর থাকবে।

ওকালাতে ইশায়াত (প্রকাশনা বিভাগ): এই বিভাগের কাজ হল পত্র-

পত্রিকার তদারকি করা, প্রোগ্রামের অধীনে খবর প্রকাশ করা, প্রবন্ধ প্রস্তুত করানো এবং এটিকে আয়ের মাধ্যম বানানো। এর জন্য লেখক দ্বারা সমন্বিত একটি কর্মীবাহিনী দেওয়া হবে যার কাজের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকবে। আর সকল বিভাগের কর্মী এ দিক দিয়ে এর অধিনস্ত হবে যে, এ বিভাগ তাদের সবার দ্বারা কিছু না কিছু সাহিত্যের কাজ করাবেন।

সকল বিভাগকে দুই মাসের মধ্যে নিজেদের আগামী বছরের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং এর পরের তিন মাসে পরবর্তী তিন বছরের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এরপর ত্রৈমাসিক চার্ট তৈরি করে নিজেদের কক্ষে লাগিয়ে রাখতে হবে এবং প্রত্যেক তিন মাস অন্তর রিপোর্ট প্রেরণ করা উচিত যে, তারা কি তাদের প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেছে?

এই বিষয়গুলো মজলিসে ওকালাত রেজুলেশন আকারে পাশ করাবেন এবং এই রেজুলেশনও করবেন যে, ভবিষ্যতে কোন অপরাধ বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়া হবে না। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে মজলিসে ওকালাত বা তার মনোনীত কমিশন এই সিদ্ধান্ত নেবেন যে, ভুল হয়েছে নাকি হয় নি এবং যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তিস্বরূপ এক দিনের ওযিফা থেকে শুরু করে সারা মাসের ওযিফা কর্তন করা হতে পারে। কোন উকিল বা কর্মীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতি হলে তার কাছ থেকে সমপরিমাণ অর্থ উসূল করা হবে। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে ওয়াকফ রহিত বা বাতিলের শাস্তি দেওয়া হবে। মোটকথা কোন অপরাধ শাস্তি না দিয়ে উপেক্ষা করা হবে না। তবে যুগ-খলীফার কাছে ক্ষমার আবেদন করা যেতে পারে যিনি ক্ষমা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(রেজুলেশনের অনুলিপি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০)

মজলিসে মুশাওয়ারাতে তাহরীকে জাদীদের বাজেট

পূর্বে মজলিসে মুশাওয়ারাতে কেবল সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বাজেট উপস্থাপন করা হতো কিন্তু ১৯৫১ সাল থেকে তাহরীকে জাদীদের বাজেটও উপস্থাপন করা শুরু হয়।

ওয়াকফে জিন্দেগী সম্পর্কিত নতুন নিয়মকানুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯৫২ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ওয়াকফ করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে:

১. একের অধিক সন্তানদের মধ্যে কোন এক জনকে ওয়াকফ করা। আমরা অন্যদের পথ বন্ধ করতে চাই না। সন্তানরাও ওয়াকফ করতে পারে কিন্তু এমন নিয়ম অবশ্যই থাকা উচিত যেন প্রয়োজনের সময় তাদেরকে সহজে স্বাধীন করে দেওয়া যায়।

২. ওয়াকফকারী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হবেন। ভবিষ্যতে একুশ বছর হবার আগে ওয়াকফ গ্রহণ করা হবে না। আবার যারা ইতোমধ্যে ওয়াকফ করে ফেলেছেন তাদেরকেও মুক্ত করে দেবার পথ খোলা রাখা হবে যেন ওয়াকফ সন্তানের হয়, পিতার নয় এবং লোক দেখানো যেন না হয় বরং প্রকৃত ওয়াকফ যেন হয়।

৩. একুশ বছর হবার পূর্বে যাদেরকে ভাতা দেওয়া হয় যেমন জামেয়া আহমদীয়া ইত্যাদিতে অধ্যয়নরতদের দেওয়া হয়ে থাকে তা যেন কেবল ধার-স্বরূপ দেওয়া হয়, যদি সে ওয়াকফ হিসেবে থাকে তবে তা গ্রহণ করা হবে না কিন্তু যদি ওয়াকফ না থাকে তবে ঋণ বলে গণ্য হবে এবং শর্তানুসারে তা যেন আদায় করা হয়।

৪. পূর্বে যে-সকল ওয়াকফেদারদের শিক্ষার জন্য জামা'তের অর্থ ব্যয় হয়েছে, তারাও প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ফেরত দিয়ে ওয়াকফ ছাড়তে পারবেন।

৫. যে-সকল পিতামাতা তাদের সন্তানকে ওয়াকফ করতে চান, তাদেরকে ওয়াকফের আকাঙ্ক্ষীদের তালিকায় রাখুন। তারা যখন একুশ বছরে উপনীত হবে তখন তাদেরকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে— তারা নিজের জীবন উৎসর্গ করবে কিনা? তারা যদি ওয়াকফ করতে না চায় তাহলে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে, আর যদি ওয়াকফ করতে চায় তাহলে তাদের ওয়াকফ গ্রহণ করা হবে।

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৬২, পৃ. ৪৯-৫০)

রাবওয়াতে তাহরীকে জাদীদ দপ্তরের বিল্ডিং নির্মাণ

১৯৫০ সালের ৩১ মে হযরত আমিরুল মু‘মিনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) রাবওয়াতে তাহরীকে জাদীদ অফিসের জন্য স্থায়ী বিল্ডিংয়ের ভিত্তি রাখেন এবং ১৯৫৩ সালের ১৯ নভেম্বর এর শুভ উদ্বোধন করেন।

(আল-ফযল ২৭ নভেম্বর ১৯৫৩; পৃ. ০৩)

তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণের বিশেষ তাহরীক

১৯৫৩ সালের জালসা সালানার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন; “তাহরীকে জাদীদ এখন যে স্পর্শকাতর সময় পার করেছে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক আহমদীর এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করা এখন সময়ের দাবী। এমনকি কোন জামা‘তের একজন সদস্যও যেন তাহরীকে জাদীদের বাইরে না থাকে।”

(দৈনিক ‘আল-মুসলে’, করাচী ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৪, পৃ. ৪)

পুস্তক ‘পাঁচ হাজার মুজাহিদ্দীন’-এর প্রকাশ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯৩৮ সালে ঘোষণা করেন যে, তাহরীকে জাদীদে চাঁদা প্রদানকারীদের মাধ্যমে যেহেতু হযরত মসীহ মাওউদ (রা.)-এর পাঁচ হাজার সৈন্যের যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা পূর্ণ হতে যাচ্ছে, তাই তাদেরকে স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে যে:

১. ঐ তালিকাগুলো একত্রিত করে এবং সাথে তাহরীকে জাদীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখে ছাপানো হবে আর তাহরীকে জাদীদ অফিস সকল লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে এটি প্রেরণ করবে।

২. দশ বছর যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ঐ ফান্ডের আয়ের একটি অংশ চাঁদা দানকারীদের পক্ষ থেকে সদকাস্বরূপ বাৎসরিকভাবে গরিবদের জন্য ব্যয় করা হবে।

৩. কেন্দ্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এর হলরুমে সেই সমস্ত লোকদের নাম লিখে রাখা হবে।

হুযূর (রা.)-এর উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী চৌধুরী বরকত আলী খান

সাহেব অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ১৯৫৯ সালে পাঁচ হাজার মুজাহিদীনের পরিপূর্ণ একটি তালিকা প্রকাশ করেন।

চারশত ছিয়াশি পৃষ্ঠা সম্বলিত এই তালিকায় উপমহাদেশের পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, মরিশাস, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, চীন, ইরান, মিশর, স্পেন, জার্মানি, ফ্রান্স এবং আমেরিকা ইত্যাদি দেশের মুজাহিদীন এবং তাদের প্রদানকৃত অর্থের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহ মাওউদ (রা.) মুজাহিদীনে তাহরীকে জাদীদের পদমর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “বড়ই সৌভাগ্যবান তারা যারা অনেক আত্মহের সাথে তাহরীকে জাদীদে অংশ নিয়েছেন। তাদের নাম সম্মানের সাথে ইসলামের ইতিহাসে লেখা থাকবে এবং খোদা তা’লার সমীপে এই সকল লোক বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবে, কেননা তারা কষ্ট সহ্য করে ধর্মকে সুদৃঢ় করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন আর খোদা তা’লা নিজেই তাদের সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক হবেন এবং তাদের হৃদয় থেকে ঐশী নূর টগবগ করে বের হতে থাকবে আর পৃথিবীকে আলোকিত করতে থাকবে।”

(তাহরীকে জাদীদের পাঁচ হাজার মুজাহিদীন, পৃ. ১৫)

তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন চাঁদার হার

গুরুত্রে হযূর (রা.) তাহরীকে জাদীদের মালী জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সর্বনিম্ন পাঁচ রূপি নির্ধারণ করেন কিন্তু ১৯৬৪ সালের ১৮ মার্চ হযূর (রা.)-এর অনুমতি ক্রমে সর্বনিম্ন দশ রূপি নির্ধারণ করা হয়।

ইংরেজি ভাষায় তফসীরে কুরআন-এর সমাপ্তি

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর অনুমোদনক্রমে ইংরেজি ভাষায় তফসীরে কুরআন-এর কাজ স্থায়ীভাবে তাহরীকে জাদীদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। কামরুল আশ্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ১৯৬৩ সালে মুশাওয়ারাতের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন:

“আমি বন্ধুদেরকে সুসংবাদ দিতে চাচ্ছি যে, কুরআন মজিদের ইংরেজি

তফসীর যা আজ থেকে একুশ বছর পূর্বে শুরু করা হয়েছিল এবং যার প্রথম অংশে আমার খেদমত করার সুযোগ হয়েছিল আর হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব এই কাজ করেছেন। দারদ সাহেব মরহুমও এই কাজ করেছেন। সব থেকে বেশি কাজ মালেক গোলাম ফরিদ সাহেবের ওপর ছিল এবং এখন সম্পূর্ণ দায়িত্বই তার ওপর। এই তফসীরের শেষ অংশ যা বাকি ছিল তা এখন সম্পন্ন হয়েছে এবং একইভাবে খোদা তা'লার ফযলে এই কাজ পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে।”

(রিপোর্ট: মজলিসে মুশাওয়ারাত ১৯৬৩, পৃ. ০৯-১০)

মাসিক তাহরীকে জাদীদ

১৯৬৫ সালের আগস্ট থেকে মৌলভী নূর মোহাম্মদ সাহেবের অধীনে ‘তাহরীকে জাদীদ’ প্রকাশিত হয় যেটি ছিল তাহরীকে জাদীদের মুখপত্র।

তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় স্তরের প্রকাশনা

সেই যুগে তাহরীকে জাদীদ অফিসের পক্ষ থেকে নিম্নে বর্ণিত সাহিত্য প্রকাশ করা হয়:

১. ইসলাম কা ইকতেসাদী নেজাম (১৯৪৫)
২. তফসীরের কবীরের চতুর্থ খণ্ড ও সপ্তম খণ্ডের প্রথম অংশ (১৯৪৫)
৩. তফসীরে কবীরের দ্বিতীয় অংশ (১৯৪৬)
৪. তফসীরে কবীরের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ (১৯৪৮)
৫. ইসলাম আওর মিলকিয়াতে যামিন (১৯৫০)
৬. তফসীরে কবীর সপ্তম খণ্ড ও চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় অংশ (১৯৫০)
৭. Communism And Democracy (1950-1951)
৮. তাশরিহুয যাকাত (১৯৫১)
৯. Memorandum And Articles Of Association Of Tahrik_I_Jadid Anjumane Ahmadiyya Pakistan (1959)S

তাহরীকে জাদীদের একঝলক

১. বিশ্বব্যাপী ইসলামের তবলীগ (১৯৫৮)।
২. তাহরীকে জাদীদের কাজের ওপর দৃষ্টি (১৯৫৯)।

৩. আফ্রিকাতে ইসলামের তবলীগ (১৯৬০)।
৪. তাহরীকে জাদীদ এবং এর প্রয়োজনীয়তা (১৯৬১)।
৫. তাহরীকে জাদীদের কাজের প্রসার (১৯৬৩)।
৬. সহজসরল জীবনযাপন (১৯৬৫)।
৭. তাহরীকে জাদীদের তৃতীয় স্তরের সূচনা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রা.)-এর মূল্যবান দিকনির্দেশনা (১৯৬৬)।
৮. মুজাহিদা (সংগ্রামকারী) (১৯৬৬)।
৯. তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে বিশ্ব পরিমণ্ডলে ইসলাম প্রচার (১৯৬৭)।
১০. তাহরীকে জাদীদের কল্যাণ (প্রবন্ধ হযরত মির্যা বশীর আহমাদ সাহেব (রা.) (জুলাই ১৯৬৩)।
১১. সুইজারল্যান্ডে মসজিদের জন্য সর্বনিম্ন তিনশত রুপি দিয়ে বিশেষ সাহায্যকারীদের তালিকা (মার্চ ১৯৬৩)।
১২. ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্ম [বক্তৃতা জালসা সালানা ১৯৫৪ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)] (জুন ১৯৬৪)।
১৩. জাননে কী বাতঁে [মুতাফারেরক ইরশাদাত হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)] (১৯৬১)।
১৪. TAHRIK- E-JADID ইংরেজি অনুবাদ সাহেববাদা মোবারক আহমদ সাহেব উকিলে আলা (জুন ১৯৬৪)।
১৫. তাহরীকে জাদীদের মালী জেহাদ।
১৬. জলে-স্থলে বিশৃঙ্খলা এবং এর নিরসন [খুতবাতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)] (১৯৬৪)।
১৭. তাহরীকে জাদীদের তৃতীয় পর্যায় এবং লাজনা ইমাইল্লার দ্বায়-দায়িত্ব।

তৃতীয় বিভাগ বা পর্যায়ের সূচনা

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ১৯৬৬ সালের ২২ এপ্রিল তাহরীকে জাদীদের তৃতীয় স্তরের সূচনা করেন এবং সাথে এটিও বলেন যে, এই বিভাগ বা পর্যায় ১৯৬৫ সালের পহেলা নভেম্বর থেকে গণনা করা হবে। তিনি (রাহে.) বলেন: “১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে-সময় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) অসুস্থ ছিলেন এবং অসুস্থতার কারণে এ বিষয়ে হুযুরের মনোযোগ ছিল না...। আমি চাই এখন তৃতীয় স্তরের সূচনা করা হোক

কিছু ১৯৬৫ সালের পহেলা নভেম্বর থেকে এর গণনা করা হবে, কেননা তাহরীকে জাদীদের বছর পহেলা নভেম্বর থেকে শুরু হয়। এভাবে ১৯৬৫ সালের পহেলা নভেম্বর থেকে ১৯৬৬ সালের ২১ অক্টোবর পর্যন্ত এক বছর হবে। এটি আমি এই জন্য করছি যেন তৃতীয় পর্যায়ও হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর খেলাফতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়...। চলতি বছরের নভেম্বরের পর যে-সকল লোক তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় স্তরে शामिल হয়েছেন তাদের সবাইকে তৃতীয় স্তরে স্থানান্তর করা হবে।”

(আল-ফযল, ২৭ এপ্রিল ১৯৬৬, পৃ. ০৩)

তৃতীয় পর্যায়ের মুজাহিদদের জন্য উপদেশবাণী

তৃতীয় স্তর এবং পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯৪৭ সালে উপদেশ প্রদান করে বলেন:

“তৃতীয় স্তরে অংশগ্রহণকারীদের দায়িত্ব হল, তারা এমন উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাবে যা চতুর্থ স্তরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ঈর্ষণীয় হবে এবং চতুর্থ স্তরে অংশগ্রহণকারীদের দায়িত্ব হল, তারা এমন উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাবে যা পঞ্চম স্তরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ঈর্ষণীয় হবে আর এই ধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।”

(আল-ফযল, ০২ ডিসেম্বর ১৯৪৭, পৃ. ০৫)

১৯৪৮ সালে তিনি (রা.) আরও বলেন:

“প্রথম ধাপে তিন লক্ষ আশি হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং আমি মনে করি তারা যদি এটি পাঁচ লাখে পৌঁছে দেয় তাহলে তৃতীয় ধাপে আশা করা যেতে পারে যে, তারা এটিকে আট লাখে পৌঁছে দেবেন এবং পরবর্তী প্রজন্ম এটিকে দশ-বারো লাখে পৌঁছে দেবেন। যদি এমনটি হয়ে যায় তাহলে এটি বিশ্বাসযোগ্য যে, আমরা বহির্বিশ্বে তবলীগের জাল বিছাতে পারব আর এর মাধ্যমে ইসলামের দুর্গ প্রত্যেক দেশে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।”

(আল-ফযল ০৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮; পৃ. ০৬)

তাহরীকে জাদীদের বর্তমান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা

তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা এ মুহূর্তে

নিম্নবর্ণিত বিভাগগুলোর সমন্বয়ে গঠিত যথা: ওকালাতে উলিয়া, ওকালাতে দিওয়ান, ওকালাতে তবশীর, ওকালাতে যেরাআত, ওকালাতে কানুন, ওকালাতে তা’লীম ও সানাআত, ওকালাতে মাল, আমানত বিভাগ, গৃহায়ন বিভাগ এবং অডিটর।

ওকালাতে উলিয়া (প্রধান নির্বাহী ও মহাপরিচালকের দপ্তর): চৌধুরী মুশতাক আহমদ সাহেব বাজওয়া এবং হফেজ আব্দুস সালাম সাহেব উকিলে আলা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬২ সাল থেকে সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ওকালাতে দিওয়ান (প্রাতিষ্ঠানিক নথি ও রেকর্ড সংরক্ষণ বিভাগ): মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আনোয়ার, চৌধুরী ফকির মুহাম্মদ সাহেব অবসরপ্রাপ্ত ডি.এস.পি এবং হাফেজ আব্দুস সালাম সাহেব এই বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক (অর্থাৎ উকিলুদ দিওয়ান) ছিলেন। বর্তমানে সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব উকিলুদ দিওয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ওকালাতে তবশীর (বহির্বিশ্বে তবলীগ বিষয়ক বিভাগ): ওকালাতে তবশীরের এই দুটি বিভাগও সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেবের অধীনে কাজ করছে। সাহেবযাদা সাহেবের পূর্বে মৌলভী জালাল উদ্দীন শামস সাহেব (রা.) (উকিলুত তবশীর ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য), মৌলভী আব্দুল মুগনী খান সাহেব (রা.) (উকিলুত তবশীর আফ্রো-এশিয়ার জন্য), মৌলভী আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেব (উকিলুত তবশীর সানী, আরব দেশসমূহ এবং ইন্দোনেশিয়ার জন্য), মালেক উমর আলী সাহেব খোখার রইস এবং চৌধুরী মুশতাক আহমদ বাজওয়া সাহেব (উকিলুত তবশীর) হিসেবে এই সেবা করে আসছেন।

ওকালাতে যেরাআত (কৃষি বিষয়ক বিভাগ): সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব এবং চৌধুরী মুশতাক আহমদ সাহেব বাজওয়ার পর এখন মির্যা আব্দুর রহিম সাহেব উকিলুয যেরাআত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ওকালাতে কানুন (আইন বিষয়ক বিভাগ): প্রথমদিকে চৌধুরী বাহাউল হক সাহেব এবং চৌধুরী গোলাম মুর্তজা সাহেব, এ-দুইজনকে উকিলুল কানুন নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পরবর্তী বছর থেকে চৌধুরী গোলাম মুর্তজা সাহেব দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ওকালতে তা’লীম (শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ): বর্তমানে মিয়া আব্দুর রহিম আহমদ সাহেব উকিলত তা’লীম হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। হাফেজ কুদরত উল্লাহ সাহেব এবং চৌধুরী গোলাম মুর্তজা সাহেবও এই খেদমত করছেন।

ওকালতে সানা’আত (শিল্প বিষয়ক বিভাগ): হযরত খান সাহেব জুলফিকার আলী খান সাহেব (রা.) এবং মৌলভী বাহাউল হক সাহেব এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

ওকালতে মাল (অর্থ বিষয়ক বিভাগ): এই বিভাগের প্রথম উকিলদের তালিকা নিম্নরূপ:

১. চৌধুরী বরকত আলী সাহেব (উকিলুল মাল আউয়াল)
২. কাজী মোহাম্মদ রশিদ সাহেব (রা.) (উকিলুল মাল সানী)
৩. কুরাইশি আব্দুর রশিদ সাহেব (উকিলুল মাল সানী)
৪. হাফেজ আব্দুস সালাম সাহেব (উকিলুল মাল আউয়াল)

বর্তমানে চৌধুরী সাব্বির আহমদ সাহেব (উকিলুল মাল আউয়াল) এবং হাফেজ আব্দুস সালাম সাহেব উকিলুল মাল সানী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আমানত বিভাগ: এই বিভাগে পর্যায়ক্রমে জামা’তের নিম্নোক্ত সদস্যরা কাজ করেন:

হযরত বাবু ফখরুদ্দীন সাহেব (সেক্রেটারি আমানত), চৌধুরী সুলতান আহমদ সাহেব, সৈয়দ মুহাম্মদ হোসেন শাহ সাহেব, হযরত মাস্টার ফকিরুল্লাহ সাহেব (রা.)। বর্তমানে সাহেববাদা মির্যা নঈম আহমদ সাহেব এই বিভাগের অফিসার।

গৃহায়ন বিভাগ: মালেক মোহাম্মাদ খুরশিদ সাহেব অবসরপ্রাপ্ত এস.ডি.ও, চৌধুরী আব্দুল লতিফ সাহেব... ভারপ্রাপ্ত, চৌধুরী আতা মোহাম্মদ সাহেব, কুরাইশি আব্দুর রশিদ সাহেব, হাসান মোহাম্মদ খান আরেফ সাহেব এবং মালেক বাশারত আহমদ সাহেব সেক্রেটারি তা’মীর (নির্মাণ) ছিলেন। বর্তমানে হাফেজ আব্দুস সালাম সাহেব সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছেন।

অডিটর অফিস: চৌধুরী বরকত আলী সাহেব সেক্রেটারি মাল তাহরীকে জাদীদ, কুরাইশি আব্দুর রশিদ সাহেব, মালেক বেলায়েত খান সাহেবের পর এখন চৌধুরী নাসের উদ্দীন সাহেব অডিটরের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তাহরীকে জাদীদের সর্বমোট আদায়: তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাকাল তথা ১৯৩৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৬ পর্যন্ত তাহরীকে জাদীদের মোট আদায় ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৩ হাজার রুপি যার বিবরণ নিম্নরূপ:

নং	চাঁদার নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
০১	দেশীয় পর্যায়ে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা	৯০৩৩৪০০ রুপি	
০২	বহির্বিশ্বে মসজিদ নির্মাণ খাত যা পাকিস্তানের বিভিন্ন জামা'ত দিয়েছেন	১০১৪৩০০ রুপি	লন্ডন মসজিদের চাঁদা এর অন্তর্ভুক্ত নয় যা ১৯২৪-১৯২৫ এ কেবল আহমদী মহিলাদের চাঁদায় নির্মাণ করা হয়েছিল। এর হিসাব পাওয়া যায় নি। এই অর্থ যা এখানে লিখা হয়েছে তা আমেরিকা, হল্যান্ড, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড এবং ডেনমার্কের মসজিদ নির্মাণের জন্য একত্র করা হয়েছে। এতেও ৪ লক্ষ রুপি আহমদী মহিলাদের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে যা হল্যান্ড এবং ডেনমার্কের মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছিল।
০৩	দেশীয় পর্যায়ে জায়েদাদ হতে আদায়	৯৩৬১৩০০ রুপি	
০৪	তাহরীকে জাদীদ ও চাঁদা আম বহির্বিশ্বে থেকে	৫২৭৭০০০ রুপি	
০৫	জায়েদাদ, প্রেস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্বিশ্বে থেকে	১৩৯৮৭০০০ রুপি	
	সর্বমোট (তিন কোটি ছিয়াশি লক্ষ ত্রিশ হাজার রুপি)	৩৮৬৭৩০০০ রুপি	অন্যান্য দেশের আদায় ১৯৪৫-১৯৪৬ এর বাজেট থেকে তাহরীক জাদীদ লাভ করতে থাকে।

বহির্বিশ্বে তাহরীকে জাদীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন দেশে এখন পর্যন্ত ৫৭ টি স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা অর্জন করছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই নাইজেরিয়া, ঘানা এবং সিয়েরালিওনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নোট: এছাড়াও মরিশাস, গিয়ানা, ফিলিস্তিন, জাযায়ের গারবুল হিন্দ, লাইবেরিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, ইন্দোনেশিয়া, এবং ফিজিতেও আহমদীয়া স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকাংশ স্কুলে স্থানীয় শিক্ষকরা কাজ করছেন। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাকিস্তানী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তাহরীকে জাদীদের এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে-সকল ওয়াক্কেফীনদের কাজ করার সুযোগ হয়েছে তারা হলেন:

সৈয়দ সাফির উদ্দীন সাহেব (ঘানা), নযির আহমদ সাহেব এম.এস.সি (ঘানা), সামিউল্লাহ সৈয়্যাল সাহেব সিয়েরালিওন, সাউদ আহমদ সাহেব (ঘানা), চৌধুরী মাহমুদ আহমদ সাহেব (উগান্ডা)।

বহির্বিশ্বে মসজিদসমূহ

তাহরীকে জাদীদের রেকর্ড অনুযায়ী নিম্নলিখিত দেশসমূহে মসজিদ নির্মিত হয়েছে:

ইউরোপ: ইংল্যান্ড, [মসজিদ ফযল লন্ডন ১৯২৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তিনি তার নিজ হাতে এর ভিত্তি রাখেন।]

হল্যান্ড (চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব ১৯৫৫ সালের ০৯ ডিসেম্বর এর উদ্বোধন করেন।)

জার্মানি (হামবুর্গে ১৯৫৭ সালের ২২ জুন চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব এর উদ্বোধন করেন।)

সুইজারল্যান্ড (মসজিদে মাহমুদ জেবরিচ ১৯৬২ সালের ২৫ আগস্ট হযরত সৈয়দা আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবা এর ভিত্তি রাখেন এবং চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব ২২ জুন ১৯৬৩ সালে এর উদ্বোধন করেন।)

ডেনমার্ক (মসজিদে নুসরত জাহান ১৯৬৭ সালের ২১ জুলাই হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এর উদ্বোধন করেন।)

নোট: ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, এবং ডেনমার্কের মসজিদগুলো বিশেষকরে আহমদী মহিলাদের চাঁদায় নির্মাণ করা হয়।

আমেরিকা: ০৩।

আফ্রিকা: নাইজেরিয়া ২৫, সিয়েরালিওন ৩৫, ঘানা ১৬৩, কেনিয়া ০৩, তানজানিয়া ০২, উগান্ডা ০৫, গাম্বিয়া ০১।

মধ্যপ্রাচ্য: ফিলিস্তিন ০১।

দূরপ্রাচ্য: ইন্দোনেশিয়া ৫১।

এশিয়া: (ভারতীয় উপমহাদেশ ব্যতীত) বার্মা ০১।

[নোট: এটি তৎকালীন যুগের তথ্য। বর্তমানে এই (আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদের) সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।]



মসজিদে নুরুদ্দীন, ভেটখালী, সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ।



মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন।



দারুল তবলীগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।



আহমদীয়া মসজিদ, টরন্টো, কানাডা।



মসজিদ বাইতুল হুদা, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া।



বায়তুল ইকরাম মসজিদ, ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র।



মরিয়ম মসজিদ, গলওয়ে, আয়ারল্যান্ড।



মসজিদ বাশারত, স্পেন।



মসজিদে আকসা, রাবওয়া, পাকিস্তান।



মুবারক মসজিদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাজ্য।



নূর মসজিদ, জুরিখ, সুইজারল্যান্ড।



নাসির মসজিদ, আইসেলবার্গ, জার্মানি।



মসজিদ আল-মাহদী, বেনিন।



কুমাসী কেন্দ্রীয় মসজিদ, ঘানা।



নুসরাত জাহান মসজিদ, সৈয়দপুর, বাংলাদেশ।

তাহরীকে জাদীদের তবলীগী চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে অন্যান্যদের মতামত

তাহরীকে জাদীদের বর্ণাঢ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অন্যরাও তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। যেমন-

* সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল ওয়াহাব আসকারী “মুশাহাদাতি তাহতা সামায়িশ্ শারক্বে”-তে আহমদীয়া জামা’ত সম্পর্কে লেখেন:

و خدماتهم الدين الاسلامى من وجهة التبشير في جميع الاقطار كثيرة و ان لهم دوائر منتظمة يديرها اساتذه و علماء - - و هم يجتهدون بكل الوسائل الممكنة لاعلاء كلمة الدين و من اعمالهم الجبارة الفروع التبشيرية و المساجد التي اسسوها في مدن امريكا و افريقيا و اوربا فهي السنة ناطقة مما قاموا و يقومون به من خدمات و لا شك ان الاسلام مستقبل باهر على يدهم-

অর্থাৎ, ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের অনেক বড় ভূমিকা ও সেবা রয়েছে। তাদের সাংগঠনিক অনেকগুলো বিভাগ রয়েছে। যেগুলো অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরিচালনা করেন...। তারা ইসলাম ধর্মের উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল পছন্দ্য অবলম্বনে ব্যস্ত আর তাদের বড় বড় কাজসমূহের মধ্যে একটি বড় কাজ হল ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে তবলীগী সেন্টার ও মসজিদ নির্মাণ করা। এই সেন্টার এবং মসজিদসমূহ তাদের মহান সেবার উজ্জ্বল প্রমাণ যা তারা পূর্বেও করেছে এবং বর্তমানেও করছে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যতে ইসলামের বিজয় তাদের হাতেই নিহিত।

এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত “এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা”-এর ৭১১ ও ৭১২ পৃষ্ঠায় জামা’তে আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক তবলীগী ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করতে গিয়ে লেখে-

“Both those sections of the community succeeded in

enlisting the services of devoted, self-sacrificing men, who are unceasingly active as propagandists, controversialists and pamphleteers. They control an extensive missionary activity, not only in India, West Africa, Mauritius and Java (where their efforts are mainly directed towards persuading their co-religionists to join the Ahmadiyya sect), but also in Berlin, Chicago and London. Their missionaries have devoted special efforts to winning European converts and have achieved a considerable measure of success. In their literature they give such a presentation of Islam as they consider calculated to attract persons who have received an education on modern lines, and thus not only attract non-Muslims, and rebut the attacks made on Islam by Christian controversialists, but win back to the faith Muslims who have come under agnostic or rationalist influences.”

(The Fourteenth Edition Encyclopaedia Britannica, Volume 12,
pages 711712)

অর্থাৎ, আহমদীয়া জামা’তের দুটি দলই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং আত্মত্যাগী মানুষদের নিজেদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করতে সফল হয়েছে। তারা বিজ্ঞাপন, সংবাদ পত্র এবং আলোচনার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রচার-প্রচারণার কাজ করে যাচ্ছে। তাদের অনেক বিস্তৃত তবলীগী ব্যবস্থাপনা রয়েছে। শুধু হিন্দুস্থানে নয় বরং পশ্চিম আফ্রিকা, মরিশাস এবং জাভা (সেখানে তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিশেষ লক্ষ্য হল, সেখানের ধর্মপ্রাণ মানুষ যেন আহমদীয়া জামা’তে অন্তর্ভুক্ত হয়) ছাড়াও বার্লিন, শিকাগো এবং লন্ডনে তাদের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মোবাল্লেগণ অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন যেন ইউরোপের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে এবং এতে তারা সফলও হয়েছেন। তাদের প্রবন্ধে ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যা শিক্ষিত সমাজের জন্য পথ প্রদর্শনের কারণ হয় এবং এই পদ্ধতিতে শুধু অমুসলিমগণই তাদের দিকে ঝুঁকে না বরং ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্যও এই শিক্ষা পথ প্রদর্শনের কারণ হয় যারা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের মোবাল্লেগণ খ্রিস্টানকর্তৃক ইসলামের ওপর কৃত আক্রমণসমূহকেও প্রতিহত করে থাকে।

* দৈনিক “বারনারটাগল্লাট” সুইজারল্যান্ড: সুইজারল্যান্ডের দৈনিক বারনারটাগল্লাট ১১ জুন ১৯৬১ সালের সংখ্যায় লেখে—

“বর্তমান যুগে এই জামা’ত (আহমদীয়া) পৃথিবীর অনেক অংশে বিস্তারলাভ করেছে যেমন ইউরোপের লন্ডন, হামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফোর্ট, মিডরাড এবং স্টোকহোমে এখন এই জামা’তের স্থায়ী তবলীগী মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকার ওয়াশিংটন, লসএঞ্জেলেস, নিউইয়র্ক এবং শিকাগোতেও তাদের শাখা রয়েছে। এরপর গ্রানাডা, ত্রিনিদাদ, ডাচ, গায়ানাতেও তারা কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে সিয়েরালিওন, ঘানা, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকার মধ্যেও তাদের জামা’ত রয়েছে। পূর্ব ও মধ্য এশিয়াতে মাস্কাট, দামেস্ক, বাইরুত, মরিশাস, বারতানবি উত্তর বুরনিও, কলম্বো, রেংগুন, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়াতে তাদের তবলীগী মিশন কাজ করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর সাতটি ভাষায় কুরআন অনুবাদের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ডাচ, জার্মান এবং ইংরেজিতে পুরো কুরআনের অনুবাদ আরবীসহ প্রকাশ করা হয়েছে। একইভাবে রুশ ভাষায় অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। জামা’তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেক উচ্চমানের অর্থাৎ পৃথিবীতে বসবাসকারী সব মানুষকে এক ধর্মে দীক্ষিত করে তাদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করাই হল তাদের লক্ষ্য। এটি হল আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম। এর মাধ্যমে আহমদীরা সকল মানুষকে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের প্রত্যাশা হল, সমগ্র মানবজাতি ইসলামের পতাকা তলে এসে মুসলমান হয়ে যাবে।”

* আমেরিকার রাজ্য পেনিসেলভিনিয়াতে ওয়িলক্স কলেজের দর্শনবিদ্যা বিভাগের প্রোফেসর স্টেনকো এম. ওজিকা ইংল্যান্ডের পত্রিকা ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ড -এ লেখেন—

“কাদিয়ানী গ্রুপকে আজও এই নামে স্মরণ করা হয়। উপমহাদেশ ভাগ হবার পর থেকে রাবওয়া এই দলের দ্বিতীয় কেন্দ্র যা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। এই দলের নেতৃত্ব ১৯১৪ সাল থেকে আহমদীয়া জামা’তের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র মির্যা বশীর উদ্দীন (মাহমুদ আহমদ) সাহেবের হাতে। সাধারণত তাঁর মান্যকারীরা তাকে সম্মানের সাথে হযরত সাহেব নামে ডেকে থাকে। তিনি একজন সাহসী নেতা এবং উচ্চ মেধাসম্পন্ন লেখক। তাঁর

পিতার মত তিনিও দাবি করেন যে, আল্লাহ্ তা’লার সাথে তাঁর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক জায়গায় তিনি তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি লিখেছেন আর এটাও বুঝা যায় যে, তিনি যা কিছু লিখেছেন তা পবিত্রতা এবং নিষ্ঠার সাথে লিখেছেন। তিনি লেখেন যে—

‘আল্লাহ্ তা’লা আমার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা’তকে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং অজস্রবার নিজ বাণী দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। পৃথিবীর এমন কোন জ্ঞান নেই যা ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে অথচ এর উত্তর আল্লাহ্ তা’লা আমাকে কুরআন শরীফ থেকে বুঝিয়ে দেন নি।’

(দিবাচাহ তফসীরুল কুরআন, ইংরেজি)

আহমদীরা ইসলামের বাণী পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তাদের জীবন উৎসর্গ করে রেখেছে। তারা ইসলামের প্রচারকে প্রত্যেক মানুষের নৈতিক দায়িত্ব মনে করে। রাবওয়াতে একটি মিশনারী কলেজ (জামেয়া আহমদীয়া) আছে যেখানে বিভিন্ন দেশে প্রেরণের জন্য মোবাল্লেগ তৈরি করা হয় এবং একইভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত নতুন মুসলমানদেরকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়। বিভিন্ন মিশনগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী অফিস নাশর ও ইশায়াত তৎপর রয়েছে। ইংরেজি মাসিক ‘দি রিভিও অফ রিলিজিয়ন’ যা একটি নিয়মিত এবং স্থায়ী প্রকাশনা, এছাড়াও বহু সংখ্যক বই-পুস্তক, ছোট ছোট পত্রিকা এবং লিফলেট প্রকাশ করে, যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এই সমস্ত প্রবন্ধ ইসলামি বিশ্ব এবং অ-ইসলামি বিশ্ব উভয়কে দৃষ্টিতে রেখে প্রকাশ করা হয় আর এ সকল প্রকাশনার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়।”

* গান্ধিয়ার একটি পত্রিকা ‘দি ভ্যান গার্ড’ একটি প্রবন্ধে লেখে—

“এই ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব (আ.) ১৮৮৯ সালে কাদিয়ানে এর ভিত্তি রেখেছিলেন। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত এই ফিরকা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইসলামের উন্নতির জন্য তবলীগ ও শিক্ষার কাজে পূর্বের থেকে আরও বেশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে।”

“নিজেদের বাড়ির আশেপাশে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন। সিয়েরালিওন, ঘানা এবং নাইজেরিয়াতে এই ফিরকা অনেক দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যেখানে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে হাজার হাজার মুসলমানকে ইংরেজি ও আরবী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।”

* ‘মায়হাবি তাহরীকাতে হিন্দ’ পুস্তকের লেখক মিস্টার এম.জে. আগা লেখেন, “আহমদীয়া জামা’তের বর্তমান নেতা মিয়া মাহমুদ সাহেব অন্যান্য দেশেও মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নিষ্ঠাবান আহমদীরা অন্যান্য দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য নিজের ইচ্ছায় মালী কুরবানী উপস্থাপন করেছেন। যার ফলে জামা’তের তবলীগী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব গত পঞ্চাশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের মিশন খ্রিষ্টান মোবাল্লেগদের তুলনায় সীমিত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও অনেক ভাল কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মোকাবেলায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’তের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ কোটি এবং তাদের কাছে অনেক মাধ্যম এবং সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও ইসলাম প্রচারের জন্য তারা চিন্তা-ভাবনা করে না।”

* মিস্টার এম. জে. আগা তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “এই বিভাগে এমন শিক্ষিত যুবক আছেন যারা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও যোগ্যতা রাখেন এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ইসলামের সঠিক শিক্ষা উপস্থাপন করে যাচ্ছেন। সত্যিকার অর্থে এটি একটি কঠিন ও ধৈর্যের কাজ যার জন্য জান এবং মালের কুরবানী প্রয়োজন। কিন্তু আহমদীয়া জামা’তের সদস্যরা অনেক মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে এই দায়িত্ব পালনে অংশ নিয়েছে। যার ফলে বাইরের দেশে মসজিদ, মাদ্রাসা ও তবলীগের কেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিভিন্ন ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ করে বিতরণ করা হয়েছে।”

* ‘আল-মিস্বর’ পত্রিকা লায়লপুর: সাপ্তাহিক আল মিস্বর পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন যে, “তাহরীকে জাদীদ একটি সুশৃঙ্খল চেষ্ঠা-প্রচেষ্টার নাম যা আজ থেকে আঠাশ বছর পূর্বে মির্যা মাহমুদ সাহেব কাদিয়ান থেকে শুরু করেছিলেন। এই তাহরীকের প্রথম বছরে কাদিয়ানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় যার মধ্যে কাদিয়ানের উকিল, ডাক্তার, আলেম, কবিরাজ এবং সাধারণ কর্মজীবী মানুষ সত্ত্বেও এবং মাসের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে মুসলমানদেরকে কাদিয়ানী বানানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগে যায়।

এই তাহরীক প্রথমদিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শুরু করা হয়েছিল। যখন নয়-দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল তখন মির্যা মাহমুদ সাহেব ঘোষণা

দিলেন যে, এখন এই তাহরীক চিরস্থায়ী থাকবে। অতএব এখন আঠাশতম বছরের সূচনা রাবওয়া জামা’তের আনসারুল্লাহর ইজতেমার সময় করা হয়েছে।

এই তাহরীকের অধীনে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, জার্মানি, আফ্রিকা এবং অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহে কাদিয়ানী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং তারা দিন রাত খ্রিষ্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য জাতিগুলোকে কাদিয়ানী বানানোর চেষ্টায় রত।

তারা এই কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। নিজেদের সন্তানদেরকেও তারা উৎসর্গ করে। বই পুস্তক ছাপায়। জলসা করে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে এবং জনপদে ঘুরে ঘুরে কাদিয়ানীয়াতের প্রচারণা করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি যে, ১৯৫৩ সালে যখন হাইকোর্টে পাঞ্জাবে বিশৃঙ্খলার তদন্ত করা হচ্ছিল তখন মুসলমান জামা’তগুলো কাদিয়ানী সদস্যদের অমুসলিম সংখ্যালঘু প্রমাণ করার জন্য মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের বই পুস্তক, খলীফা মাহমুদের প্রবন্ধ থেকে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু হবার প্রমাণ উপস্থাপন করে। ঠিক সেই দিনগুলোতে কাদিয়ানী জামা’তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হাইকোর্ট এবং বিচারিক আদালতের নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তি বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ মুনির সাহেব এবং সে সময়ের গভর্নর জেনারেল মিষ্টার গোলাম মুহাম্মদ মরহুমের সামনে কুরআন মজীদের জার্মানি এবং ডাচ ভাষার অনুবাদ উপস্থাপন করা হয় যা সেই যুগে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই কারণে মিষ্টার মুহাম্মদ মুনির সাহেব মুসলমান প্রতিনিধিদেরকে বার বার প্রশ্ন করেন যে, আপনারা বিভিন্ন দেশের জন্য কুরআন শরীফের কতটি অনুবাদ করেছেন? এবং আপনাদের ব্যবস্থাপনায় অমুসলিম জাতিদের ইসলামের সাথে পরিচিত করানোর জন্য কী কাজ করে যাচ্ছেন? এটি সঠিক যে কাদিয়ানীরা প্রচার-প্রচারণা সম্পর্কে অনেক দক্ষ। এটিও সঠিক যে, মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) থেকে শুরু করে কাদিয়ানের উকিলুল মাল পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার বর্ণনা করেন এবং এটিও সঠিক যে, কাদিয়ানীদের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অনেক দৃঢ়। কিন্তু এই সত্যকে কি অস্বীকার করা সম্ভব যে, কাদিয়ানীদের বাজেট লক্ষ লক্ষ রূপি হয়? এবং এখন রাবওয়াতে আনসারুল্লাহর ইজতেমাতেই এক ঘণ্টার মধ্যে ৮৮১৯১ রূপি চাঁদার ওয়াদা আসে আর এই সমস্ত রূপি খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদেরকে কাদিয়ানী বানানোর জন্য ব্যয় করা হবে।

এখন বলতে পারেন যে, তবলীগী জামা’ত প্রতি বছর শত শত ব্যক্তিকে অমুসলিম দেশগুলোতে প্রেরণ করে এবং বর্তমানে জামা’তে ইসলামির নেতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদী সাহেব আফ্রিকায় যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন কিন্তু সরকার তাকে যাবার অনুমতি প্রদান করে নি। এটি ঠিক যে, এমনটি হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করুন! এ দেশে মুসলমানদের সংখ্যা সোয়া আট কোটি এবং কাদিয়ানীদের সংখ্যা খুব বেশি হলে দুই-তিন লক্ষ হবে। এই জামা’তে একটি বিভাগের জন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নব্বই হাজারের কাছাকাছি যদি ওয়াদা হয় তবে এর তুলনায় দুইশত গুণের অধিক সংখ্যক লোকের ইসলাম প্রচার এবং ইসলামের দাওয়াতের জন্য বাজেট কতটা হওয়া উচিত? একথা স্পষ্ট যে, এটি শুধু তাহরীকে জাদীদেরই বাজেট। কাদিয়ানীদের কেন্দ্রীয় বাজেট কমপক্ষে পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ রুপি হয়ে থাকে।”

(আল-মিসর, লায়েলপুর, ২৩ নভেম্বর ১৯৬১, পৃ. ১১)

* আল-মিসর পত্রিকার সম্পাদক আরও লেখেন— “কাদিয়ানীদের মাঝে উন্নতির যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, যা তারা ইসলামের জন্য অমুসলিম দেশগুলোতে জারি রেখেছে। কাদিয়ানীরা পবিত্র কুরআনকে অন্য দেশের ভাষায় উপস্থাপন করেছে। ত্রিত্ববাদকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। সাইয়েদুল মুরসালীনের পবিত্র জীবন উপস্থাপন করেছে। ঐ সমস্ত দেশসমূহে মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে ইসলাম যে একটি শান্তি প্রিয় ধর্ম— এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে।”

(আল-মিসর, লায়েলপুর, ০২ মার্চ ১৯৫৬)

* আল-মিসরের সম্পাদক পুনরায় লিখেছেন— “তাহরীকে জাদীদের সূচনা ১৯৩৪ সালে এভাবে হয়েছিল যে, মির্যা মাহমুদ জামা’তকে সাড়ে সাতাশ হাজার রুপি প্রদানের আদেশ দিয়েছিলেন। এর জবাবে কাদিয়ানী জামা’ত তিন বছরের মধ্যে তিন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার রুপি পেশ করে। প্রথমদিকে এই তাহরীক দশ বছরের জন্য ছিল। ১৯৪৪ সালে নয় বছরের জন্য এই তাহরীক বাড়ানো হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে ‘কাদিয়ানী বিরোধী তাহরীক’-এর সময় মির্যা মাহমুদ নতুনদের মাঝে ঘোষণা দেন যে, “আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি তাহরীকে জাদীদকে সেই সময় পর্যন্ত জারি রাখব যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিঃশ্বাস থাকবে।”

(আল-মুসলেহ, ১১ নভেম্বর ১৯৫৩)

“এই তাহরীকের গত বছরের বাজেট আটত্রিশ লক্ষ রুপিও বেশি। এই তাহরীকে চাঁদাদাতার সংখ্যা বাইশ হাজারের কাছাকাছি যারা বছরে নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় করেন। আর তাৎক্ষণিক এবং সাময়িকভাবে অন্যান্য চাঁদা দিতে হলেও তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় এর কোন প্রভাব পড়ে না। এই তাহরীকের চাঁদা জনপ্রতি বছরে বিশ-ত্রিশ থেকে একশ-দেড়শ রুপি পর্যন্ত হয়ে থাকে।”

(আল-মিসর, লায়েলপুর, ১১ আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ০৮)

* উক্ত পত্রিকা আরও লেখে— “কাদিয়ানীদের অর্থ ব্যবস্থাপনা তিন ভাগে বিভক্ত: ১. সাময়িক ও তাৎক্ষণিক চাঁদা ২. স্থায়ী চাঁদা ৩. ওয়াকফে জায়েদাদ সাময়িক ও তাৎক্ষণিক চাঁদাসমূহ বেশি হয়ে থাকে। মসজিদ নির্মাণ, বিভিন্ন দেশে তবলীগী কেন্দ্র, কোন বিশেষ সফরের জন্য চাঁদা, কুরআন শরীফ অনুবাদের জন্য চাঁদা অর্থাৎ প্রত্যেক সমস্যা ও চাহিদার সময় তাহরীক করা হয় এবং জামা’ত এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।

এই সাময়িক চাঁদাসমূহের পরিমাণ কয়েক হাজার থেকে লক্ষ রুপি পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং তাহরীকগুলো পুরো বছরে কোন না কোন বিষয়ের জন্য জারি করা হয়। একটি শেষ হলে আরেকটি শুরু করা হয়, দ্বিতীয়টি জারি হলে তৃতীয়টি শুরু হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য যে, মির্যা মাহমুদ হুদয় থেকে যে তাহরীক উপস্থাপন করেন তা অবশ্যই সফল হয়। উদাহরণস্বরূপ কোন মসজিদের জন্য এলান করে দিয়েছেন যে, এর সমস্ত খরচ মহিলাদেরকে দিতে হবে, তারা তা আদায় করেছে এবং অনেক সময় তিন-চার লক্ষ রুপি সবই মহিলারা সরবরাহ করেছে।

কিছু তাহরীক কেবল কৃষক ও ভূমি মালিকদের জন্য, আবার কিছু কেবল ব্যবসায়ীদের জন্য এবং কিছু কেবল চাকুরিজীবীদের জন্য।”

(আল-মিসর, লায়েলপুর, ১১ আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ০৭)

এ হল সেই ব্যবস্থাপনা— যার সূচনা সে-সময় হয়েছে যখন আহরারীরা কঠিন বিরোধিতা শুরু করেছিল এবং এখন খোদার ফযলে এটি একটি শক্ত গাছের ন্যায় পরিণত হয়েছে যার শাখা-প্রশাখা অনেক দ্রুততার সাথে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সত্যভাষী পাখিরা এর ছায়াতে এসে শান্তি পাচ্ছে এবং এর রস ও ফল থেকে উপকৃত হচ্ছে। পূর্বে ইংরেজ সম্রাজ্য সম্পর্কে বলা

হতো যে, তারা কখনও পরাজিত হবে না, কিন্তু আহমদীয়া জামা’ত খোদার ফয়লে পূর্ব-পশ্চিমের দূর দূরান্তের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং এখন আমরা বলতে পারি যে, আহমদীয়া জামা’তের সূর্য কখনও অস্ত যাবে না।

و ذاك فضل الله يوتيهِ من يشاء فالحمد لله على ذالك

জামা’তকে সতর্কীকরণ

হুযূর (রা.) জামা’তের সদস্যদের সতর্ক করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলেন যে, “যেদিন আমাদের মাঝে সেই সব লোক সৃষ্টি হবে যারা বলবে যে প্রথম ধাপ অতিবাহিত হয়ে গেছে, দ্বিতীয় ধাপও অতিবাহিত হয়ে গেছে, তৃতীয় ধাপও অতিবাহিত হয়ে গেছে, চতুর্থ ধাপও অতিবাহিত হয়ে গেছে, পঞ্চম ধাপও অতিবাহিত হয়ে গেছে, ষষ্ঠ ধাপও অতিবাহিত হয়ে গেছে, সপ্তম ধাপও অতিবাহিত হয়ে গেছে এখন আমরা আর কতকাল এই প্রকার কুরবানী করতে থাকব? পরিশেষে কোথাও না কোথাও এটির শেষ করা উচিত! এমন কথা যারা বলবে তাদের বুঝতে হবে যে, তাদের আধ্যাত্মিকতা কমে গেছে এবং তাদের ঈমানও দুর্বল হয়ে গেছে।”

“আমরা আশা রাখি যে, তাহরীকে জাদীদের এই ধাপ প্রশস্ত হবে এবং যেভাবে আকাশের নক্ষত্র গণনা করা যায় না একইভাবে তাহরীকে জাদীদের যুগও গণনা করে শেষ করা যাবে না। যেভাবে আল্লাহ তা’লা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে বলেছিলেন যে, তোমার বংশধরদের গণনা করে শেষ করা যাবে না এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধরেরা ধর্মের অনেক খেদমত করেছেন, তাহরীকে জাদীদের বিষয়টি এমনই।”

(আল-ফয়ল, ০১ মার্চ ১৯৪৬, পৃ. ০৩)

স্থায়ী কুরবানীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হযরত আমীরুল মু’মিনীন (রা.)-এর ভাষ্য:

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কেবল এতেই ক্ষান্ত দেন নি বরং তিনি (রা.) স্থায়ী কুরবানীর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন— “স্মরণ রাখবেন, অধিক পরিমাণ চাঁদা আদায়ের ফলে কেউ যেন একথা মনে না করে যে, ‘এখন আমরা চাঁদা দেওয়া থেকে মুক্তি পেলাম’। আমি একজন মানুষ আর অবশেষে এমন একদিন আসবে যখন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং অন্য কেউ এ

জামা’তের খলীফা হবেন। তখন কী অবস্থা হবে— আমার জানা নেই। তাই এখনই আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যেন তোমরা এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হোঁচট না খায়। কোন খলীফা যদি একথা মনে করে যে, এখন কৃষি জমি থেকে এত আয় হচ্ছে, ব্যবসা থেকে এত আয় হচ্ছে, শিল্পকারখানা থেকে এত আয় হচ্ছে তাই জামা’তের সদস্যদের কাছ থেকে এখন আর চাঁদা গ্রহণ করার কী প্রয়োজন? এভাবে আয় হবার পর যদি তিনি জামা’তের সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে শিথিলতা প্রদর্শন করেন তবে বুঝতে হবে— তিনি সত্যিকার খলীফা নন। তখন বুঝতে হবে, এখন খেলাফত শেষ হয়ে গেছে এবং ইসলামের কোন শত্রু সৃষ্টি হয়েছে। যেদিন তোমরা এই আত্মপ্রসাদে ভুগবে যে, এখন অর্থকড়ি আসছে তাই কুরবানী করার কী আবশ্যিকতা? সে-দিন তোমরা বুঝবে, জামা’তের উন্নতি এখন শেষ হয়ে গেছে।

আমি বলেছি টাকার মাধ্যমে জামা’ত সৃষ্টি হয় না বরং মানুষের মাধ্যমে জামা’ত সৃষ্টি হয় এবং মানুষ কুরবানী না করে থাকতে পারে না। যদি দশ বিলিয়ন রুপি আসা আরম্ভ হয়ে যায় তবুও প্রয়োজন হবে যে, যুগে যুগে জামা’তকে এইভাবে কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হবে যেভাবে এখন দেওয়া হচ্ছে, বরং এর থেকে আরও বেশি করা হবে কেননা এখনও বড় বড় কুরবানী জামা’তের সামনে আসে নি। অতএব যদি এক বিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদ হয় তবুও যুগ-খলীফার দায়িত্ব হল, একজন দরিদ্র ব্যক্তির পকেটে এক টাকা থাকলেও ধর্মের খাতিরে তা যেন গ্রহণ করা হয় এবং একজন ধনী ব্যক্তির পকেটে দশ হাজার টাকা থাকলেও ধর্মের উদ্দেশ্যে তা যেন গ্রহণ করা হয় কেননা কুরবানী ছাড়া হৃদয় পরিষ্কার হতে পারে না এবং হৃদয় পরিষ্কার না হলে জামা’ত সৃষ্টি হতে পারে না আর জামা’ত সৃষ্টি না হলে খোদার রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয় না। যে টাকা স্বচ্ছ হৃদয়ে দেওয়া হয় না সেটি মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ নয় বরং অভিশাপের কারণ। সেই অর্থই রহমতের কারণ হতে পারে যে অর্থ প্রদানকারী মানুষের হৃদয় স্বচ্ছ এবং দূষণমুক্ত।

অতএব অধিকহারে যদি অর্থ আসে তবে তোমরা কুরবানী করা থেকে বঁচে যাবে— এটি মনে করো না। যদি অধিক হারে অর্থ আসে তাহলে আমাদের কাজ ও দায়িত্বাবলি বেড়ে যাবে। এর জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন টাকার প্রয়োজন। বরং যদি বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা আসে তবুও এই কাজের সমাপ্তি

হতে পারে না। অর্থকড়ি শেষ হতে পারে, কিন্তু এই কাজ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এই টাকা যদি আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ হবার জন্য যথেষ্ট হয় তবুও তোমাদের মাঝে ঈমান সৃষ্টি লক্ষ্যে, তোমাদের মাঝে নিষ্ঠা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চারণ করার লক্ষ্যে, তোমাদের অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি করার জন্য তোমাদের কাছে কুরবানী চাওয়া আবশ্যিক বরং সদাসর্বদা তোমাদের কাছে কুরবানী চাওয়া আবশ্যিক। যদি কুরবানী চাওয়া পরিত্যাগ করা হয় তাহলে তা হবে তোমাদের ওপর অন্যায় করার নামাস্তর এবং জামা’তের ওপর অন্যায় করার নামাস্তর, এমনকি তাকওয়া ও ঈমানের ওপর অন্যায় করার নামাস্তর।”

(আল-ফযল, ০৭ এপ্রিল ১৯৪৪, পৃ. ০৭)

ভবিষ্যৎ খলীফাদের উদ্দেশ্যে ওসিয়্যত

হুযূর কেবল জামা’তকে কুরবানীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন নি বরং আগমনকারী ভবিষ্যৎ খলীফাদের উদ্দেশ্যেও ওসিয়্যত করেন। তিনি (আ.) বলেন:

“যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর কোণে কোণে ইসলাম ছড়িয়ে না যাবে এবং জগতের সব লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের তবলীগের ক্ষেত্রে যেন (কোন খলীফা) কোন দুর্বলতা না দেখায়। বিশেষকরে আমি আমার সন্তানদেরকে ওসিয়্যত করছি, তারা যেন কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকা উড্ডীন রাখে এবং তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে বংশপরম্পরায় এই উপদেশ দিতে থাকে যে, তোমরা কখনও ইসলামের তবলীগ পরিত্যাগ করবে না এবং আজীবন ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখবে।”

(আল-ফযল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সাল)

তাহরীকে জাদীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে কাশফে দেখানো হয়, “এমন এক বিশাল উত্তাল ও গভীর দরিয়া যেটি সাপের মতো পেঁচিয়ে প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে আর পরক্ষণে তা দিক পরিবর্তন করে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া শুরু হয়।”

এটি মূলত সেই মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লবের এক দৃশ্য যা নিকট ভবিষ্যতে বা পরবর্তীতে কোন এক সময় তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে দৃশ্যমান হবে আর যার ফলে তাহরীকে জাদীদের পাঁচ হাজার সৈন্য লক্ষ্যের কোটায় পৌঁছে যাবে আর জগতে পশ্চিমা ব্যবস্থাপনার স্থলে ইসলামী ব্যবস্থাপনার নবযুগ শুরু হবে। অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) একদা সুস্পষ্টভাবে বলেন:

“আমরা যখন এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর নাম জগতে ছড়িয়ে দিব আর ইসলামের প্রতাপ আর এর শানশওকত প্রকাশের লক্ষ্যে আমাদের সবকিছু উৎসর্গ করে দিব সেক্ষেত্রে উক্ত তবলীগী স্কিমের জন্য আমাদের যতটা অর্থের প্রয়োজন হবে তা পূর্ণ করাও আমাদের জামা’তের জন্য আবশ্যিক। প্রকৃত বিষয় হল, সমস্ত জগতে সঠিকভাবে ইসলামের তবলীগ করার জন্য আমাদের লক্ষ লক্ষ মোবাল্লেগ এবং কোটি কোটি টাকা প্রয়োজন। আমি রাতে যখন বিছানায় শুয়ে পড়ি তখন অনেক সময় সমস্ত পৃথিবীতে তবলীগ করার জন্য আমি বিভিন্ন উপায় ধারণা করি। কখনও বলি যে, আমাদের এতজন মোবাল্লেগ প্রয়োজন আবার কখনও বলি যে, এতজনে কাজ হবে না, এরও অধিক মোবাল্লেগ প্রয়োজন। এমনকি কখনও কখনও মনে হয় বিশ লক্ষ মোবাল্লেগের প্রয়োজন, এমনটি ভেবে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমার এ মুহূর্তের চিন্তাভাবনা যদি রেকর্ড করা হয় তাহলে জগতের মানুষ হয়ত মনে করবে— আমি সবচেয়ে বড় নির্বোধ। কিন্তু আমার নিজস্ব চিন্তাভাবনার মাঝে আমি এতটাই স্বাদ পাই যে, আমার সারাদিনের ক্লাস্তি দূর হয়ে যায়। আমি কখনও মনে করি, পাঁচ হাজার মোবাল্লেগ যথেষ্ট। আবার মনে মনে বলি, পাঁচ হাজার দিয়ে কী হবে, দশ হাজার প্রয়োজন। আবার বলি, দশ হাজারও কিছুই না, জাভাতে এতজন মোবাল্লেগ প্রয়োজন, সুমাত্রাতে এতজন মোবাল্লেগ প্রয়োজন, চীন আর জাপানে এতজন মোবাল্লেগ প্রয়োজন। এরপর আমি সকল দেশের মোট জনসংখ্যা জরিপ করি, এরপর মনে মনে বলি, মোবাল্লেগের এই সংখ্যাও খুবই কম, এরও অধিক মোবাল্লেগ প্রয়োজন বরং বিশ লক্ষ মোবাল্লেগ প্রয়োজন বলে মনে হয়।

জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমার এরূপ চিন্তাভাবনা কাল্পনিক ভ্রম ছাড়া কোন বাস্তবতা রাখে না কিন্তু আল্লাহ তা’লার বিধান হল, যে-বিষয় একবার সৃষ্টি হয়, তা নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না করে বিনাশ হয় না। মানুষ আমাকে যতই নির্বোধ বলুক, কিন্তু আমি জানি, আমার এসব চিন্তাভাবনা আল্লাহ তা’লা সৃষ্ট বায়ুমণ্ডলে রেকর্ড হচ্ছে আর সেই দিন দূরে নয় যখন আল্লাহ তা’লা

আমার এসব চিন্তাভাবনা কার্যকর করা শুরু করে দিবেন। আজ নয়তো আজ থেকে ষাট অথবা শত বছর পরও যদি খোদা তা’লার এমন কোন বান্দা সৃষ্টি হন যিনি আমার এই রেকর্ড পড়তে সক্ষম হবেন আর তাঁর সৌভাগ্য হলে তিনি এক লক্ষ মোবাল্লেগ প্রস্তুত করবেন। এরপর আল্লাহ্ অন্য কোন বান্দাকে দাঁড় করিয়ে দিবেন যিনি মোবাল্লেগের এই সংখ্যাকে দুই লক্ষে উপনীত করবেন। এভাবে ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তা’লা সে-সময়ও নিয়ে আসবেন যখন সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের বিশ (২০) লক্ষ মোবাল্লেগ কাজ করবে। আল্লাহ্র কাছে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় আছে। আমার এই চিন্তাধারাও রেকর্ড হয়ে গেছে যা বিনাশ হবার নয়। আজ নয়তো কাল আর কাল নয়তো পরশু আমার এই অভিপ্রায় বাস্তবায়ন হবে, ইনশাআল্লাহ্।”

আজ পৃথিবীর ২২০টি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত প্রতিষ্ঠিত

গত ০৮ নভেম্বর ২০২৪, জুমুআর খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) বলেন:

“আজ যেমনটি আমরা জানি, তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা হয়ে থাকে; আজ আমি ঘোষণা দেব। এই ঘোষণা মাসের প্রথম সপ্তাহে হয়ে থাকে। যেহেতু এক তারিখ জুমুআ ছিল, তাই আজ দ্বিতীয় জুমুআতে ঘোষণা করছি। এজন্যই আমি কুরবানীকারীদের কথা উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা’লার অনেক বড় কৃপা, বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে কেবল আহমদীয়া জামা’তের সদস্যরাই ‘ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম বিল-লাইলি ওয়ান-নাহার’-এর প্রকৃত সত্যায়নকারী সাব্যস্ত হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে দিনরাত কুরবানী করছে আর যেভাবে আমি বলেছি, দিবানিশি কুরবানীর ধারবাহিকতা বিরাজমান। আহমদীয়া জামা’ত পৃথিবীর সকল প্রান্তে বিস্তৃত। আজ ২২০টি দেশে আহমদীয়া জামা’ত প্রতিষ্ঠিত আর সর্বত্র কুরবানীকারীদের এমন দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে। এ মুহূর্তে আমি যখন খুতবা দিচ্ছি তখন কোথাও রাত কোথাও দিন, কিন্তু সকলেই এই খুতবা শুনছেন আর আহমদীয়া জামা’ত একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে। অতএব এ বিষয়টিই আহমদীয়া জামা’তকে সবার মাঝে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে থাকে। এই জিনিসটিই, এই কুরবানীই, আল্লাহ্ তা’লার সম্ভৃতি অর্জন করার এই আকাঙ্ক্ষাই জামা’তের

উন্নতির কারণ হয়, আর যতদিন পর্যন্ত এই অবস্থা জামা’তের সদস্যদের মাঝে বিরাজমান থাকবে, জামা’তকে আল্লাহ্ তা’লা নিজ কৃপায় ভূষিত করতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্। ...আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এই যুগ অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ হল হেদায়াত প্রচারের যুগ, এর পরিপূর্ণতার যুগ, জগতে ইসলামের শিক্ষা বিস্তৃত করার যুগ। এ কারণে মহানবী (সা.) মুহাম্মদী মসীহ্‌র আগমনের বিষয়ে আমাদেরকে অবগত করেছিলেন। অতএব আমরা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে— যে হেদায়াত তিনি এনেছিলেন, যার পূর্ণতা আল্লাহ্ তা’লা তাঁর হাতে করিয়েছেন— এর প্রচারের পূর্ণতার জন্য এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা’ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব আমরা যদি আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কাজ করতে থাকি তাহলে আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে থাকবেন। কোন ধরনের ভয়ভীতি ও দুঃখকষ্ট ছাড়াই আমরা আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারব। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে সকল ভয়ভীতি থেকে মুক্ত করবেন, আমাদের সকল দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত করবেন, আমাদের সমস্যা দূর করে দেবেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবেন। আর এ বিষয়টিই অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত— আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি আমাদের অর্জন করতে হবে। যেভাবে আমি উদাহরণ দিয়েছি যে, যেসব আহমদী এই বিষয়গুলো বোঝে, তাদের ওপর আল্লাহ্ তা’লা কৃপাবারি বর্ষণ করেছেন। ইসলামের তবলীগের যে কাজ হচ্ছে, এর বরকতে এ সকল কুরবানী প্রদানকারীরা কল্যাণ লাভ করছে। যেখানেই বয়আত হয় অথবা জামা’তের প্রকাশনায় ব্যয় হয়, জামা’তের তবলীগে ব্যয় হয়, জামেয়ার পেছনে ব্যয় হয়— এই সকল ব্যয় ঐ সকল চাঁদা প্রদানকারীদেরও সেই পুণ্যের ভাগী করছে আর আল্লাহ্ তা’লা তাদেরকে কল্যাণমণ্ডিত করে থাকেন।”

(খুতবা জুমুআ, ০৮ নভেম্বর ২০২৪)

হুযূর (আই.) আরও বলেন:

আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের নব্বইতম বছর শেষ হয়েছে আর একানব্বইতম বছরে আমরা পদার্পণ করেছি। তাহরীকে জাদীদের বছরগুলোর বিষয়ে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন যে, দফতর আউয়াল (তথা প্রথম ধাপ)-এর ৯১তম বছর, দফতর দোওম (তথা দ্বিতীয় ধাপ)-এর ৮১তম বছর, দফতর সোওম (তথা তৃতীয় ধাপ)-এর ৬০তম বছর,

দফতর চাহারম (তথা চতুর্থ ধাপ)-এর ৪০তম বছর, দফতর পাঞ্জম (তথা পঞ্চম ধাপ)-এর ২১তম বছর। প্রত্যেক উনিশ বছর পর নতুন দশরের সূচনা হতো আর দফতর শিশম (তথা ষষ্ঠ ধাপ)-এর দুই বছর পূর্বে সূচনা হয়েছিল অর্থাৎ বিগত বছর। এখন নিষ্ঠাবান সদস্যদের যারা তাহরীকে জাদীদে চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করবেন তারা ষষ্ঠ ধাপে পরিগণ্য হবেন; যারা বিগত বছর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, তারাও ষষ্ঠ ধাপে পরিগণ্য হবেন।”

(খুতবা জুমুআ, ০৮ নভেম্বর ২০২৪)



জলসা সালানা, রাবওয়া, পাকিস্তান (১৯৮৩)।



জলসা সালানা, কাদিয়ান, ভারত।



জলসা সালানা, ঘানা।



জলসা সালানা, ইউকে।



জলসা সালানা, জার্মানি।



জলসা সালানা, বাংলাদেশ।



জলসা সালানা, বেলজিয়াম।



জলসা সালানা, কানাডা।



জলসা সালানা, জাপান।



জলসা সালানা, নাইজেরিয়া।



জলসা সালানা, নরওয়ে।



জলসা সালানা, সিয়েরা লিওন।

Tahrik-E-Jadid

The Tahrik-E-Jadid scheme was initiated by Hazrat Khalifatul Masih II (ra.) under Divine guidance on 23rd November 1934 in response to a great wave of opposition to the Jamaat, Tahrik-E-Jadid literal translation is “The New Scheme”.

As Hazrat Musleh Maud (ra.) launched Tahrik-E-Jadid, he lay out its purposes in a number of addresses. On one occasion, Huzoor (ra.) said:

“The purpose of launching Tahrik-E-Jadid is to acquire such a fund with which Allah’s message can be delivered as far as the corners of the earth with ease and facility.” (Friday Sermon, 27 November 1942)

Tahrik-E-Jadid began as a temporary scheme to span over a period of three years but, as time passed, Huzoor (ra.) extended it further. At its nineteenth anniversary, Hazrat Khalifatul Masih II (ra.) said:

“Now that nineteen years are coming to an end, I have decided that Tahrik-E-Jadid will continue up to your last breaths.” (Friday Sermon, 27 November 1953)

Hazrat Khalifatul Masih II (ra.) himself explained that: “All demands of Tahrik-E-Jadid have been introduced for the reason that you could become manifestation of Allah’s attributes.”

